সমর্পণ

নিবিড় দুর্য্যোগের পর

উষার অরুণোদয়ের মত

যে নির্ম্মল আনন্দ

দুটি উদ্‌ভ্রান্ত জীবনকে

অভিভূত ও পরিপুত করিয়াছে

তাহারই স্মৃতিকল্পে

স্নেহের অনুজ

সুবিখ্যাত

ফাইন প্রিন্টিংএর স্বত্বাধিকারী

শ্রীমান্ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

করকমলে

অদৃষ্টের এই ইতিহাস

দাদাির আশীর্ব্বাদ

স্বরূপ

সমর্পিত হইল

অদৃষ্টের ইতিহাস

সপ্তম অধ্যায়

পরিণাম

১

ভবানীপুরে বন্ধুর বাড়ীতে দুইটি দিন কাটাইয়া সস্ত্রীক নবীনমাধব শুধু যে পরম আপ্যায়িত ও পরিতৃপ্ত হইয়াই তাহাদের দেবগ্রামের বাড়ীতে ফিরিয়াছিল, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না; বরং স্বামী-স্ত্রীর মনস্তত্ত্বের সন্ধান লইলে ইহাই জানিতে পারা যায় যে, বন্ধুর বাড়ীর পরিপাটি ব্যবস্থা, নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই পল্লী-দম্পতির চিত্তে এমনই একটা অনুচিকীর্ষার সঞ্চার করিয়া দিল—যাহার উদ্দাম আবর্ত্তে পড়িয়া সংসারের নিবিড় শান্তি ও সন্তোষ পর্য্যন্ত যেন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

প্রমীলা কখনও শহরে রাত্রিবাস করে নাই, টকী-সিনেমা দেখে নাই; তাই তাহার স্বামী নবীনমাধব সহধর্ম্মিণীর এই অনাস্বাদিত সাধটুকু মিটাইবার জন্য বন্ধু নির্ম্মলের সহযোগিতায় এই ব্যবস্থা করিয়াছিল।

নির্ম্মল আলিপুরের আদালতে ওকালতি করে, ভবানীপুরে প্রধান সড়কের উপরেই তাহার বাসা। আর নবীনমাধব বাস করে এই সমৃদ্ধ শহর হইতে ত্রিশ মাইল তফাতে প্রকৃতি দেবীর মুক্ত অঞ্চলাশ্রিত এমন এক নিভৃত পল্লীগ্রামে—যেখানে শহরের চিত্তচমকপ্রদ আমোদ-বিলাস ও আরামভোগের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। গ্রামের অধিবাসীরা সকলেই বিলাসবিহীন অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। গ্রামে এমন একটি সংসারও নাই, গৃহসংলগ্ন ভূখণ্ডে উৎপন্ন তরি-তরকারীগুলি নিত্য যাহার গৃহে না আসে, অর্থাৎ শাক-সব্জী, লাউ-কুমড়া, ঝিঙ্গা-উচ্ছে প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে যাহাকে পয়সা লইয়া বাজারে ছুটিতে হয়। প্রত্যেকের গৃহ-অঙ্গনে ধানের মরাই মা-লক্ষ্মীর ঝাঁপির মত দাঁড়াইয়া আছে।

দেবগ্রাম হইতে দেড় ক্রোশ তফাতে বিষ্ণুপুর মহকুমা। এইখানে একটি ইংরেজী স্কুল ও সাব রেজিষ্টারী আফিস থাকায় এই গ্রামখানি কতকটা সমৃদ্ধ হইবার অবকাশ পাইয়াছে। নির্ম্মলের পিতা সবরেজিষ্ট্রার হইয়া যখনি এখানে আসেন, নির্ম্মল তখন এখানকার স্কুলেই পড়িত এবং সেই সূত্রেই নবীনের সহিত তাহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

বহুদিন পরে এই সব-রেজিষ্টারী আফিসেই হঠাৎ দুই বন্ধুর সাক্ষাৎ। নবীনমাধব প্রবেশিকা পরীক্ষার পর জোগাড়-যন্ত্র করিয়া এখানেই একটি চাকুরী পাইয়াছে। যদিও মাসে তাহার বেতনের পরিমাণ কুড়ি টাকা, কিন্তু দলিলপত্র লেখায় আরও পনেরো কুড়িটি টাকা প্রতি মাসে তাহার উপরি উপার্জ্জন হইয়া থাকে। নির্ম্মল তাহার কোনও মক্কেলের একটা রেজিষ্টারীসূত্রে এখানে আসে এবং দীর্ঘকাল পরে নবীনের দেখা পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। একটি ঘণ্টা ধরিয়া দুই বন্ধুর মধ্যে বহু কথাই হয়, নবীনমাধব বন্ধুকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য খুবই পীড়াপীড়ি করে, কিন্তু কাজের দোহাই দিয়া নির্ম্মল কোনওরূপে অব্যাহতি পায়। তবে নবীনমাধব প্রিয়বন্ধুকে নিজ ব্যয়ে প্রচুর জলযোগে পরিতৃপ্ত করিতে ভুলে নাই এবং বন্ধুও পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে সস্ত্রীক নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া যায়।

এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে বড়দিনের ছুটির সুযোগে বন্ধুর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে নবীনমাধব পত্নী প্রমিলা এবং শিশু পুত্র-কন্যাদিগকে লইয়া তাহার ভবানীপুরের বাসায় উপস্থিত হয় এবং বন্ধু-পরিবারের প্রচুর আদর-আপ্যায়নে অভিভূত ও বহু বিস্ময়কর বস্তুর সমাবেশ যে শহরে—তাহার অধিবাসীদের সৌভাগ্যে চমৎকৃত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

২

নবীনমাধবের পিতা যাদবেশ্বর আদর্শ-গৃহস্থ ছিলেন। যদিও কোন আফিসে বা সেরেস্তায় চাকরী করিবার সুবিধা তিনি কোনও দিন পান নাই, তথাপি ভাত-কাপড়ের ভাবনা তাঁহার সংসারে ছিল না। পৈতৃক ভদ্রাসন ও তৎসংলগ্ন যে জমিটুকু তিনি পাইয়াছিলেন, তাহাতেই নিজের উদ্যমে সোনা ফলাইয়া আরও অনেকখানি জমি বাড়াইয়া ফেলেন। মৃত্যুকালে নবীনের মাথায় হাতখানি রাখিয়া তিনি বলিয়া যান,—বাবা! তোমার জন্য টাকা-কড়ি বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারিনি বটে, কিন্তু মা কমলাকে এই ভিটেয় বেঁধে রেখে যাচ্ছি। বুঝে চললে, ভাত-কাপড়ের ভাবনা তোমাকে কোনো দিনই ভাবতে হবে না। এ ভাবনা এ পর্য্যন্ত নবীনমাধবকে একটি দিনের জন্যও ভাবিতে হয় নাই, বা ভবিষ্যতে যে কখনও ভাবিতে হইবে, ইহা কোনও দিন সে কল্পনাও করে নাই।

পিতার পারলৌকিক কার্য্য যথাসম্ভব ঘটা করিয়াই সমাধা হইয়াছিল এবং তাহাতে নবীনমাধবকে ঋণগ্রস্ত হইতে হয় নাই। জননী প্রসন্নময়ী ছিলেন পাকা গৃহিণী, স্বামীর সংসারে তিনিই ছিলেন সর্ব্বময়ী, সকল বিষয়ে স্বামীর সহায়, মিতব্যয়ে সিদ্ধহস্ত, অথচ প্রয়োজন পড়িলে নিজের সঞ্চিত যথাসর্ব্বস্ব উজাড় করিয়া দিতেও দ্বিধা করিতেন না। যাদবেশ্বর সদাসর্ব্বদাই বলিতেন,—একালে চাকরী-বাকরী না করলে সংসারকে স্বচ্ছল করা যায় না, তবে আমার সংসারে আজ পর্য্যন্ত যে অভাব আসতে পথ পায়নি—সে কেবল তোমারই জন্য! প্রসন্নময়ী প্রসন্নমুখে স্বামীর কথার পিঠে বলিতেন,—কি ক'রে পথ পাবে বল না? তুমি যে ভিটেয় বাজার বসিয়ে

দিয়েছ, মা লক্ষ্মী সেখানেই ঘুরে বেড়ান ঝাঁপি নিয়ে, অভাব সেখানে সেঁধুতে পারে?

পাড়ার কেহই কোনও দিন এই সংসারে কলহ কিচিকিচি শুনে নাই; সবাই বলিত—যেন শিব-দুর্গার সংসার এদের। শিবতুল্য স্বামীকে সহসা হারাইয়া প্রসন্নময়ী কিরূপ শোকাতুরা হন তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর যখন শ্রাদ্ধের ব্যবস্থার প্রয়োজন হইল, তখন সকলেই সবিস্ময়ে দেখিল, বিধবা তাঁহার শোকমথিত দেহখানি সবলে তুলিয়া স্বামীর এই মহাকার্য্যে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সকলের ইচ্ছা, তিলকাঞ্চনে এ কার্য্য শেষ করা হয়, কিন্তু প্রসন্নময়ী দৃঢ়স্বরে কহিলেন,—না, নবীন বৃষোৎসর্গ ক'রে তাঁর কাজ করবে।

পুরোহিত ফর্দ্দ দিলে নবীন বলিল,—এতে ঋণ ক'রতে হবে। নবীনকে ঋণদান করিতেও কতিপয় হিতৈষীর আগ্রহ দেখা গেল; কিন্তু প্রসন্নময়ী ইহাতে প্রতিবাদ তুলিয়া বলিলেন,—তিনি অঋণী হ'য়েই গেছেন, আর তুই তাঁর কাজে ঋণ ক'রে স্বর্গের পথে আগড় তুলবি, নবীন? তা কি হয়, বাবা! আমিই টাকার ব্যবস্থা ক'রে দেব।

শ্রাদ্ধের এমন ব্যবস্থাই প্রসন্নময়ী তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব দিয়া করিয়া দিলেন, যাহা সত্যই চমকপ্রদ। স্বামী যাহা যাহা পছন্দ করিতেন, বস্ত্র উত্তরীয় শয্যা—এমন কি, যে খাদ্যগুলি ছিল তাঁহার একান্ত প্রিয়—সে সমস্তই সংগৃহীত ও বিতরিত হইল। স্বামীর পারলৌকিক কার্য্যে এই সদ্যবিধবার এইরূপ শ্রদ্ধা দেখিয়া অনেক বিধবার চক্ষু খুলিয়া গেল; তাঁহারা বুঝিলেন, স্বামীর শোকে হা-হুতাশ তুলিয়া দিনকতকের জন্য সকল কার্য্যে নির্লিপ্ত থাকা অপেক্ষা, বুক বাঁধিয়া শোক-তাপ উপেক্ষা করিয়া আন্তরিকতায় স্বামীর কার্য্যে যোগদানের সার্থকতা কত বেশী।

ইহার পর পাঁচটি বৎসর অতীত হইয়াছে। ইদানীং প্রসন্নময়ী ইচ্ছা করিয়াই বধূ প্রমীলার হাতে সংসারের অধিকাংশ ভার ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি থাকিতে থাকিতে বধূ যাহাতে নিজেই তাহার সংসারটি গুছাইয়া সামলাইয়া চালাইতে পারে, যে ধারায় সকল ঝড়-ঝাপ্টা কাটাইয়া এ বাড়ীর সংসার সবার আদর্শ হইয়াছে, বধূর হাতে পড়িয়া সে খ্যাতিটুকু যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, প্রসন্নময়ীর দৃঢ় লক্ষ্য সেই দিকেই ; তথাপি বধূর হাতে সংসারের ভার ছাড়িয়া দিয়াও তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই, মাথার উপর থাকিয়া যথাযথ নির্দ্দেশ দিতেন, দোষ ত্রুটি দেখিলে তৎক্ষণাৎ বুঝাইয়া বলিতেন—কি করা উচিত। কিন্তু শাশুড়ীর এই প্রকার খবরদারী বধূ প্রমীলার মনঃপুত হইত না, সে প্রায়ই স্বামী ও সমবয়সীদের নিকট বলিত, এ যেন ঠিক সর্ব্বস্ব দিয়ে থুয়ে চাবিটি কাছে রাখার মত হয়েছে! প্রসন্নময়ীও সময় সময় বর্ষীয়সী প্রতিবেশিনীদের সমক্ষে আক্ষেপ করিতেন,—বৌমার আমার আর সব ভাল হ'লে কি হবে, বুদ্ধি শুদ্ধি কম, সংসারের আঁট সাঁট নেই।

বধূর সম্বন্ধে যে যে কারণে শাশুড়ীর মনে এইরূপ বিক্ষোভ, সহর দেখিয়া ফিরিয়া আসিবার পর বধূর ব্যবহার সেই কারণগুলি আরও স্পষ্ট করিয়া দিল। বধূ যেন সহজাত সন্তোষ ও স্বচ্ছন্দতাটুকু সহরের উদ্দাম উল্লাস-প্রবাহে বিসর্জ্জন দিয়া বিনিময়ে একটা বিরক্তিসূচক বিষণ্ণতা ও অতৃপ্তি আহরণ করিয়া আনিয়াছে। পল্লীর গৃহ-আঙ্গিনা, পল্লীসুলভ পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন, চিরপরিচিত প্রতিবেশীদের আচরণ, বধূ প্রমীলার দৃষ্টিতে এখন বিসদৃশ ঠেকে! উঠানে মাটী, এক পশলা বৃষ্টি হইলেই তাহাতে কি কাদা—পা পিছলাইয়া পড়ে, কলসী কক্ষে লইয়া জল তুলিতে পুকুরঘাটে ছুটিতে হয় ; সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আঁধার যেন ঘনাইয়া আসে, প্রদীপের

ক্ষীণ শিখায় গৃহের কক্ষগুলিই ভালভাবে আলোকিত হয় না, মশার ঝঙ্কারে কান যেন ঝালাপালা হইয়া উঠে!—আর, দুইটি অহোরাত্র সম্প্রতি সে যে সহরে কাটাইয়া আসিয়াছে, এখানকার তুলনায় তাহার অবস্থা? ঘর দালান উঠান সবই যেন ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করিতেছে, পায়ে এতটুকু কাদা লাগে না; জলের জন্ত কলসী কাঁকালে তুলিয়া পুকুরে ছুটিতে হয় না,—কল টিপিলেই হুড়হুড় করিয়া জল পড়ে; ঘরে বসিয়া বাড়ীশুদ্ধ সকলে স্নান সারে। সন্ধ্যা হইতে না হইতেই বিজলীর আলো জ্বলিয়া উঠে, ঘরগুলি যেন হাসিতে থাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে বাজিয়া উঠে কত রকমের বাজনা, কত গান, কত রকমের আমোদ-প্রমোদ। জন্মজন্মান্তরের মহাপুণ্য না থাকিলে পৃথিবীর এই স্বর্গে কেহ কি বাস করিতে পারে!

কথায় কথায় বধূ শাশুড়ীর সমক্ষেও একদিন মনের এই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া ফেলিল; কহিল,—নির্ম্মল বাবুদের কত ভাগ্য, তাই অমন সহরে আছেন।

কথাটা প্রসন্নময়ীর মনঃপূত হইল না। কয় দিন হইতেই বধূর মুখে তিনি নিজের ভিটেভূমির নিন্দা ও সহরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিতেছেন; কিন্তু শুনিয়াও কথাটা তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। আজ আর পারিলেন না, বধূর ভুলটুকু সংশোধন করিতে তিনি প্রতিবাদের ভঙ্গীতে কহিলেন,—মহাভারত, মহাভারত! সহরের সুখ্যেত মুখে তুলো না বাছা, ওখানে থাকা, আর সোনার খাঁচায় ঢুকে ব'সে থাকা সমান, তাতে না আসে শান্তি, না হয় সোয়াস্তি।

শাশুড়ীর মুখে সহরের অখ্যাতি শুনিয়া প্রমীলার মুখখানা উত্তেজনায় লাল হইয়া উঠিল; এ পর্য্যন্ত শাশুড়ীর মুখের উপর কথা কহিতে তাহার সাহস দেখা যায় নাই, নিরুত্তরেই সে তাঁহার নির্দ্দেশ মানিয়া লইয়াছে।

কিন্তু আজ যেন মুখের কথাসূত্রে এই শ্রদ্ধেয়া বৃদ্ধাটির চিত্তের দুর্ব্বলতা ও সহরের অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা তাহার চক্ষুর উপর প্রকাশ হইয়া পড়িল। নিজের চক্ষুতে সে যেখানকার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য-সুষমা দেখিয়া আসিয়াছে, সুস্পষ্টভাবে অনুভব করিয়াছে ; ইনি তাহার ত্রিসীমায়ও কোনও দিন না গিয়াও সেখানকার সুখ-সুবিধাকে অবহেলা করিতে চান! কাজেই প্রমীলাকে আজ অসঙ্কোচে বলিতে হইল, অমন কথা বলবেন না মা, আপনি ত কখনো সহরে যান নি, নিজের চোখে যদি সেখানকার ব্যবস্থা সব দেখতেন, তা হ'লে আপনাকেও মানতে হ'ত—সহরে থাকা আর স্বর্গে থাকা সমান। সেখানকার তুলনায় এ পাড়াগাঁ যেন নরক!

প্রসন্নময়ী এবার তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন,—আর কোনদিন যেন তোমার মুখে এ কথা না শুনতে পাই, বউমা! নিজের বাসভূঁই—স্বামীর ভিটে স্বর্গের চেয়ে ভাল,—এ কথা বরাবর মনে রেখো, নইলে মহাপাপ হবে।

৩

পল্লীর নানারূপ আবিলতা ও সহরসুলভ বৈচিত্র্যের অভাব শুধু প্রবীণার চিত্তে বিক্ষোভ তুলে নাই, নবীনমাধবও ইদানীং তাহা উপলব্ধি করিতেছিল। রাত্রিকালে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ সম্বন্ধে কত আলোচনাই হইত।—নির্ম্মলরা কি সুখী। মাসে তিরিশটি টাকা ভাড়া দিয়া যে বাড়ীতে তাহারা থাকে, তাহা কি চমৎকার! মেটে উঠান নাই, ঘরগুলি ছোট হইলেও দেখিলেই যেন চক্ষু জুড়ায়; কোথাও মাটীর চিহ্ন নাই, ছাদে উঠিলে সারা সহরের চমকপ্রদ শোভা চক্ষুকে মুগ্ধ করিয়া দেয়। কাছেই পার্ক, অপরাহ্ণে নির্ম্মল তাহার ছেলে-মেয়েদের হাত ধরিয়া সেখানে বেড়াইতে যায়,—পার্কের চারিদিক্ দিয়া কত রকমের যান-বাহন যাতায়াত করে; প্রতি রবিবার সন্নিহিত চিত্রালয়ে স্ত্রী-পুত্রদের লইয়া সিনেমা দেখিতে যায়, মধ্যে মধ্যে থিয়েটার দেখাও চলে। কোনও গোলোযোগ নাই, প্রতিবেশীদের সহিত কলহ-কিচিকিচি বাধে না; বৃষ্টি হইলে [illegible]-কোঁচা বাঁধিয়া জুতা হাতে করিয়া রাস্তা চলিতে হয় না; গুটিকয়েক মাত্র পয়সা ফেলিলে ট্রামে বা বাসে চাপিয়া সহরের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসা যায়। কি সুখ ও তৃপ্তি, স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার উপযোগী কতরূপ সুযোগ-সুবিধা সেখানে! ইচ্ছা করিলে, এই সুখ স্ত্রী-পুত্রদের সহিত সেও ত উপভোগ করিতে পারে! নির্ম্মলদের কাছাকাছি ছোট একখানি বাড়ী অল্প টাকায় ভাড়া করিয়া সহরবাসী হওয়া তাহার পক্ষে কেনই বা সম্ভবপর না হইবে!

অতঃপর এই সূত্রে কত অভিনব কল্পনা এই সুখলুব্ধ দম্পতির মানসপটে

চিত্রিত হইয়া তাহাদের সুখনিদ্রার অন্তরায় হইয়া উঠে, কত নিরর্থক নির্দেশ এই বিনিদ্র দুইটি প্রাণীর চিত্ত-মরুতে আত্মপ্রকাশ করিয়া হাতছানি দিয়া ডাকিতে থাকে। এ প্রলোভন সবলে কাটাইয়া ফেলিতে সকলে পারে না।

বন্ধু নির্ম্মলের নিকট স্থায়ীভাবে সহরবাসের বাসনা জানাইতেই সে তাহাতে আন্তরিকতার সহিত উৎসাহ দিল এবং এক সপ্তাহ পরেই যে প্রীতিপ্রদ সংবাদ পাঠাইল, তাহার মর্ম্ম এই যে, নবীনমাধব যদি হাজার তিনেক টাকা সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা হইলে সে-টাকা ডিপোজিট দিয়া আদালতের সেরেস্তায় যে কোনও একটা কাজে তাহাকে বসাইয়া দেওয়া কঠিন হইবে না।

সংবাদটা মুখরোচক হইলেও হাজার তিনেক টাকা সংগ্রহ করাটা বর্ত্তমানে নবীনমাধবের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। সুতরাং কি ভাবে এই টাকা সংগ্রহ করিতে পারা যায়, এবং তাহাদের সহরবাসের আকাঙ্ক্ষা শীঘ্রই চরিতার্থ হয়, ইহাই অতঃপর স্বামি-স্ত্রীর একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। নবীনমাধব প্রমীলাকে দৃঢ়ভাবে আশ্বাস দিল,—কুছ্ পরোয়া নেই! মন যখন টলেছে, টাকার জন্য আটকাবে না, ধার করবার চেষ্টায় ত ফিরছি, একান্ত না পাই—এখানকার পাট না হয় তুলেই দেব; তিনহাজার টাকা এতে ঢের উঠবে। কথাটা বলিয়াই সে পত্নীর দিকে চাহিল, কিন্তু প্রমীলা কোনও উত্তর দিল না। স্বামীর এই সর্ব্বনাশী যুক্তিতে সে মুখ ফুটাইয়া সায় দিল না বটে, কিন্তু কোনও প্রতিবাদও করিল না। নবীনমাধব বুঝিল, স্ত্রীর মনোভাবও ইহাই;—মৌনং সম্মতিলক্ষণম্!

মুখে না বলিলেও প্রমীলা যে স্বামীর প্রস্তাবে মনে মনে খুসীই হইয়াছিল, ইহার আভাস নানাসূত্রেই পাওয়া গিয়াছিল। নবীনমাধব লক্ষ্য করিল, এখানকার কোনও বিষয়েই আর প্রমীলার অন্তরের টান নাই, সে যেন মনে

মনে স্থির করিয়াই রাখিয়াছে, এখানকার কোনও হিসাবই আর তাহাকে টানিতে হইবে না। গৃহসংক্রান্ত যে সকল সংস্কারের জন্য সে প্রায় প্রত্যেক ছুটির দিন স্বামীকে তাগিদ দিত, এখন সে বিষয়ে একেবারে নির্লিপ্ত; যখন এখানে থাকিবেই না, বৃথা খরচ-পত্র করিয়া কি লাভ! সংসারের সকল কাজেই যেন তাহার কেমন একটা আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো ভাব! বধূর এই ঔদাসীন্য দেখিয়া শাশুড়ী প্রসন্নময়ী প্রায়ই ব্যথার সুরে বলেন,—সহরে হাওয়া লেগে বৌমার মাথা বিগড়ে গেছে।

নানাস্থানে চেষ্টা করিয়াও নবীনমাধবের পক্ষে যখন তিন হাজার টাকা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইল না, তখন এক দিন সে কুণ্ঠিত ভাবে কথাটা মায়ের নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিল। কহিল,—নির্ম্মল একটা ভাল চাকরীর যোগাড় করেছে আমার জন্য মা, কিন্তু তাতে তিন হাজার টাকা জমা দিতে হবে; পঞ্চাশ টাকা মাইনে দেবে, পরে বাড়বার সম্ভাবনা আছে। তুমি কি বল?

মা বলিলেন,—কথাটা শুনতেই ভাল, কিন্তু লাভ-লোকসান খতিয়ে যদি দেখতে, নিজেই বুঝতে পারতে, বাবা!

নবীনমাধব একটু অসহিষ্ণু ভাবেই কহিল,—আমার কিন্তু ভারি ইচ্ছা মা, চাকরীটা নিই।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিয়া মা কহিলেন,—নিয়ে কি করবে শুনি? এখানে বাড়ীতে থেকে যা পাচ্ছ, তার চেয়ে এমন কি বেশী পাবে মনে করেছ যে, ঐ চাকরীর জন্য ঝুঁকেছ? তাছাড়া তিন হাজার টাকা জমা রাখতে হবে যখন!

নবীনমাধব কহিল,—সে টাকা ত আর নষ্ট হচ্ছে না, জমা থাকবে, সুদ তার পাওয়া যাবে।

মা কহিলেন,—তা যেন হ'ল, কিন্তু টাকা পাবে কোথায় ?

নবীনমাধব কাসিয়া গলাটা স্পষ্ট ও পরিষ্কার করিয়া কহিল,—মনে করছি, এখানকার জমি-জেরাৎ আর ভদ্রাসন বাঁধা দিয়ে টাকাটা যোগাড় করব, তার পর কাজে বসলে ছাড়িয়ে নিতে কতক্ষণ ?

প্রসন্নময়ীর গম্ভীর মুখখানি সেই মুহূর্ত্তে ছায়ের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। পুত্রের মুখ দিয়া এমন প্রস্তাব বাহির হইবে, তাহা তিনি কল্পনাও করেন নাই। ক্ষণকাল বদ্ধদৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি আর্ত্তস্বরে কহিলেন,—এ পরামর্শ তোমাকে কে দিয়েছে, বাবা ? যেই দিক, সে তোমার হিতৈষী নয়। আমি তোমার মা, আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করতে এসেছ, আমি বলছি,—এমন কুবুদ্ধি কখনও যেন মনে না আসে, আমি থাকতে এ সর্ব্বনাশ তুমি করতে পাবে না।

প্রমীলা অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া মাতা-পুত্রের কথোপকথন শুনিতেছিল। মায়ের কথাগুলি শুনিয়া সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে নবীনমাধব সেখানে উপস্থিত হইয়া কহিল,—শুনলে মা'র কথা ? কিন্তু আমি ও-সব মানছি না, আমার সঙ্কল্প স্থির—যখন নির্ম্মলকে কথা দিয়েছি।

প্রমীলা অপ্রসন্ন ভাবে কহিল,—কাজ কি বাপু মাকে ঘাঁটিয়ে, শেষে শাপ-মন্যি কুড়বে! শুনলে না, আমাকে ঠেস দিয়েই কত কথা বললেন, অথচ আমি তোমাদের কিছুতেই নেই!

নবীনমাধব প্রতিবাদের ভঙ্গীতে কহিল,—তোমাকে আবার ঠেস দিয়ে কি বললেন ?

প্রমীলা কহিল,—তবে শুনলে কি ? বললেন না গোড়াতেই—কে তোমাকে এ কাজ করতে পরামর্শ দিয়েছে ? কাকে ঠেস্ দিয়ে কথাটা বলা

হ'ল, সে কি আর আমি বুঝিনি ? কিন্তু ভগবান্ জানেন, আমি তোমাদের কোনও কথাতেই নেই, কোনো দিন আমি তোমাকে কিছু বলিছি যে, এখানে আমার মন বসছে না, সব বেচে কিনে আমাকে নিয়ে সহরে চল ? বল—বল ?

নবীনমাধব কহিল,—তুমি এ সব কথা গায়ে পেতে কেন যে নিচ্ছ, তা ত বুঝতে পারছি না ; মা তোমার সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি ; তবে হাজার হোক্, বুড়ো হয়েছেন, তলিয়ে কিছুই বুঝতে চান না ; আজ রেগে 'না' করলেন, দুদিন বাদে আবার হেসে 'হাঁ' বলবেন।

কিন্তু দুদিন কেন, পূর্ণ দুইটি মাস সাধ্য-সাধনা করিয়াও নবীনমাধব তাহার এই প্রস্তাবে হাঁ বলাইয়া মায়ের সম্মতি গ্রহণ করিতে [illegible]রিল না।

এই প্রসঙ্গে মাতা-পুত্রের মধ্যে যেমন একটা অপ্র[illegible]ত অপ্রীতি বৃত্তির মত ব্যবধান সৃষ্টি করিতেছিল, এই শান্তিছায়াচ্ছন্ন [illegible]ারটির উপর কেন[illegible] অসন্তোষের একটা ছায়া ক্রমশঃ গভীর হইয়া পড়িতে[illegible]।

নিজের সংসারে বধূর যেমন বিতৃষ্ণা, বাহিরে [illegible]রিদিক্ দিয়া সংসারটিকে বাড়ন্ত করিবার আগ্রহ সম্বন্ধে ছেলেরও সেইরূপ অবহেলা প্রসন্নময়ীর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্পষ্ট হইয়াই ধরা দিতেছিল। এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদ তুলিলেই কলহ বাধিবার কথা, কিন্তু বুদ্ধিমতী বৃদ্ধা এ বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন ; ছেলে তাঁহার সম্মতি না পাইয়া যতই উদ্ধত হইয়া উঠিতেছিল, তিনি ততই নম্র হইয়া তাহাকে এই নির্দ্দেশ দিতেছিলেন যে, ভুল পথ ধরিয়া সে কাজ আদায় করিতে ছুটিয়াছে এবং তাহার হিসাবেও মস্ত ভুল রহিয়াছে ; কেন না, ভিটে-ছাড়া হইয়া, উপস্থিত অন্ন ত্যাগ করিয়া যাহারা বাহিরে ছোটে, তাহাদের কপালে অনেক দুঃখই থাকে !

কিন্তু সহরের সুখ-সম্ভাবনায় নবীনমাধবের চিত্ত তখন বিভোর, পল্লীর অসংখ্য অভাব ও অসুবিধা বরং দুর্ব্বিবহ দুঃখেরই আভাস দিতেছিল, মায়ের নির্দ্দেশ সে সহজে উপলব্ধি করিতে পারিল না ; অথচ, মাকে উপেক্ষা করিয়া সহসা কিছু করিয়া বসিবে, এমন সাহসও তাহার নাই।

মায়ের মনস্তুষ্টির জন্য নবীনমাধব হঠাৎ আর এক প্রস্তাব তুলিয়া বসিল ; তাকে কহিল,—এক কাজ করা যাক্ মা, সহরের চাকরীটা নেওয়াই যখন আমার একান্ত ইচ্ছা, আর সহরেই আমাদের থাকতে হবে, তখন তুমি কেন কাশীবাস কর না ? কাজ কি এ সব ঝঞ্ঝাটে থেকে, বয়স হয়েছে, আর কোন তীর্থধর্ম্মও ত তোমার হয় নি !

প্রসন্নময়ী অতঃপর পুত্রের মুখে এমনই কিছু শুনিবার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, সুতরাং বিস্মিত হইলেন না, বরং হাসিয়া কহিলেন,— আমার কাশী-বৃন্দাবন সবই যে এইখানেই রে ! এই ভিটেই যে আমার কাছে মহাতীর্থ, বাবা ! ঠাকুরঘরে যখন আমি সন্ধ্যের প্রদীপ দেখাই, তাতে এ বংশের মুখ যেমন উজ্জল হয়, সেই সঙ্গে সমস্ত তীর্থদর্শনের ফলও আমি পেয়েছি,—এই মনে ক'রেই তৃপ্তি পাই।

মায়ের কথা শুনিয়া নবীনমাধব স্তব্ধ হইয়া রহিল ; বুঝিল, সহজে তাহার সঙ্কল্প-সিদ্ধির কোনও সম্ভাবনাই নাই।

বৃদ্ধা স্বর্গগত স্বামীর উদ্দেশে প্রায়ই প্রার্থনা করেন, এমন সমস্যায় কখনও পড়ি নাই, তুমি আমার মনে শক্তি দাও, আমি যেন ছেলের

ফুল তেঙে দিয়ে এই ভিটেয় প্রদীপ জালার ব্যবস্থাটুকু বজায় রাখতে পারি।

অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, কথার পীঠে কথা উঠিয়া কত অনর্থ-ই বাধাইয়া দেয়। মানে ও বয়সে যিনি পরিবারের মধ্যে বড়, তিনি স্নেহ-ভাজনদের মনের গতির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া জানাইতে চান যে, তিনি যখন সকলের ভক্তিভাজন, কঠিন কথা কহিয়া শাসন করিবার ক্ষমতাও তাঁহার একচেটে হইয়াই আছে। কিন্তু স্নেহ-ভক্তির বন্ধন প্রায়ই এ ক্ষেত্রে ছিন্ন হইয়া যায়।

প্রসন্নময়ী ছেলের ও বধূর প্রকৃতি বুঝিতেন, কিসের মোহ তাহাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে, সে সন্ধানও রাখিতেন এবং ইহাও জানিতেন যে, এ ক্ষেত্রে মারমুখী হইয়া উপযুক্ত সন্তানের বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাহার জেদ যেমন বাড়িয়া যাইবে, তেমনই চারিদিক্ দিয়া অশান্তির ঝটিকা উঠিয়া সংসারটি শ্রীহীন ও একেবারে ওলট-পালট করিয়া দিবে। অথচ, পুত্রের ভুলটুকু তাঁহাকে ভাঙিয়া দিতেই হইবে, পতনের যে পথটি সে সযত্নে বাছিয়া লইয়াছে, তাহাতে কত বিঘ্ন, অবাঞ্ছিত কত অজ্ঞাত পূতিগন্ধময় গহ্বর সে পথে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেগুলি তাহার চক্ষুর উপর সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইতে হইবে, নতুবা সে ত ফিরিবে না। সুতরাং পথিভ্রষ্ট পুত্রকে ফিরাইয়া স্বামীর ভিটায় প্রতিষ্ঠাপন্ন করিতে মাতা প্রসন্নময়ী যাহা করিলেন, তাহা অপূর্ব্ব এবং অতুলনীয়।

ইহার পর এক বৎসর অতীত হইয়াছে এবং আর এক বড় দিনের ছুটী আসিয়াছে। এবার বড় দিনের ছুটীর মধ্যেই পৌষ মাসের গৃহলক্ষ্মীর পূজার শুভ-দিনটিও পড়িয়াছিল।

ছুটীর আগেই প্রসন্নময়ী সহসা এক দিন পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন,—

...ছিলুম কি, গেল বছর তুমি ত বৌমা আর ছেলেপুলে নিয়ে
...বাসায় গিয়েছিলে, দু'দিন ছিলে সেখানে, আদর-যত্নও তারা খুব
...শুনেছি, কিন্তু বাবা, তোমরা শুধু আদর-যত্ন নিয়েই ত এলে,
...ছু ত করলে না, ফিরিয়েও দিলে না!

...নমাধব মনে মনে খুসী হইয়া কহিল,—সত্যি মা, কথাটা তুমি ঠিক
...; কিন্তু ওরা হচ্ছে বড় লোক, সহরে থাকে, কাছে পীঠে নয় যে
...-দেওয়া করব, কাজেই কি করতে পারি—বল না?

প্রসন্নময়ী কহিলেন,—কেন ওরা যখন তোমাদের নিয়ে যেতে
...রেছিল, আনবার চেষ্টা করলে ওরা যে আসবে না, এমন কি কথা?
...সে চেষ্টা ত করনি বাবা, আনা ওদের উচিত ছিল।

নবীনমাধব চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু মায়ের কথাটা তাহার মনে বেশ
...লা দিতেছিল। সত্যই ত, এত ঘনিষ্ঠতা যখন নিশামোর সহিত হইয়াছে,
পরিবার তাহার বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আদর-আপ্যায়ন পাইয়াছে
...খন তাহার পক্ষ হইতেও ত প্রতিদান কিছু দেওয়া পূর্ব্বেই উচিত ছিল।

পুত্রকে নিরুত্তর দেখিয়া প্রসন্নময়ী স্মিতমুখে কহিলেন,—বেশ ত, এ
...আর কি আছে, বাবা! বড়দিনের ছুটী ত এসে পড়েছে, আ
...চার্য্যি মশাই বলছিলেন, বড়দিনের পরদিনই এবার মা-কালীর...
...ছে; তাই হয়েছে, এই ছুটীতেই ওদের আনবার ব্যবস্থা ক...
...দের লেখ, তবু সে বৌমা আর ছেলেপুলেদের নিয়ে এখানে এ...
...র ক'টা দিন কাটিয়ে যায়।

নবীনমাধবের মনে এ প্রস্তাবটা সায় দিলেও সে সহসা মুখখানা ...
...রিয়া কহিল,—তারা হচ্ছে সুখী মানুষ, সহরে থাকে, আমাদের
...দেশ কি তাদের ভাল লাগবে?

কথাটি শুনিবামাত্রই প্রসন্নময়ীর মুখখানা কঠিন হই... ভাব তিনি তৎক্ষণাৎ সম্বরণ করিয়াই কহিলেন,—য... মিঠাই-পুরী খায়, একদিন ভাত-চর্চ্চড়ি তাদের মুখে উঠবে... দোষও হয় না, মনে মনে বরঞ্চ তৃপ্তিই পায় শুনেছি। ... ও'দের আনাও, যাতে মন বসে, ভাল লাগে—সে ব্যবস্থা তখন...

নবীনমাধব ভাবিল, মায়ের এই প্রস্তাবটা মন্দের ভাল। ... সম্বন্ধে মায়ের যেরূপ টান দেখা যাইতেছে, এ পর্য্যন্ত তাহাকে ... দেখিয়াও শুধু তাহার কথা শুনিয়া তাহার প্রতি যে আন্তরিক ... প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে নির্ম্মল এখানে আসিলে, তাহার স্বভাব... বাকপটুতায় হয় ত মায়ের মতপরিবর্ত্তনও অসম্ভব নয়। নির্ম্ম... সাহচর্য্যেই তাহার চিত্তে সহরবাসী হইবার যে আগ্রহ উদগ্র হইয়া উঠি... ও মায়ের অনিচ্ছা তাহাতে একমাত্র অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে, ... নির্ম্মলের বাক্‌চাতুর্য্যেই তাহার অবসান সম্ভবপর হইতে পারে।

কত উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা বক্ষে বহন করিয়া নবীনমাধব নির্ম্মলদের ... করিয়াছিল। কিন্তু যাহাদের জন্য তাহার এই চিত্তচাঞ্চল্য, তাহারা ... অঞ্চলের অনাস্বাদিত সুষমা-মাধুর্য্য উপভোগ করিয়া এবং নান... নবীনমাধবের সৌভাগ্যের পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইয়া গেল। ...

পৌষ মাস, ক্ষেতে সে সময় সোনা ফলিয়াছে; পথের দুই ধারে ... বিসারী মাঠে-ময়দানে তখন কি চক্ষুচমৎকারী শোভা! নবীনমাধবের নি... সম্মুখে সুবিস্তীর্ণ খামার, খেতের পাকা ধানে এই খামার পরিপূর্ণ। বেছুট... চামরমণি, কোনও অংশে রামশাল, কোথাও বা বাঁকতুলসী শ্রেণী ... খামারের বিভিন্ন অংশে পাশাপাশি সেগুলি স্তূপাকারে সুরক্ষি... স্নিগ্ধ-মধুর গন্ধে সে স্থান আমোদিত...
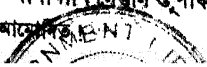
অদৃষ্টের ইতিহাস

ষষ্ঠ অধ্যায়

তপস্যা

১

নূতন পত্তন হইলেও পত্তনকারীর অপূর্ব্ব পরিকল্পনামূলক প্রচেষ্টায় জনকাশ্রমের প্রতিষ্ঠা ও শ্রীবৃদ্ধির খ্যাতি নানাসূত্রেই বিভিন্ন পরগনা ও ও মহকুমা ছাপাইয়া সহর পর্য্যন্ত পহুঁছাইয়াছে। কিন্তু যে তালুকটিকে আশ্রয় করিয়া তাহারই এলাকাধীন অবস্থায় ইহার উত্থান ও প্রতিষ্ঠা, মহাল গোবিন্দপুর নামে তাহা স্মরণাতীত কাল হইতে এ অঞ্চলে পরিচিত এবং সরকারী দপ্তরখানার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বিজড়িত হইয়াও জনকাশ্রমের মত সমৃদ্ধ বা এতটা প্রসিদ্ধি পায় নাই। অথচ, মহাল গোবিন্দপুর তালুকটির জমি পরিমাণে পাঁচ হাজার বিঘারও অধিক। আর যে ভূখণ্ড লইয়া জনকাশ্রমের এরূপ শ্রীবৃদ্ধি, তাহার পরিধি একশত আট বিঘা এগারো কাঠা মাত্র।

এই একশত আট বিঘা এগারো কাঠা জমির অতীত ইতিহাস যাঁহারা জানেন, এই জমির উপর গঠিত নূতন নগরটির ছবির মত চক্ষুচমৎকারী শোভা তাঁহাদের মনে কত না বিস্ময়ের সৃষ্টি করে! আর, যাঁহারা এই একশো আট বিঘা এগারো কাঠা জমি হাতছাড়া করিবার জন্য আইনের লড়াই বাঁধাইয়াছিলেন, তাঁহারাও অবাক হইয়া আজ ভাবেন, কি ভুলই তাঁহারা করিয়াছেন! দুই পক্ষের এই ভুলের ফিরিস্তি বাহির করিলে গোড়ায় যে দুর্জ্জয় জিদের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ।—

আজু মিঞা গোবিন্দপুর তালুকের একজন বর্দ্ধিষ্ণু গাঁতিদার। জমিদার-সরকারে প্রায় পৌণে সাতশত বিঘা জমির খাজনা তাঁহাকে সরবরাহ করিতে হয় এবং তাঁহার প্রপিতামহ আরজান মিঞার সময় হইতে

নির্দ্দিষ্ট হারে এই সরবরাহ কার্য্য চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু আজু মিঞা জীবনের অধিকাংশ কাল জমি ও জমার এই সম্বন্ধ নির্ব্বিচারে স্বীকার করিয়া বার্দ্ধক্যের সূচনায় সহসা একটা গলদ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন! অর্থাৎ তিনি দেখিলেন, জমিদার সরকারে তাঁহাকে যে পৌণে সাতশত বিঘা জমির খাজনা নিয়মিতভাবে দাখিল করিতে হয়, ঐ একশত আট বিঘা এগারো কাঠা জমির বন্দটি তাহারই অন্তর্গত, কিন্তু উক্ত জমি হইতে কোনও পণ্য উৎপন্ন হইয়া তাঁহার গোলায় উঠে না অথবা আয়ের দিক দিয়া একটি পাই-পয়সারও আমদানী হয় না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহার নানা স্থানে বড় বড় ঢিপি—পাহাড়ের স্তূপের মত আতঙ্কপ্রদ হইয়া আছে। এরূপ অসমতল কর্কশ জমি অব্যবহার্য্য ; লাঙ্গল এখানে অচল এবং সকল ঢিপি ভাঙিয়া সমতল করিবার মত উৎসাহ বা ধৈর্য্য কাহারও ছিল না। কতক জমি ভাগাড়ে পরিণত হইয়াছে। ঢিপিসংলগ্ন জমিতে যাহারা স্বচ্ছন্দে চরিয়া বেড়ায়, তাহারাই মরিলে পাশের জমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া শিয়াল-শকুনীর ক্ষুধা মিটায়। ইহাদের পরেই কতকগুলি ডোবা, আগাছার জঙ্গল ; হেঁতাল ও হোগলার বন। দিনেও সেদিকে কেহ ঘেঁসিতে চাহে না। সুতরাং কোনও সূত্রেই এই ভূখণ্ড হইতে কিছুমাত্র আয় নাই, অথচ সমস্ত জমির সংযোগে ইহারও হারাহারি খাজনা আজু মিঞাকে জমিদার-সরকারে যথারীতি দাখিল করিতে হয়।

এ ক্ষতি আজু মিঞা কেন সহ্য করিবে? কাজেই একদা তিনি আইনবিদ্‌দের যুক্তি লইয়া জমিদারকে এই মর্ম্মে এক নোটিশ দিলেন, তফ্‌শীলের চৌহদ্দীভুক্ত জমির খাজনা হইতে তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হউক এবং জমিদার-সরকার ঐ জমি অন্য কাহাকেও বিলি করুন বা নিজ দখলে রাখুন।

গোবিন্দপুর তালুকের যিনি জমিদার, তাঁহার মত হিসাবী মানুষ এ যুগের জমিদারদের মধ্যে অল্পই দেখা যায়। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা লাঠিয়াল পুষিতেন, মাথায় লালপাগড়ি বাঁধা এক পাল লাঠিয়াল সদা-সর্ব্বদা লম্বা লম্বা লাঠি হাতে সেরেস্তার-পথে মোতায়েন থাকিত; প্রজারা তাহাদিগকে দেখিলেই চিট্ হইয়া যাইবে, বিদ্রোহের কল্পনা কখনও করিবে না, ইহাই ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁহাদের বর্ত্তমান বংশধর অদ্বৈত চৌধুরী জমিদারীর গদিতে বসিয়াই লাঠিয়ালদের বিদায় করিয়া দেন এবং তাহাদের স্থানে যাহাদের নিয়োগ করেন, বাঁশের লাঠি চালাইবার যোগ্যতা তাঁহাদের না থাকিলেও আইনের লাঠি চালাইতে তাঁহাদের পটুতা ও ক্ষমতার ইয়ত্তা ছিল না। অদ্বৈত চৌধুরীর ধারণা, লাঠির যুগ চলিয়া গিয়াছে, এখন যে যুগ পড়িয়াছে তাহা আইনের; ইহারই বেড়াজালে ঘিরিয়া প্রজাদের শাসন করা চাই। সুতরাং তিনি মাথা খেলাইয়া দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের এমন একদল আইনজ্ঞকে মুঠার মধ্যে রাখিয়াছেন, যাঁহারা আইনের নির্দ্দেশটুকু লইয়া মামলার চক্রব্যূহ সৃষ্টি করিতে একান্ত অভ্যস্ত এবং প্রতিপক্ষকে হায়রাণ করিয়া আইনের নাগপাশে বাঁধিতেও সিদ্ধহস্ত।

আজু মিঞার নোটিশ পাইয়াই অদ্বৈত চৌধুরীর পরিপুষ্ট ও পরিপক্ক গোঁফ যোড়াটি হাসির উচ্ছ্বাসে স্ফীত হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ আইন-বিদদের লইয়া পরামর্শ সভা বসিল ও অবশেষে ইহাই সাব্যস্ত হইল—গাঁতিদার আজু মিঞার নোটিশে বর্ণিত একশত আট বিঘা এগার কাঠা জমির সহিত তাহার জমার সমস্ত জমিটুকুই যাহাতে জমিদার-সরকারে জব্দ হয়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া যুদ্ধ চালানো হোক্।

ইহার পরেই যুদ্ধের বাজনা বাজিয়া উঠিল এবং পরিপূর্ণ চারি বৎসরের শেষভাগে যুযুধান একপক্ষের পরিচিত বাজনাই যখন তালুকের সকলের

কর্ণেই তালা ধরাইয়া দিল, তখন কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না যে, আজু মিঞা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে উৎসাহ দিতে একটা ডুগডুগি বাজাইতেও কেহ নাই!

সত্যই, অদ্বৈত চৌধুরীর সহিত মামলা-যুদ্ধ বাধিতেই আজু মিঞা পণ করিয়াছিলেন,—হয় জিত্‌বো, নয় সর্ব্বস্ব খোয়াবো। জিতিতে তিনি পারেন নাই, কিন্তু সর্ব্বস্বই প্রায় হারাইয়াছিলেন। যাঁহার আঙ্গিনায় সারি সারি সাতটি গোলা ক্ষেত্রজাত নানাবিধ পণ্যে পূর্ণ থাকিত, সেগুলি শূন্যগর্ভ হইয়াছে। সুস্থ সবল পনেরো ষোলটি বলদ পর্য্যায়ক্রমে যাঁহার বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র সর্ব্বাগ্রে কর্ষণ করিয়া বীজ-বপনের উপযোগী করিয়া তুলিত, তাহারা একে একে অদৃশ্য হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে দেনা, সময় বুঝিয়া তাঁহার প্রজারাও হাত গুটাইয়াছে; বাকি খাজনার মামলা রুজু করিবার সুবিধা ও সামর্থ্য যে এখন আজু মিঞার নাই—নিরক্ষর হইলেও এটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধি তাহাদের ছিল। এদিকে জমিদার-সরকারের খাজনাও ক্রমশঃ বাকি পড়িতেছিল। অবশেষে হাইকোর্টের বিচারে এই জিদের মামলার চরম নিষ্পত্তি হইলে আজু মিঞা দেখিলেন, তাঁহার জিদটুকুই শুধু খোদা রক্ষা করিয়াছেন, অন্যান্য সকল বিষয়েই তাঁহাকে পথে বসাইয়া দিয়াছেন! এখন জিদের সঙ্গে প্রণষ্টপ্রায় মান-ইজ্জত উদ্ধার করিয়া পুনরায় পৈতৃক বাস্ত-ভিটায় বসিতে হইলে প্রায় দশটি হাজার টাকার প্রয়োজন! কিন্তু ইহার কোনও সম্ভাবনা বর্ত্তমানে তাঁহার পক্ষে ছিল না। সুতরাং টাকার সম্বন্ধে আর কোনও তদ্বির না করিয়া তিনি খোদার মর্জ্জির উপরই সর্ব্বান্তঃকরণে আত্মসমর্পণ করিলেন।

খোদার প্রতি মিঞা সাহেবের এই আকস্মিক নির্ভরতা দেখিয়া অনেকেই হাসিলেন, কেহ কেহ এমন মন্তব্যও প্রকাশ করিলেন যে,

দীর্ঘকাল আদালত-ঘর করিয়া আজু মিঞার মাথা খারাপ হইয়াছে। যাঁহারা একান্ত হিতৈষী, তাঁহারা পরামর্শ দিলেন, জমিদারের হাতে-পায়ে ধরিয়া মাপ চাও, একটা কিস্তিবন্দী করিয়া ফেল ; ভরাডুবি হইয়া মরিও না। কিন্তু আজু মিঞা দৃঢ়স্বরে জানাইয়া দিলেন—তা পারব না, খোদার কাছেই মাথা নুইয়ে দিলুম, যা করবার তিনিই করুন।

দিনের পর দিন যায়, আজু মিঞা দিব্য নিশ্চিন্ত, কিন্তু মহাল গোবিন্দপুরের হাজার হাজার বাসিন্দার চক্ষুতে ঘুম নাই ; তাহারা সদাই উৎকর্ণ, কখন আজু মিঞার চরম সর্ব্বনাশের সংবাদ পায়,—জমিদার তাহার যথাসর্ব্বস্ব ক্রোক করিয়া তাহাকে রাস্তায় নামাইয়া দেয়! কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে বিশাল মহালের সকল অধিবাসী, এমন কি মহালের অধিস্বামী সপারিষদ অদ্বৈত চৌধুরী পর্য্যন্ত বিপুল বিস্ময়ে শুনিলেন, যে কয়েক শত বিঘা জমি হাতছাড়া করিবার জন্ম আজু মিঞা সর্ব্বহারা হইতে বসিয়াছিল, সেই জমিটুকুই তাহাকে জমিদারের দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ হইতে এ যাত্রা উদ্ধার করিবার উপলক্ষ হইয়াছে ; অর্থাৎ কোনও এক অজ্ঞাতনামা খেয়ালী উক্ত বিবাদী জমি আজু মিঞার নিকট হইতে দশ হাজার টাকায় খরিদ করিয়াছে এবং আজু মিঞা বিক্রয়লব্ধ টাকায় সমস্ত দেনা শোধ করিয়া নির্দ্দায় হইয়া বসিয়াছে।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সর্ব্বত্রই একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গেল। প্রজাপক্ষের বিস্ময়ের অন্ত নাই ; জমিদার অদ্বৈত চৌধুরী সরোষে তর্জ্জন তুলিলেন,—লোকটা কে, আমার হাতের শিকারকে হাত দিয়ে আটকায়!

পারিষদবর্গ রায় প্রকাশ করিলেন,—এতো আজু মিঞাকে বাঁচানো হ'ল না, হুজুরকেই খাঁটানো হ'ল!

হুজুর আমলাদের উপর পরোয়ানা পাঠাইলেন,—খবরদার! যেই কিছুক ঐ জমি, যেন খারিজ না পায়।

কিন্তু যে লোক জমিদারির ঐ বাতিল জমি এত টাকায় কিনিয়াছিল, সে জমিদারি-সেরেস্তায় নাম খারিজ করিবার জন্য কোনওরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিল না। পক্ষান্তরে মামলা-সূত্রে এই জমি আজু মিঞার জমাবন্দি বলিয়া এমন স্পষ্টভাবে আদালতের নথিভুক্ত হইয়াছিল যে, তৃতীয় পক্ষের নির্দ্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত, জমিদার পক্ষ হইতে এই জমির বিরুদ্ধে আইনের অস্ত্র-নিক্ষেপের কোন উপায়ই ছিল না।

অনেক বুদ্ধি ব্যয় করিয়া ও আইনের দিক্‌পালদের সহিত পরামর্শ আঁটিয়া অদ্বৈত চৌধুরী এই মামলার এক অপূর্ব্ব চক্রব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যূহ-রচনায় কোনও দিক দিয়াই কোনও প্রকার গলদ ঘটে নাই। আজু মিঞা যে এই ব্যূহজাল হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না, উপরন্তু তাহার সমস্ত সম্পত্তি জমিদার সরকারে জব্দ হইয়া আয়ের অঙ্ক বাড়াইয়া দিবে, ইহাতেও সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কিন্তু অকস্মাৎ কে এই অবুঝ খেয়ালী—অভিমন্যুর মত দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিল? কে এমন নির্বোধ এবং অর্থের প্রতি এরূপ অকরুণ যে, সমগ্র জমিদারির মধ্যে যে ভূখণ্ড আবর্জ্জনার স্তূপের মত একান্তই পরিহার্য্য, যাহা হইতে উসুল করিবার কিছুই নাই, তাহার উপরেই অন্ধের মত দশ হাজার টাকা ঢালিয়া দিল? এই টাকায় ইচ্ছা করিলে সে তো একটা ছোটোখাটো রকমের জমিদারিই কিনিতে পারিত! কিন্তু কোনও সূত্রেই অর্থের প্রতি মায়া-মমতাহীন এই নির্বোধটির কোনও পরিচয় পাওয়া গেল না।

২

কিছুকাল পরে পরিচয় যেদিন প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন জমিদারির জঞ্জাল-স্বরূপ এই অঞ্চলটি আশ্রয় করিয়া এক অনবদ্য কর্ম্মশালা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহার নির্ম্মাণ-পারিপাট্যও নানাদিক দিয়া অর্থাগমের অভিনবত্ব সকলকে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছে। যাহা এ-অঞ্চলে কেহ দেখে নাই, সম্ভব বলিয়া ভাবে নাই, এই খেয়ালী মানুষটি অদ্ভুত কর্ম্ম-শক্তিতে তাহা সিদ্ধ করিয়াছে। পূর্ব্বের বিস্তীর্ণ বিশ্রী ভূভাগটী এখন একখানি ছবির মত পুরী হইয়াছে; ইহার চারিদিক পরিবেষ্টন করিয়া গভীর গড়খাই, তাহাতে জল থৈ-থৈ করে, ঝাঁকে ঝাঁকে কত রকমের মাছ খেলিয়া বেড়ায়। বিস্তীর্ণ গড়ের দুইধারে আরকর-গাছের সারি। যে দিকে পূতিগন্ধময় পঙ্কিল ডোবাগুলি ছিল, সেখানে এক মনোরম দীর্ঘিকা জলভারে টলমল করিতেছে। ইহারই সান্নিধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমি ব্যাপিয়া আধুনিক কৃষিক্ষেত্র,—প্রতীচ্যের আদর্শে তাহাতে বিবিধ শস্যের আবাদ চলিয়াছে। ক্ষেত্রস্বামীর নূতন পরিকল্পনায় পরিমিত ক্ষেত্রে অপরিমিত শস্যের উৎপত্তি দেখিয়া প্রাচীনপন্থী কৃষকগণ চমৎকৃত! বড় বড় ঢিপিগুলির চিহ্নও নাই, এখন সেখানে তাঁতশালা খোলা হইয়াছে। যেখানে ছিল হোগলা-হ্যাতালের জঙ্গল ও ভীতিপ্রদ ভাগাড়, সেখানে এখন সারি সারি তেল, আটা ও চিনির কারখানা চলিয়াছে এবং বিভিন্ন কর্ম্মবিভাগে যে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রবাহ বহিয়া থাকে, তাহাও কর্ম্মশালার নিজস্ব। কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যসমূহ প্রচুরভাবে সরবরাহ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই এই নূতন কর্ম্মক্ষেত্রটি যেমন প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে, ইহার আয়ও সেই অনুপাতে সকলের বিস্ময় গভীর করিয়া দিয়াছে।

সুতরাং এখন এ অঞ্চলের সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, চেষ্টা করিলে সকল জমিতেই সোনা ফলাইতে পারা যায়, কোনও জমিই অব্যবহার্য্য নহে। কিন্তু এই চেষ্টার সহিত কি পরিমাণ অর্থ এবং কিরূপ নিবিড় সাধনারও আবশ্যক, এ কথাটা সকল বুদ্ধিমান উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন কি?

অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ব্বের পরিত্যক্ত অঞ্চল জনকাশ্রম নামে সুপরিচিত হইয়া গেল এবং তাহার বুকের উপর যে বিশাল কর্ম্মশালা গড়িয়া উঠিতেছিল, অনেককেই তাহার সহিত যোগসূত্র রচনা করিতেও হইল কিন্তু ইহার প্রবর্ত্তক সেই অদ্ভুতকর্ম্মা খেয়ালী মানুষটির সন্ধান কেহ কোনদিন পাইল না। এ সম্বন্ধে কত জনরব কতভাবেই পল্লবিত হইয়া জনসাধারণের উদগ্র আকাঙ্ক্ষাকে স্ফীত করিয়া তুলিল, কিন্তু ইহার প্রবর্ত্তক লোকচক্ষুর অন্তরালেই রহস্যময় হইয়া রহিল। দেবতার মত দুর্ব্বোধ্য ও অদৃশ্য থাকিয়াই তিনি জনশক্তির অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিতেছিলেন।

কর্ম্মশালায় যেভাবে বৈদ্যুতিক শক্তিতে বিভিন্ন কলগুলি চলিতে থাকে, কর্ম্মচারীদিগকেও তাহার তালে তালে চলিতে হয়। কাজ ভিন্ন অন্য কোনও আলোচনা এখানে নিষিদ্ধ। যাহারা এখানকার কর্ম্মশালার সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহাদিগকে এখানেই থাকিতে হয়, এইখানেই তাহারা স্বল্প ব্যয়ে আহার পায়, বিনা ব্যয়ে বাসস্থান ও রাত্রে নির্দ্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টা পড়া-শুনা করিবার সুযোগ পায়; বাহিরের কাহারও সহিত ইহাদের মিশিবার উপায় নাই। সুতরাং ভিতরের কথা বাহিরের লোক কিছুই জানিতে পারিত না। তাহারা শুধু জানিত, কি কি পণ্য উৎপন্ন হইতেছে ও প্রত্যহ কিভাবে তাহারা বাহিরের চাহিদা মিটাইতে ছুটিয়াছে।

জনসাধারণের কৌতূহল একটা কল্পনা আশ্রয় করিয়া অনেক সময়

চরিতার্থ হয়, কিন্তু অদ্বৈত চৌধুরীর মত জবরদস্ত জমিদারের কৌতূহল ত আর এ ভাবে নিবৃত্ত হইতে পারে না। অপরিচিত অবধূতের নানা কীর্ত্তি তাহারই প্রতিষ্ঠিত গ্রামের নামটির সহিত মিশিয়া সর্ব্বক্ষণই তাঁহার কানে যেন খোঁচা দিতেছিল। তাঁহার অসীম ধৈর্য্য যখন অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল, তখন আবার তিনি হুঙ্কার তুলিলেন,—লোকটাকে তলব দাও, আমি তাকে দেখতে চাই।

ইহার হেতুও যথেষ্ট ছিল। এই অপরিচিত লোকটা তাঁহারই তালুকের ভিতর ঢুকিয়া এত বড় একটা কাণ্ড বাধাইয়াছে, সহস্র লোকের বাহোবা'র সহিত সুপ্রচুর অর্থ উপায় করিতেছে, মহালের মালিক হইয়া তিনি শুধু স্তব্ধ বিস্ময়ে এ পর্য্যন্ত তাহা শুনিয়াছেন ;—মানুষটার টিকিও তিনি দেখিতে পান নাই বা কোনও সূত্রে সে জমিদার-সেরেস্তায় জমিদারের কোনও মর্য্যাদা দেয় নাই ; তাঁহারই অধীনস্থ প্রজা গাঁতিদার আজু মিঞার জমাবন্দির ভিতরে থাকিয়া অনায়াসেই জমিদার-সরকারকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে! অথচ, আইন-সঙ্গত পথে ইহাকে ধরিবার ছুঁইবার কোনও উপায় নাই। কিন্তু উপায় একটা কিছু বাহির করিতে না পারিলে জমিদারের 'প্রেষ্টিজ' তো থাকে না! আজু মিঞার মত আরও বহু গাঁতিদার প্রজা তাঁহার বিভিন্ন তালুকে তো রহিয়াছে, তাহাদের জমাবন্দির ভিতরে ঢুকিয়া যদি এই শ্রেণীর আরও দুই চারিজন ফন্দিবাজ এইভাবে জঙ্গল ভাঙিয়া শহর বসায় এবং জমিদারকে রম্ভা প্রদর্শন করিয়া আমীর হইয়া উঠে, তখন জমিদারের অবস্থা কি হইবে?

অতএব, আইনবিদ্‌গণ উপযুক্ত উপায় বাতলাইতে পুনরায় আদিষ্ট হইলেন,—ঘন ঘন বৈঠক বসিতে লাগিল, সদর সেরেস্তা তাহার উচ্ছ্বাসে সরগরম হইয়া উঠিল।

৩

কে এই অপরিচিত অদ্ভুত মানুষ, যিনি দেবতার মত অদৃশ্য অথবা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া এই অঞ্চলের অধিবাসিগণকে চমৎকৃত ও অদ্বৈত চৌধুরীর ন্যায় জবরদস্ত জমিদারকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছেন?

অদ্বৈত চৌধুরী আইনের প্রতি গভীর নিষ্ঠাবান থাকিয়াও নিজে যেমন আইন-শাস্ত্রের সরকারী চাপরাশ বাঁধিবার যোগ্যতা পান নাই, বহু চেষ্টা করিয়া তাঁহার পুত্রগণকেও এইদিক দিয়া কৃতবিদ্য করিতে পারেন নাই। তিনি আশা করিয়াছিলেন, তিন পুত্র তিনটি আদালতের বারে তারকার মত নাম জাহির করিবে। কিন্তু তিন পুত্রই যখন উপর্য্যুপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় দরজায় হোঁচট খাইল, কিছুতেই প্রবেশ করিতে পারিল না, তখন তিনি তাহাদিগকে অগত্যা সদরের সেরেস্তায় বসাইয়া দিলেন এবং সঙ্কল্প করিলেন, এবার দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবেন। অর্থাৎ, কন্যা রেণুকার বিবাহ দিয়া জামাতাকে বারের উজ্জ্বল রত্ন করিয়া তুলিবেন।

এই সময় তিনি খবর পাইলেন, মহাল গোবিন্দপুরের হাইস্কুল হইতে তাঁহারই স্বজাতীয় একটি ছেলে সে বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। চৌধুরী মহাশয়ের চিত্ত অমনি দুলিয়া উঠিল, অনুসন্ধানে জানিলেন, ছেলের নাম রেবতী ঘোষাল, তাহার পিতা তাঁহারই তালুকে বাস করেন; নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, অতিশয় দরিদ্র, সামান্য কিছু ব্রহ্মত্র জমি আছে এবং এই পুত্রই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন।

অবিলম্বেই দীন দরিদ্র অঘোর ঘোষালের নিকট জমিদার অদ্বৈত

চৌধুরীর প্রস্তাব আসিল, প্রবেশিকা পরীক্ষায় রেবতীর কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া তিনি তাহাকে জামাতার মর্য্যাদা দিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। অতঃপর রেবতীর সকল ভার তিনিই গ্রহণ করিবেন।

ঘোষাল মহাশয় জমিদারের প্রস্তাবে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অসঙ্কোচেই জানাইলেন,—ইহা অসম্ভব, যেহেতু অদ্বৈত চৌধুরী বংশজ, তিনি স্বভাব-কুলীন। কৌলীন্যের মর্য্যাদা তিনি ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন না।

অদ্বৈত চৌধুরী জলিয়া উঠিলেন, কিন্তু দমিলেন না। কিছুদিন পরে সহসা গোবিন্দপুরের কাছারীতে খোদ জমিদারের শুভাগমন হইল; প্রজাগণ শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু যেদিন তাহারা দেখিল, জমিদারের পাল্‌কী অঘোর ঘোষালের পর্ণকুটিরের সম্মুখে থামিয়াছে এবং অদ্বৈত চৌধুরী সশরীরে কুটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছেন, সেদিন তাহাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

ইহার সপ্তাহ খানেক পরেই সকলে অবাক হইয়া শুনিল, অঘোর ঘোষালের ছেলে জমিদারের জামাতা হইবে, শুভ সংযোগের বিলম্ব নাই।

অঘোর ঘোষালের হৃদয়খানি জয় করিতে অদ্বৈত চৌধুরীকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই,—তবে কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। রেবতীর নামে ভবানীপুরের একখানি মূল্যবান বাড়ী নির্ব্যূঢ় সত্বে লিখিয়া দিয়া তবে তিনি কন্যাদানের অধিকার পাইয়াছিলেন।

বিবাহের পর অদ্বৈত চৌধুরী যেন হিসাব করিয়াই অঘোর ঘোষালের স্পর্দ্ধাগুলির প্রতিশোধ তুলিতে মনোযোগী হইলেন। তাঁহার কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থায় রেবতী এমন আবেষ্টনের মধ্যে বাঁধা পড়িল যে, পিতা বা জন্মভূমির সহিত দেখা-সাক্ষাতের সম্ভাবনা রহিত হইয়া গেল। আই, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রেবতী যখন পিতার পাদতলে উপস্থিত হইয়া আশীর্ব্বাদ-

ভিক্ষার প্রস্তাব তুলিল, শ্বশুর গম্ভীরমুখে বলিলেন—তোমার বাবাকে আগেই পাসের খবর দিয়েছি, তিনি নিজেই আসছেন তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে। ইহার দুই চারিদিন পরেই ঘোষাল মহাশয় জমিদার বৈবাহিকের প্রাসাদে উপনীত হইলেন; তাঁহার আদর-অভ্যর্থনার ত্রুটি অবশ্য হইল না, পুত্রের সহিত দুই চারিটি কথা কহিবারও সুযোগ ঘটিল,—কিন্তু এই পর্য্যন্ত! তাহার পরদিনই জমিদারী-কায়দায় বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া ঘোষাল মহাশয় বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন। বৈবাহিককে বিদায় দিবার সময় অদ্বৈত চৌধুরী গম্ভীরভাবেই জানাইয়া দিলেন,—আমার কি জেদ জানেন বেয়াই মশাই; রেবতীকে বারের উজ্জ্বল রত্ন ক'রে তুলবো। রত্ন হ'তে হ'লে, দুর্ল্লভ হওয়াটা স্বাভাবিক; এই জন্যই এত কড়াকড়ি, এখন ওর সাধনা চলেছে, সিদ্ধ হ'তে দিন।

৪

ইহার কিছুকাল পরে অঘোর ঘোষালকে আর একবার হঠাৎ জমিদার-বৈবাহিকের বালিগঞ্জের প্রাসাদে আসিতে দেখা গিয়াছিল! সে সময় বি, এ, পরীক্ষার বোধনের বাতাস বহিয়াছে, ছাত্রসমাজে চাঞ্চল্যের অন্ত নাই। এমন অসময়ে বৈবাহিককে দেখিয়া অদ্বৈত চৌধুরী সবিস্ময়ে শুষ্ক-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—ব্যাপার কি, হঠাৎ যে?

অঘোর ঘোষাল হাসিমুখে উত্তর দিলেন,—ভয় নেই, আপনার জামাতার তপস্যা ভঙ্গ করতে আসিনি; আমি এসেছি অন্য কাজে।

কিন্তু কাজের কথাটি পাড়িতেই অদ্বৈত চৌধুরীর মূর্ত্তি একেবারে

বদলাইয়া গেল, দুই চক্ষু পাকাইয়া বিদ্রূপের সুরে কহিলেন,—কি বললেন, কি বললেন, আজু মিঞা আপনার বাল্যবন্ধু, এক পাঠশালায় পড়েছেন, বটে—বটে—

অঘোর ঘোষাল অকুণ্ঠিতকণ্ঠে পুনরায় কহিলেন,—শুধু তাই নয়, দায়ে-অদায়ে অনেক সাহায্য তার কাছে পেয়েছি, রেবতী যে স্কুলে পড়ত, সব মাসে তার মাইনে জোগাতে পারিনি, কিন্তু আজু তা জানতে পেরে আমাকে না জানিয়ে কতবার নিজেই তার মাইনে জমা ক'রে দিয়েছে; সে আজু আজ আপনার কোপে পড়ে' সর্ব্বস্ব খোয়াতে বসেছে—

তাই এসেছেন তার পক্ষ নিয়ে আমাকে সুপারিশ করতে! কিন্তু আগে এ সব কথা বলেন নি কেন? যখন রেবতীর বিয়ের কথা হয়েছিল, তখনো তো মামলা চলছিল?

তখন বললে কি কোনো সুবিধে হত?

আর কিছু হোক না হোক, যে লোক আজু মিঞার মত একটা বিদ্রোহী প্রজার সঙ্গে এত বাধ্য-বাধকতা রাখে, তার ছেলের হাতে কখনো মেয়ে দেওয়া হ'ত না।

কথার পিঠে এমন নির্ঘাত কথা শুনিবেন, ঘোষাল মহাশয় তাহা কল্পনাও করেন নাই; মুহূর্ত্তে তাঁহার মুখখানা ছাইয়ের মত বিবর্ণ হইয়া গেল, একটি কথাও আর বাহির হইল না।

কিন্তু পরক্ষণে অদ্বৈত চৌধুরীর বিকৃত মুখ দিয়া যে কথা কয়টি বাহির হইল, তাহা যেমন সাংঘাতিক তেমনই মর্ম্মন্তুদ! কঠোরভাবেই তিনি জানাইয়া দিলেন,—যে লোক আজু মিঞার দলে, তার জায়গা এখানে নেই। তার সঙ্গে কোনো কথাই আর হ'তে পারে না।

ইহার উপর আর কোনও কথা চলে না, কিছুমাত্র আত্মসম্মান বোধ

থাকিলেও আর এক মুহূর্ত্ত এখানে থাকা যায় না। সুতরাং নিরুত্তরেই ঘোষাল মহাশয়কে বৈবাহিকের বৈঠকখানা হইতে উঠিতে হইল।

কিন্তু অদ্বৈত চৌধুরীর কঠোর অনুশাসনে এই অপ্রিয় ঘটনার বিষয় অপ্রকাশ রহিয়া গেল, এই সম্বন্ধে রেবতী বা পরিবারের আর কেহই কিছুই জানিবার অবকাশ পাইল না।

অঘোর ঘোষাল আজুকে জানাইয়া বা তাহার মত লইয়া অদ্বৈত চৌধুরীর সহিত রফা করিতে আসিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিলে আজু মিঞার প্রতি অবিচার করা হইবে। ঘোষাল মহাশয় সর্ব্বস্বান্ত বন্ধুর বিপদ বুঝিয়া নিজেই বৈবাহিকের নিকট তাহার সম্বন্ধে কোনও সুব্যবস্থা করিবার আশায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু জমিদার-বৈবাহিক যে তাঁহাকে এমন আঘাত দিবেন, তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

কয়েকদিন পরে গোবিন্দপুরের সেরেস্তা হইতে সংবাদ আসিল, অঘোর ঘোষাল মৃত্যুশয্যায়, অবস্থা আশাপ্রদ নহে; সত্বর তাঁহার পুত্রের উপস্থিতি আবশ্যক।

সংবাদটা অদ্বৈত চৌধুরীর বুকে একটু দোলা দিল,—কিন্তু পরক্ষণেই কঠোর অনুশাসন জারী হইল, যেন এ সংবাদ ব্যক্ত না হয়।

ব্যক্ত না করিবার বিশেষ কারণও ছিল। তখন বি, এ, পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। রেবতী পরীক্ষা দিতেছে। এ সময় এমন সাংঘাতিক সংবাদ প্রচারিত হইলে, সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে, এই বৎসর তাহার পরীক্ষা দেওয়া হইবে না। তবে বিচক্ষণ ভূস্বামী বৈবাহিকের অবস্থার কথা জামাতার নিকট গোপন রাখিলেও, তৎক্ষণাৎ গোবিন্দপুরের সেরেস্তায় এই মর্ম্মে এক হুকুম পাঠাইলেন যে, অঘোর ঘোষালের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার যেন কোনও ত্রুটি না হয়।

৫

যেদিন বি, এ, পরীক্ষা শেষ হইল, সেইদিনই বাড়ীতে ফিরিয়া রেবতী অত্যন্ত কুণ্ঠার সহিত শ্বশুরকে জানাইল,—বহুকাল দেশে যাইনি, আপনার যদি আপত্তি না থাকে—কালই দেশে গিয়ে বাবার আশীর্ব্বাদ নিয়ে আসি।

সজোরে একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া অদ্বৈত চৌধুরী কহিলেন,—সে পাঠ চুকে গেছে রেবতী, আজ তিনদিন হ'ল তোমার বাবা স্বর্গারোহণ করেছেন।

শ্বশুরের কথাগুলি যেন একটা প্রচণ্ড বিদ্যুৎ-প্রবাহের তীক্ষ্ণ আঘাত দিয়া রেবতীকে স্তব্ধ ও আড়ষ্ট করিয়া দিল। দীর্ঘায়ত দুইটি চক্ষুর নিষ্প্রভ ও নিষ্পলক দৃষ্টি শ্বশুরের মুখের উপর স্থাপন করিয়া সে কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া রহিল।

মুহ্যমান জামাতার মনের অবস্থা বুঝিয়া বুদ্ধিমান শ্বশুর এইবার সময়োচিত ভঙ্গী ও স্বরে কহিলেন,—শুনলুম, সন্ন্যাস-রোগের মত হয়েছিল, জ্ঞান গোড়া থেকেই হারিয়েছিলেন, কোনও কথা বলতে পারেন নি। তবে চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হয় নি। শেষের কাজও সুচারুভাবেই সম্পন্ন করা হয়েছে।

স্তব্ধ প্রকৃতিকে বিক্ষুব্ধ করিতে কাল বৈশাখীর ঝড় যেমন দুর্ব্বার হইয়া উঠে, রেবতীর আড়ষ্ট দেহখানি মথিত করিয়া ঠিক সেইভাবেই শোকের আবর্ত্ত বহিল; উচ্ছ্বসিত আর্ত্তকণ্ঠে সে চীৎকার তুলিল,—কি বলছেন আপনি,—বাবা নেই! বাবা—বাবা—আমার বাবা—

বাড়ীর সকলেই উৎকর্ণ হইয়া ছিল, যে ঘরে শ্বশুর-জামাতার কথা

চলিয়াছিল, তাহার দ্বার ও গবাক্ষগুলির পথে অন্তঃপুরিকাদের দেহছায়া পড়িল।

অদ্বৈত চৌধুরী পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন এবং এই মর্ম্মন্তুদ ব্যাপারটির একটা সিদ্ধান্তও স্থির করিতে ভুলেন নাই। এবার সান্ত্বনার সুরে কহিলেন,—তুমি বুদ্ধিমান, লেখা-পড়া শিখেছ, তোমাকে বেশী কি বোঝাবো বাবা! জানি, এ শোকে সান্ত্বনা দেবার কিছু নেই, কিন্তু এটাও ঠিক, বাবা কারুর চিরদিন থাকে না, একদিন না একদিন—

শ্বশুরের সান্ত্বনা রেবতীর শোকমথিত চিত্তে কোনও ছাপ দিতে পারিল না, সে তাঁহার কথায় এই প্রথম বাধা দিয়া সরোদনে প্রশ্ন করিল,—বাবা অসুখে পড়েছিলেন, এ খবর নিশ্চয়ই এখানে এসেছিল, কিন্তু আমাকে সে কথা জানান নি কেন?

দিব্য সহজকণ্ঠে অদ্বৈত চৌধুরী উত্তর দিলেন,—তোমারই ভালোর জন্য; খবর পেলে, তোমার পরীক্ষা এবার কিছুতেই দেওয়া হত না।

রোদনের আবর্ত্তে ভগ্নকণ্ঠে রেবতী কহিল,—নাই বা দেওয়া হ'ত পরীক্ষা, না হয় একটা বছর নষ্টই হ'ত,—এর জন্য বাবাকে হারালুম! তাঁর সেবা একটি দিনও করতে পারলুম না, চোখের দেখাও—ও! বাবা! বাবা! একি অপরাধী আমাকে ক'রে গেলেন! এর ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই,—উঃ!

অদ্বৈত চৌধুরী এবার স্বর কিঞ্চিৎ দৃঢ় করিয়া কহিলেন,—এতটা চঞ্চল হ'য়ো না রেবতী, তুমি ছেলেমানুষ নও; বুক বাঁধো, তাঁর কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, তার জন্য প্রস্তুত হও।

রেবতী কোনও উত্তর দিল না, শোকের প্রাথমিক উচ্ছ্বাস তখন হ্রাস পাইলেও দুর্ব্বার অশ্রু প্রবোধ মানে নাই। অন্তরের অন্তস্তলে পিতার

সেই সৌম্যমূর্ত্তি অতীতের কত স্মৃতিই ছায়াচিত্রের মত পর পর দেখাইয়া অশ্রুর প্রবাহ ছুটাইয়াছিল।

অদ্বৈত চৌধুরী কহিলেন,—শাস্ত্রে আছে, আতুরের পক্ষে নিয়ম ভঙ্গে দোষ হয় না। তোমারও দোষ হয় নি,—পরীক্ষার্থীর অবস্থাও যে আতুরের অবস্থা। তোমার বাবা স্বর্গ থেকে তোমার এই অবস্থা দেখেছেন, এতে কোনো অপরাধই তোমার হয় নি। এবার শুদ্ধ হও, পুরুত ঠাকুরকে খবর দেওয়া হয়েছে, তিনি এসে যা যা করবার, সবই করাবেন।

দুই হাতে দুই চক্ষুর অবিরল অশ্রু মুছিতে মুছিতে রেবতী কহিল,—অনুমতি করুন আমি দেশে যাই, বাবা যেখানে শেষ নিশ্বাস ফেলেছেন, আমি সেখানে গড়াগড়ি দেব, বাবার যা কিছু কাজ সেখানেই করব।

অদ্বৈত চৌধুরী মুখখানি এইবার রীতিমত গম্ভীর করিয়া কহিলেন,—এজন্য তুমি বৃথা ব্যস্ত হচ্ছ, তোমার বাবার সেখানকার অস্থাবর সমস্ত স্মৃতিচিহ্নই এখানে আনা হয়েছে।

রেবতী আবার উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে রোদনের রোল তুলিল,—বাবা, বাবা! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই,—তুমি আমাকে ডেকে নাও, কাছে টেনে নাও—

অদ্বৈত চৌধুরীর ইঙ্গিতে এই সময় পুরমহিলারা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া শোকার্ত্ত রেবতীকে আর এভাবে আর্ত্তকণ্ঠের উচ্ছ্বাস তুলিতে দিলেন না, কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন।

৬

রেবতীর পিতার শ্রাদ্ধ-শান্তি রেবতীর শ্বশুরের অর্থে শ্বশুরালয়েই সম্পন্ন হইয়া গেল। যথাসময়ে বি, এ, পরীক্ষার ফলও বাহির হইল, জানা গেল, এ পরীক্ষাতেও রেবতী প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। অদ্বৈত চৌধুরী রেবতীকে ডাকিয়া হাসিমুখে কহিলেন,—কেমন, এখন বুঝতে পেরেছ, কেন সে সময় আমাকে অতটা কঠিন হ'তে হয়েছিল—পরীক্ষা ফেলে তখন দেশে গেলে বাবাকে বাঁচাতে পারতে না, মাঝ থেকে এই সুযোগটুকু হারিয়ে ফেলতে!

রেবতী কথাটার কোনও উত্তর দিল না, শ্বশুরের মুখের দিকে মর্ম্মভেদী দৃষ্টিতে একটিবার শুধু চাহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। অদ্বৈত চৌধুরী আড়নয়নে রেবতীর গতির দিকে চাহিয়া মনে মনে হাসিলেন, সে হাসির অর্থ অন্যের দুর্ব্বোধ্য।

অনেক সময় দেখা যায়, অতি বড় হিসিবি মানুষও হিসাবে ভুল করিয়াছিলেন এবং এমন সময় অসময়ে ইঁহাদের হিসাবের ভুল ধরা পড়ে, যখন সংশোধনের পথঘাট সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অদ্বৈত চৌধুরী যদিও সব কাজ হিসাব করিয়াই করিতেন, কিন্তু একটি বিষয়ে তিনিও ভুল করিয়া বসিলেন। জামাতার শোকার্ত্ত চিত্তে সান্ত্বনার ব্যবস্থা দিতে মৃত অঘোর ঘোষালের স্মৃতিবিজড়িত যে সকল অস্থাবর সম্পত্তি বালিগঞ্জের বাটীতে আনাইয়াছিলেন, খাতা-পত্রের একটি দপ্তরও তাহাদের সামিল হইয়া আসিয়াছিল।

মৃত্যুর পূর্ব্বে মর্ম্মাহত অঘোর ঘোষাল তাঁহার মর্ম্মবাণী যে কালি-মলমে

ফুটাইয়া সেই দপ্তরের ভিতর পুত্রের উদ্দেশে সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন এবং সেই সঞ্চিত বস্তুটি একদিন অকস্মাৎ রেবতীর হাতে উঠিয়া তাহার ঘাত-প্রতিঘাত-বিহীন কোমল চিত্তটির উপর কিরূপ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়াছিল, সে সন্ধান বালিগঞ্জের প্রাসাদের কেহ পায় নাই। রেবতীও কোনদিন কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই যে, পিতার দপ্তর ঘাঁটিয়া কি প্রকার অজ্ঞেয় অভিজ্ঞান সে আহরণ করিতে পারিয়াছে। বরাবরই রেবতী অল্পভাষী, তর্কক্ষেত্রেও সংযত-বাক্, প্রকৃতিও তাহার বয়সের অনুপাতে আশ্চর্য্য রকম গম্ভীর। অতঃপর বালিগঞ্জের বাড়ীর যদি কেহ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রেবতীর মনোভাব নির্ণয়ের প্রয়াস পাইতেন, তাহা হইলে হয়ত এই অনুমান তাঁহার পক্ষে নিরর্থক হইত না যে, রেবতীর সদা-গম্ভীর প্রশান্ত মুখখানার উপর একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃঢ়তার আবরণ পড়িয়াছে!

আইন পড়ার প্রসঙ্গ উঠিতেই অদ্বৈত চৌধুরী কহিলেন,—আমার ইচ্ছা, রেবতী বিলেতে থেকেই আইনটা পড়ুক, তারপর সেখান থেকে পাশ ক'রে একেবারে ব্যারিষ্টার হ'য়ে ফিরুক। সকলেই কথাটার সমর্থন করিলেন। কিন্তু যে পড়িবে, তাহাকে এ সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা হইল না, হয়ত ইহার প্রয়োজনও কিছুই ছিল না; এবং রেবতীর যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে নির্ব্বিচারেই তাহার পক্ষে এই প্রস্তাবে সায় দিবার কথা। কিন্তু সহসা সকলকে চমৎকৃত করিয়া রেবতী একদিন শ্বশুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রশ্ন করিল,—আপনার কি একান্তই ইচ্ছা যে, আমি বিলেতে গিয়ে আইন পড়ি?

রেবতী সম্মুখে আসিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিবে, অদ্বৈত চৌধুরী এরূপ কল্পনা করেন নাই। জামাতার অনুচিত স্পর্দ্ধায় তিনি একটু বিরক্ত হইলেন এবং কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণ করিয়া কহিলেন,—শুধু আমার ইচ্ছাই

বা কি ক'রে বলি, তোমারও জেনে রাখা উচিত, ঐ পথেই এখন তোমার তপস্যা ; সিদ্ধিলাভ করা চাইই।

রেবতী স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল,—নূতন পথেই যে এখন আমার তপস্যা, এ অনুভূতি আমি আগেই পেয়েছি। এখন শুধু আপনার কাছে এই প্রার্থনাই জানাচ্ছি, সিদ্ধিলাভ না করা পর্য্যন্ত আমি নির্লিপ্তভাবে অর্থাৎ সমস্ত যোগসূত্র ছিঁড়ে ফেলে তপস্যায় বসতে চাই।

অদ্বৈত চৌধুরী হাসিয়া কহিলেন,—উত্তম প্রস্তাব, এতে আমার কোনো আপত্তি নাই।

৭

অদ্বৈত চৌধুরী ভবানীপুরে যে মূল্যবান বাড়ীখানি বিবাহের সময় রেবতীকে দান করিয়াছিলেন, রেবতীর পিতাই তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। অরবিন্দ গুপ্ত নামে এক বিলাতফেরত অধ্যাপক এই বাড়ী দীর্ঘকালের লিজ লইয়াছিলেন এবং এই সূত্রে রেবতীর সহিত প্রফেসর গুপ্তের বিশেষ বাধ্যবাধকতার সুযোগ ঘটিয়াছিল। ইনি যে কেবল কেতাবের-পাতার ভিতর কীটের মত বাস করিয়া এদেশের ও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাধির সুদীর্ঘ মালা গলায় দুলাইয়া ছাত্র-সমাজের বিস্ময়ের বিষয় হইয়াছিলেন, ইঁহার সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না, বরং ইহাও অনায়াসে বলিতে পারা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে যে রহস্যময় বিশ্ব পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা হইতে বহু জটিল তথ্য আবিষ্কার ও সেই সম্পর্কে গুরুতর সমস্যাগুলির সমাধানের দ্বারা ছাত্রমহলে চাঞ্চল্য তুলিতেন। জাপান, আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া, ইটালী ও

নবীন জার্ম্মাণীর নানা অংশ পরিভ্রমণ ও সেইসকল রাষ্ট্রের পল্লী-অঞ্চলগুলিকে আধুনিক উন্নত পরিকল্পনায়, কৃষি-শিল্পের সহায়তায় শ্রীসম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে হাতে-কলমে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কত বক্তৃতাই দিতেন। অধিকাংশ ছাত্রই বক্তৃতার পর মুখ টিপিয়া হাসিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিত—নানা দেশ ঘুরে, নানা জায়গায় ভালমন্দ অনেক কিছুই দেখে, গুপ্ত সাহেবের মাথার স্ক্রু-গুলো ঢিলে হয়ে গেছে! শুধু রেবতী একাই মুগ্ধের মত অধ্যাপক গুপ্তের এ সব অবান্তর কথা শুনিত, প্রশ্ন করিত এবং সময় সময় বাসায় গিয়া এ সম্বন্ধে অনেক কিছু আলোচনাও করিত।

পিতার দপ্তর হইতে যে অভিজ্ঞান রেবতী পাইয়াছিল, তাহার সমাধান করিতে ইদানীং বহু সময়ই সে গুপ্ত সাহেবের বাসায় কাটাইত। এ সম্বন্ধে যখন এক বিরাট পরিকল্পনা পল্লবিত হইতেছিল, ঠিক সেই সময় গুরু-শিষ্য সবিস্ময়ে শুনিলেন, রেবতীকে আইন-শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠাইতে অদ্বৈত চৌধুরী বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহার পরই গুরু-শিষ্যের গুপ্ত মন্ত্রণা এবং শ্বশুরের সমক্ষে উপনীত হইয়া রেবতীর উক্ত প্রস্তাব।

কিন্তু রেবতী সমস্ত পথ-ঘাট বন্ধ করিয়া বিলাতে বসিয়া সিদ্ধির জন্য তপস্যা করিবে, এ সম্বন্ধে যখন অদ্বৈত চৌধুরীর অন্তঃপুরে আশঙ্কাস্বরে প্রতিবাদ উঠিল এবং তাহাতে চৌধুরী মহাশয়ের পরিপুষ্ট গুম্ফজোড়াটিও সংশয়ের আবর্ত্তে সহসা স্ফীত হইল, ঠিক সেই সময় গুপ্ত সাহেব অপ্রত্যাশিতভাবে বালিগঞ্জের প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া সকলের সংশয়াতঙ্ক মোচন করিয়া দিলেন।

তাঁহার ব্যবস্থায় ইহাই অবধারিত হইল যে, তিনিই মধ্যস্থরূপে দুইপক্ষের যোগসূত্র ধরিয়া থাকিবেন। রেবতী তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র,

যাহাতে তাহার ঈপ্সিত তপস্যায় সে সিদ্ধ হইতে পারে, ইহা তাঁহারও একান্ত কাম্য, সুতরাং তাঁহার উপর ভার দিয়া রেবতীর সম্বন্ধে এ পক্ষ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

দীর্ঘ পাঁচটি বৎসর এ পক্ষ নিশ্চিন্তই ছিলেন। রেবতীর সঠিক ঠিকানা যদিও তাঁহাদের পাইবার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু প্রতিমাসেই নিয়মিত ভাবে তাহার হাতের লেখা সংক্ষিপ্ত চিঠি তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিত। চিঠি অবশ্য আসিত গুপ্ত সাহেবের বাসায় তাঁহারই নামে; চিঠির ভিতরে অদ্বৈত চৌধুরীর নামের চিরকুটখানি রেবতীর তপস্যার সংক্ষিপ্ত সংবাদটুকুই শুধু বহন করিয়া আনিত।

গুপ্ত সাহেবের মারফত প্রথম যে চিরকুট অদ্বৈত চৌধুরী পাইলেন, তাহার বয়ান ছিল এইরূপ :—

"শ্রীচরণেষু, তপস্যার স্থান পাইয়াছি; শীঘ্রই সাধনা আরম্ভ করিব। ভূমিষ্ঠ প্রণাম গ্রহণ করুন—রেবতী!"

কয়েক সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় চিরকুট সংবাদ আনিল,—

"শ্রীচরণেষু,—তপস্যা আরম্ভ করিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করুন যেন সত্বর সিদ্ধিলাভে সমর্থ হই। ভূমিষ্ঠ প্রণাম গ্রহণ করুন। প্রণত -রেবতী।"

দীর্ঘ পাঁচটী বৎসর ধরিয়া প্রায় প্রতিমাসেই এইভাবে এক একখানি চিরকুট আসে। তাহাতে রেবতীর তপস্যার কথা ভিন্ন অন্য কিছুই থাকে না।

পাঁচটি বৎসর পূর্ণ হইলেও রেবতীর সিদ্ধিলাভের যখন কোনও নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া গেল না, তখন অদ্বৈত চৌধুরীর অন্তঃপুরে চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গেল, তিনিও অধীর হইয়া উঠিলেন। কিন্তু গুপ্ত সাহেব এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন,—রেবতীর সাধনার সঙ্গীন সময় চলেছে,

এখনো দুটি বৎসরের ওয়াস্তা, তপস্যা তার ভঙ্গ করিবেন না, সিদ্ধ হ'তে দিন।

সাত বৎসর পূর্ণ হইলে যে চিরকুটখানি অদ্বৈত চৌধুরী পাইলেন, তাহাতে রেবতী বড় বড় অক্ষরে লাল কালিতে লিখিয়াছিল,—

"কিরূপ তপস্যায় রত হইয়াছি ও কতটা সিদ্ধিলাভ করিয়াছি, সে পরিচয় বোধ হয় পাইয়াছেন। সবিশেষ সাক্ষাতে জানাইব।"

অদ্বৈত চৌধুরী চিরকুট পড়িয়া বিস্মিত হইলেন, সমস্যায় পড়িলেন। সিদ্ধির জন্য তপস্যা চলিয়াছে, আশার আলোও দেখিতেছে, সাফল্যের সম্ভাবনা আছে,—এই ধরণের চিরকুটই রেবতী বরাবর তাঁহাকে পাঠাইয়াছে, কিন্তু এইবার হঠাৎ এরূপ লিখিবার উদ্দেশ্য কি? সে ত তপস্যায় তাহার ও সিদ্ধির কোনও পরিচয় ইতিপূর্ব্বে দেয় নাই! তবে?

অধ্যাপক গুপ্তের নিকট লোক পাঠাইলেন এই রহস্যের উদ্ঘাটন করিতে। কিন্তু তিনিও বিশেষ কিছু জানাইতে পারিলেন না, এইমাত্র বলিলেন,—সম্ভবতঃ রেবতী সশরীরে উপস্থিত হ'য়েই তার সিদ্ধির কথা জানাবে। সুতরাং এখন ধৈর্য্য অবলম্বনই শ্রেয়ঃ।

অদ্বৈত চৌধুরী রীতিমত চটিলেন, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। রেবতীর এই ধরণের পত্র ও অধ্যাপক গুপ্তের ব্যবহারে আন্তরিকতার অভাব তাঁহার ধৈর্য্যকে ক্রমশঃই চঞ্চল করিতেছিল।

এদিকে জনকাশ্রমের খ্যাতিও ক্রমশঃই দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিতেছিল। নূতন মালিক এ পর্য্যন্ত নাম খারিজ করিল না, বশ্যতা স্বীকার করিতে আসিল না, তলব দেওয়া সত্ত্বেও দেখা দিল না। জমিদারের ধৈর্য্য ইহাতে কতদিন অটল থাকে?

অদ্বৈত চৌধুরীর আইনবিদ্‌গণ বহু গবেষণার পর যে দিন জনকাশ্রমকে জব্দ করিতে কতকগুলি অজুহাত তৈয়ারী করিয়া ফেলিলেন, তাহার পরদিনই আর এক সঙ্গীন মামলা-যুদ্ধের উদ্যোগপর্ব্ব আরম্ভ হইল।

যুদ্ধের চরম পত্র যদিও আজু মিঞার বরাবর প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু সে পত্রখানা লইয়া যিনি সন্ধির দূত হইয়া আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই অদ্বৈত চৌধুরী চমৎকৃত হইয়া কহিলেন,—গুপ্ত সাহেব, আপনি!

সহজকণ্ঠেই গুপ্ত সাহেব কহিলেন,—জানেন না বুঝি, আমিও যে জনকাশ্রমের একজন কর্ম্মসচিব! কর্ম্মকর্ত্তারা ব্যাপারটার নিষ্পত্তির ভার আমাকেই দিয়েছেন।

অদ্বৈত চৌধুরী মনের বিস্ময় গোপন করিয়া কহিলেন,—কিন্তু ওদের সঙ্গে আমার ত কোনো সম্বন্ধই নেই, যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ, তাকেই আমি টেনেছি।

গুপ্ত সাহেব হাসিয়া কহিলেন,—আপনি হচ্ছেন ঝুনো জমিদার, জানেন যে, কান টানলেই মাথা আসবে, তাই আজু মিঞাকে টেনেছেন, আর জানিয়েছেন—পঞ্চাশ হাজার টাকা খেসারৎ না দিলে নজুল জায়গাটুকু সমস্তই সরকারে জব্দ ক'রে নেবেন। কিন্তু অকারণ এ সব হাঙ্গামা বাধিয়েছেন কেন বলুন তো?

অদ্বৈত চৌধুরী জ্বলিয়া উঠিলেন, তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন,—দেখুন গুপ্ত সাহেব, ছেলে-চরানো আপনার কাজ, জমিদারী হাঙ্গামায় মাথা দেবেন না, আপনি এর কিছু বুঝবেন না।

গুপ্ত সাহেব পূর্ব্ববৎ হাসিমুখেই কহিলেন,—আমি যেসব ছেলে চরিয়েছি, তাদের অনেকেই এখন বাঙ্গালার মাথাওয়ালা জমিদার হয়ে

বসেছে। সে যাক, দূত হ'য়ে যখন আমাকে আসতে হয়েছে, অনধিকারী হ'লেও আমার সঙ্গে আপনাকে আলোচনা করতে হবে।

অদ্বৈত চৌধুরী ক্রোধ দমন করিয়া কহিলেন,—শুধু অনধিকারী নন, একেবারে আনাড়ী; নতুবা, আমার তালুকের যেখানে আমার অনুমতি না নিয়ে সহর-পত্তন হয়েছে, ইট গেড়েছে, পুকুর কাটিয়েছে, কারখানা বানিয়েছে, জমির আমূল সংস্কার করেছে, আমি তার খেসারত চেয়েছি ব'লে, আপনি কিনা অম্লানবদনে বললেন—অকারণ কেন হাঙ্গামা বাধাচ্ছি?

গুপ্ত সাহেব কহিলেন,—কিন্তু আজু মিঞা এই জমিদারীর তিন পুরুষ ধ'রে গাঁতিদার প্রজা; আপনি কি জানেন না, ছোটো খাটো প্রজাদের ভেতরে যারা পর পর বিশ বছরের দাখিলা সেটেলমেণ্টের হাকিমকে দেখাতে পেরেছে, জমিদারের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তাদের জমি মৌরসী মোকররী সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং আজু মিঞার ওপর এ নোটিশ আপনি কি অধিকারে দিয়েছেন?

তর্জ্জনের সুরে অদ্বৈত চৌধুরী এবার কহিলেন,—এর মীমাংসা হবে আদালতে, আপনার কাছে কাজের জবাবদিহি ক'রতে অদ্বৈত চৌধুরী নারাজ; তবে জেনে রাখবেন, বিলেত পর্য্যন্ত এ মামলার শ্রাদ্ধ গড়াবে।

গুপ্ত সাহেব কহিলেন,—কিন্তু আপনারও জানা উচিত ছিল চৌধুরী মশাই, জনকাশ্রমের যিনি মালিক গভর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী নিয়ে তবে তিনি এ কাজে হাত দিয়েছিলেন, আর বিলেত পর্য্যন্ত ছোটবার মত সামর্থ্য তাঁরও আছে। কিন্তু তবুও, নানাসূত্রে তিনি মামলার পক্ষপাতী নন, আপোষেই এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করতে চান, সেইজন্যই আমি এসেছি।

অদ্বৈত চৌধুরী গম্ভীরভাবে কহিলেন,—কিভাবে আপোষ করতে চান শুনি?

গুপ্ত সাহেব কহিলেন,—জনকাশ্রমের যিনি প্রতিষ্ঠাতা এবং মালিক, তিনি স্বয়ং সশরীরে আপনার সেরেস্তায় হাজির হ'য়ে নাম খারিজ ক'রতে চান। আপনিই দিন ধার্য্য করে দিন।

কিছুক্ষণ মনে মনে কি ভাবিয়া অদ্বৈত চৌধুরী কহিলেন,—তার নাম? লোকটার পরিচয় কি শুনি?

গুপ্ত সাহেব কহিলেন,—পরিচয় তিনি নিজে এসেই দেবেন।

গোঁফের ভিতর দিয়া হাসির একটু ঝিলিক তুলিয়া অদ্বৈত চৌধুরী কহিলেন,—তাহলে পয়লা আষাঢ় দিন স্থির রইল, ঐ দিন এ সেরাস্তার পুণ্যাহ, ওঁর নামটাই খোকায় প্রথম পত্তন ক'রে নেওয়া যাবে।

গুপ্ত সাহেব কহিলেন,—এতে তাঁকে যথেষ্ট সম্মান দেওয়া হবে।

অদ্বৈত চৌধুরী কহিলেন,—অবশ্য, যদি তিনি পুণ্যাহের পূর্ব্বক্ষণেই আসেন। নাম তাঁর জানা না থাকলেও, তাঁর কীর্ত্তি আজ সবাই জানছে, জনকাশ্রমের জন্য আমার জমিদারীর গৌরব বেড়েছে; এই সূত্রে রাজা-প্রজা সম্বন্ধ যদি পুণ্যাহের দিনেই সংগঠন হয়, সেটা উভয় পক্ষেরই মঙ্গলের কথা।

গুপ্ত সাহেব কহিলেন,—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, শুভলগ্নেই এ শুভ-সংযোগ হবে।

ইহার পরই অদ্বৈত চৌধুরী রেবতীর কথা তুলিলেন; সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন,—তার সম্বন্ধে সব কথা আমাকে খুলে বলবেন?

গুপ্ত সাহেব সহজকণ্ঠেই উত্তর দিলেন,—কেন, সে ত খুলেই আপনাকে শেষ পত্রে লিখেছে—তপস্যায় কতদূর সিদ্ধিলাভ করেছে, এখানে এসেই তা জানাবে।

অসহিষ্ণুভাবে অদ্বৈত চৌধুরী কহিলেন,—চুলোয় যাক তার তপস্যা আর সিদ্ধি, এই দুটো কথা শুনে শুনে কান আমার ঝালাপালা হ'য়ে গেল—

গুপ্ত সাহেব হাসিমুখে কহিলেন,—কিন্তু শুনিছি এ দুটো কথা আপনিই রেবতীর সম্বন্ধে প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন।

দুই চক্ষুতে প্রশ্ন তুলিয়া অদ্বৈত চৌধুরী কহিলেন,—কি রকম?

গুপ্ত সাহেব কহিলেন, মনে ক'রে দেখুন দেখি, রেবতীর বাবাকেই কি আপনি প্রথম বলেন নি—এখন ওর তপস্যা চলেছে, সিদ্ধ হ'তে দিন?

মুহূর্তে অদ্বৈত চৌধুরীর মুখখানা কালো হইয়া গেল, পরক্ষণে সে-ভাব সামলাইয়া তিনি শ্লেষের সুরে কহিলেন,—বটে, তাই বুঝি রেবতী তার পাল্টা-জবাব চালাচ্ছে এইভাবে?

গুপ্ত সাহেব কহিলেন,—যদি তাই হয়, সেটা কি তার পক্ষে দোষের?

ইহার পর আর কোন কথা উঠিবার অবকাশ পাইল না, গুপ্ত সাহেব তাঁহার স্বাভাবিক হাসিমুখেই বিদায় লইলেন। অদ্বৈত চৌধুরী মুখখানা হাড়ির মত করিয়া বসিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যার পর গুপ্ত সাহেবের চাপরাশী এক পত্র লইয়া অদ্বৈত চৌধুরীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। ক্ষিপ্রহস্তে চিঠিখানা খুলিয়া তিনি এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিলেন। গুপ্ত সাহেব লিখিয়াছেন,—

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আনন্দের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে, এইমাত্র জ্ঞাত হইলাম, শ্রীমান রেবতী আগামী পয়লা আষাঢ় তারিখে সশরীরে উপস্থিত হইয়া তপস্যায় তাহার সাফল্যের পরিচয় দিবে।

—অরবিন্দ

চিঠিখানা লইয়া অদ্বৈত চৌধুরী অপরিসীম উল্লাসে অন্তঃপুরের উদ্দেশে ছুটিলেন।

প্রতি বৎসর পয়লা আষাঢ় অদ্বৈত চৌধুরীর বালিগঞ্জের সদর সেরেস্তায় ঘটা করিয়া পুণ্যাহ উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। জমিদারীর বিভিন্ন মহালের নায়েব, তহশীলদার ও মাতব্বর প্রজাগণ এই শুভদিনটিতে পুণ্যাহ মহরতে যোগদান করিতে আহূত হন। এবারও পূর্ব্ব ব্যবস্থার কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই, বরং আড়ম্বরের প্রাচুর্য্যই নানাসূত্রে প্রকাশ পাইতেছিল।

পুণ্যাহের দিন পূর্ব্বাহ্ণে জনকাশ্রম হইতে যে বিপুল সওগাত আসিল, তাহাদের বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব দেখিয়া সপারিষদ অদ্বৈত চৌধুরী চমৎকৃত হইলেন। কৃষিজাত পণ্য, দীঘির মৎস্য, কারখানায় উৎপন্ন শিল্প-সম্ভার—প্রত্যেকটিই যেন পরস্পর বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনে টেক্কা দিতেছিল। অদ্বৈত চৌধুরীকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইল যে, জনকাশ্রম সর্ব্বপ্রকারেই তাঁহার জমিদারীর গৌরব বাড়াইয়া দিয়াছে।

কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ে জনকাশ্রমের বহুপ্রত্যাশিত মালিকটি যখন পুণ্যাহের আসরে উপস্থিত হইল, তখন অদ্বৈত চৌধুরী কিছুক্ষণ বদ্ধদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে সন্দিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—ইনি? কিন্তু আশ্চর্য্য, অবিকল যেন রেবতীর মত—

জনকাশ্রমের মালিক সঙ্গে সঙ্গে কোমলকণ্ঠে কহিল,—আমিই রেবতী, জনকাশ্রম আমার তপস্যার সিদ্ধপীঠ।

উদ্বেলিতকণ্ঠে অদ্বৈত চৌধুরী কহিলেন,—হ্যাঁ! এতদূর! তুমিই তা'হলে—

ভাবের প্রাবল্যে তাঁহার কণ্ঠের স্বর সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল। রেবতী ধীরে ধীরে তাঁহার পদযুগলে মস্তক নত করিয়া পদধূলি মাথায় দিয়া কহিল, আমাকে ক্ষমা করুন, ঘটনাচক্রে একটু বাঁকা পথেই আমাকে তপস্যা আরম্ভ ক'রতে হয়েছিল।

তা'হলে তুমি বিলেত যাও নি? এখানেই গায়েব হয়েছিলে?

এ কথার কি উত্তর দেব বলুন! আপনি অবশ্যই ঘটনাটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

অদ্বৈত চৌধুরী কহিলেন,—কিন্তু আমি এখনও পর্য্যন্ত অন্ধকারে রয়েছি রেবতী; ভেবে ঠিক করতে পারছি না যে, কি সূত্রে এমন ওলট-পালট কাণ্ড হ'ল!

গাঢ়স্বরে রেবতী উত্তর দিল,—এর মূলে ছিল আমার বাবার নির্দ্দেশ আর সেই সঙ্গে তাঁর অন্তিম আশীর্ব্বাদ।

সন্দিগ্ধকণ্ঠে অদ্বৈত চৌধুরী প্রশ্ন করিলেন,—এ কথার মানে?

কণ্ঠের স্বর অতিশয় কোমল ও করুণ করিয়া রেবতী কহিল,—আপনি ত জানেন, আমার পরীক্ষার পূর্ব্বে বাবা আপনার কাছে কি প্রার্থনা নিয়ে আসেন এবং কতটা আঘাত পেয়ে ফিরে যান; কিন্তু পাছে আমার বিদ্যা-সাধনায় ব্যাঘাত হয়, সেই আশঙ্কায় এসব কথা আপনি আমাকে জানানো বিধেয় মনে করেন নি, এমন কি, আপনার অতি-সতর্কতায় বাবার সঙ্গে শেষ দেখা করবার সুযোগটুকুও আমি পাইনি।

অদ্বৈত চৌধুরী কহিলেন,—তোমার মঙ্গলের জন্যই আমাকে তখন অতটা সতর্ক হ'তে হয়েছিল।

রেবতী কহিল,—সম্ভব। কিন্তু মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় যে কোনো সূত্রেই হোক, আমি জানতে পারি—কি মর্ম্মান্তিক ব্যথা তিনি পেয়েছিলেন, কি

তাঁর প্রাণের কামনা ছিল! তখন উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের মতই ইহলোকের সেই ব্যথাটুকু তাঁর মোচন করা আর শেষ ইচ্ছাটুকু পূরণ করা হয় আমার জীবনের সাধনা। তাতে উত্তরসাধক হন, আমার এই শিক্ষাগুরু অধ্যাপক গুপ্ত এবং পিতৃবন্ধু পিতৃব্যস্থানীয় এই মিঞা সাহেব। গুপ্ত সাহেব যদি তাঁর হাতে-কলমে-শেখা অভিজ্ঞতার সঙ্গে সারাজীবনের সঞ্চয় উজাড় ক'রে না দিতেন, আর মিঞা সাহেবের কাছ থেকে ঐ জমিটুকু না পেতুম, তা'হলে এত অল্প দিনের তপস্যায় এত বড় সিদ্ধি কিছুতেই লাভ করতে পারতুম না আমি।

রেবতীর কথা শেষ হইতেই আজু মিঞা মাতব্বর প্রজাদের মধ্য হইতে উঠিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন,—এর পর আমার দুটো কথা বলবার আছে; ঠিক বারো বছর পরে হুজুরের পত্র পেয়েছি, সেরেস্তায় পুণ্যাহ করতে এ বৎসর নতুন ক'রে আমাকে ডাকা হয়েছে। কিন্তু বারো বছর আগে যে জমিটাকে আপদ ভেবে সরাবার জন্য আদা জল খেয়ে লেগেছিলুম, তারপর বছর পাঁচেক আদালত-ঘর ক'রে সর্ব্বস্বান্ত হলুম, সবাই দিন গুণতে লাগলো, কবে আমি ছেলে-পুলের হাত ধরে' রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াই, ঠিক সেই সময় আমার কাছে প্রস্তাব এলো—ষাটি হাজার টাকা নগদ নিয়ে তোমার সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলো, আর তার বদলে ঐ ঝঞ্ঝাটে জমিটা ছেড়ে দাও। আমি ত অবাক! এমন বোকাও দুনিয়ায় কেউ আছে, কিম্বা সত্যই খোদার দয়া! যাই হোক; টাকা নিলুম, জমিও লিখে দিলুম, দায়-দফা সব চুকিয়ে আবার মানুষ হ'য়ে বসলুম, কিন্তু ঘূণাক্ষরেও জানতে পারি নি কোনও দিন আমার ছেলে বয়সের বন্ধু ঘোষালের ছেলে একাণ্ড করেছে! যখন লেন-দেন হয়, তখন ভাবতুম লোকটা কি ঠকেছে; কিন্তু বছর ফিরতে না ফিরতে যখন

সারা জমির হাল ফিরে গেল, তারপর দিন দিন জৌলুস বাড়তে থাকলো, তখন ভাবলুম—আমিই ঠকেছি ; কিন্তু আজ সব শুনে, আসল খবর পেয়ে ভাবছি, জিতেছে আমার বন্ধু অঘোর ঘোষাল, বেহেস্তে বসে সে আজ দেখছে—কি ছেলেই সে পয়দা ক'রে গেছে, ছেলে তার নাম আজ কি রকম জাহির ক'রে তুলেছে !

অধ্যাপক গুপ্ত বলিলেন,—আমাকে বৃথা বাড়ানো হয়েছে, টাকা আর অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি এতদিন কি করতে পেরেছি, রেবতীর মত সাধকের একাগ্র সাধনাই আজ সে সব সার্থক করেছে। এই সাতটি বৎসর নিজেকে সাধারণের কাছে অজ্ঞাত রেখে যেভাবে ও কাজ করেছে, তার তুলনা নেই।

অদ্বৈত চৌধুরী এতক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে সকলের কথা শুনিতেছিলেন। এইবার তিনি ভাব-গদ্‌গদ্‌স্বরে কহিলেন,—আমি এবার আলোয় এসেছি, সবই স্পষ্ট হ'য়ে আমার চোখে পড়ছে। সকলেই যখন কৃত-প্রায়শ্চিত্ত, তখন এ ব্যাপারে আমার প্রায়শ্চিত্তই বা বাকি থাকে কেন ? আজ এই পুণ্যাহের শুভদিনে আমি জনকাশ্রমকে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর মহাল বলে স্বীকার করছি, সুতরাং এই সন থেকে আজ নিঞ্চার জমাবন্দি থেকে একশো আট বিঘা এগারো কাঠা জমির হারাহারি খাজনা রেহাই করা হ'ল।

সমবেত প্রজাগণ সমস্বরে কহিল,—হুজুরের জয় হোক ! ধন্য জনকাশ্রম !

পঞ্চম অধ্যায়

দান

৬
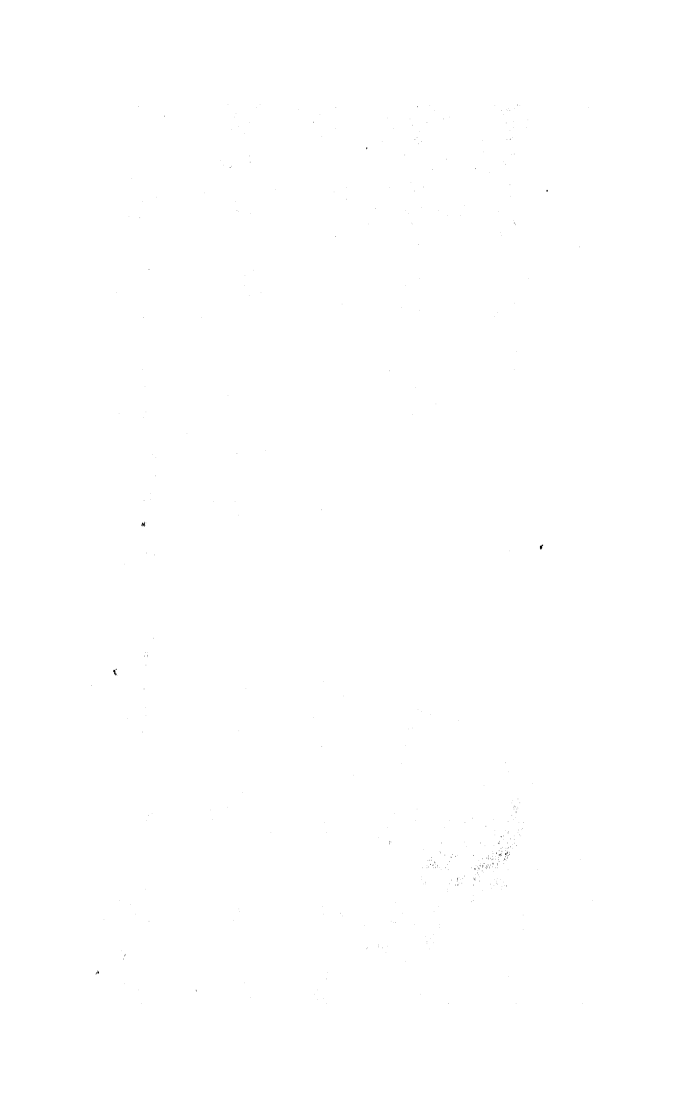
মেয়েটির নাম অশ্রু হইলেও, তাহার দুইটি ডাগর চোখের কোল দিয়া অশ্রুর একটি ফোঁটাও কোনও দিন গড়াইতে দেখা যায় নাই। যে সকল কারণে ছেলে-মেয়েদের চক্ষু দিয়া অশ্রুর ধারা বহে, অতি শৈশব হইতেই অশ্রু সে সব বালাই কাটাইয়া ফেলিয়াছে। আঁতুড় ঘরেই তাহাকে ফেলিয়া তাহার মা ভাগ্যধরীর মত পরলোকে চলিয়া যান; ইহলোকে তখন অশ্রুর অবলম্বন মামা মামীর দয়া ও বাবার স্নেহ। কিন্তু মামার উপেক্ষা, মামীর বিরক্তি ও বাবার বৈরাগ্য এক সঙ্গে তালগোল পাকাইয়াও আঁতুড়ের সেই জীবন্ত ডেলাটিকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই, বরং তাহার প্রাণশক্তির দৃঢ়তা সকলকেই চমৎকৃত করিয়াছিল।

মেয়েটি যতদিন আঁতুড়ে ছিল, তাহার ধাই-মা মায়ের স্থান অধিকার করিয়া তাহাকে দেখিত, যত্ন করিয়া দুধ খাওয়াইত, তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিতে সেবা-শুশ্রূষার কোনও ত্রুটি করিত না। মামী দেখিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিতেন,—মিছেই এত করা, ও কি বাঁচবে ব'লে এসেছে? এসেই খেলে মা'কে, এখন আমাদের যে ধারটুকু ওর কাছে আছে, শোধ হলেই শিঙে ফুঁকবে।

কিন্তু মেয়ে শিঙা ফুঁকিল না, অর্থাৎ মামা-মামীর গত জন্মের ধারটুকু শোধ করিয়াও এ জন্মের মায়া কাটাইতে চাহিল না। অগত্যা মামীকেই যথাসময় আঁতুড় হইতে এই মাতৃ-হারা মেয়েটিকে শয়ন-ঘরে তুলিতে হইল।

মামা কহিলেন,—জান্ বটে!

মামী জানাইলেন,—যাকে খেতে এসেছিল, পেটে পুরেছে ; বাপকেও বিবাগী ক'রে দিয়েছে, এখন তো বাঁচতেই হবে।

কাজেই এই মেয়ে যে কিরূপ আদর-যত্নের ভিতর দিয়া তাহার শৈশবের দিনগুলি কাটাইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মামীর মেয়েদের পরিত্যক্ত একটা দোলা ও সস্তার এক জাপানী মাইপোষ পাইয়াই মেয়েটি দিনের পর দিন দিব্য বাড়িতেছিল। দোলার মৃদুমন্দ দোল খাইতে খাইতে শিশু মাইপোষের নিপ্‌লটিতে মুখ দিয়া যে তরল পদার্থটুকু পরমানন্দে চুষিত, তাহাতে দুধের অংশ কি পরিমাণে থাকিত, তাহা শুধু মামীই জানিতেন। ঘুমের পূর্ব্বেই মাইপোষ যে দিন খালি হইয়া যাইত, অথচ শিশুর পেটটি পূরিয়া উঠিত না, তখন তাহার কি কান্না! এক ফোঁটা মেয়ের গলার জোর দেখিয়া সবাই যেন অতিষ্ঠ হইয়া কহিত,—বাবা! এ তো সাধারণ গলা নয়! এখনই এই, এর পর বড় হ'লে কি হবে!

মামী মুখ ঝাপটা দিয়া কহিতেন—এক ফোঁটা হ'লে কি হবে, ও মেয়ের পেটে পেটে বুদ্ধি! উনি চান আদর, আপনার জনের কোল, দোলায় মন বস্‌ছে না! তা কাঁদুক যত পারে, আমি মেয়েদের ব'লে দিয়েছি, কেউ যেন ওর ত্রিসীমায় না যায়।

মামীর মনে যাহাই থাকুক কিন্তু তাঁহার মেয়েগুলি এই নবাগত জীবটির কান্না শুনিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিত, তাহাকে কোলে লইয়া আদর করিত, কিংবা খালি মাইপোষটি পুনরায় ভরিয়া দিতে উস্‌খুস করিত, কিন্তু মা বাধা দিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিতেন,—খবরদার! আমাকে না ব'লে ওপরপড়া হয়ে কোনো কিছুতে খুকীর ওপর টস্‌ দেখাতে গেলেই মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব।

মা'কে মেয়েরা যমের মত ভয় করিত; সুতরাং তাহারা চুপ করিয়াই দেখিত, কাঁদিতে কাঁদিতে খুকীর গলার সুর ক্রমশঃই নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে এবং অবশেষে বেচারী খালি মাইপোষটি বুকে করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

কিছু দিন এই ভাবে খুকীর কান্না চলিয়াছিল, তাহার পর একেবারে চুপ! সে যেন বিজ্ঞের মত তাহার অসহায় অবস্থাটি বুঝিয়াছিল যে, কাঁদিয়া গলা ফাটাইলেও কেহ তাহাকে কোলে লইবে না, সে যাহা চায়, তাহা কাঁদিয়া পাইবে না। কাজেই বৃথা সে চীৎকার করিয়া গলা ফাটাইবে কেন?

খুকীর কান্না থামিতে মামী বাড়ীর সকলকে শুনাইয়া কহিলেন,—দেখলে তো মেয়ের বজ্জাতি! যখন দেখলে, কেঁদে কিছু হবে না, অমনি চুপ! মেয়ে-ছেলের মন বুঝতে হলে 'মা'কেও যে 'ছা' হতে হয়।

মা-হারা এই মেয়েটির মন বুঝিয়া মামী যেমন তাহার লালন-পালন সম্বন্ধে শক্ত হইয়াছিলেন, মেয়েটিও তেমনই শিশুকাল হইতেই সকল রকমে শক্ত ও আশ্চর্য্য ভাবে পোক্ত হইয়া উঠিতেছিল। যখন তখন তাহার মুখে হাসি ফুটিত বটে, কিন্তু কঠিন নির্য্যাতনেও তাহার চক্ষু দুইটির কোলে অশ্রুর বিন্দুও দেখা যাইত না।

তথাপি মামা আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন—অশ্রু!

২

অশ্রুর মামা রতন রায়ের ভারি নাম-ডাক। তাঁহার নাম উঠিলেই লোকে বলিত, ডাকাত রায়। শুনা যায়, রতন রায়ের প্রপিতামহের ডাকাতের দল ছিল, কিন্তু এমন ভাবে তিনি সেই দল চালাইতেন যে, ধরিবার ছুঁইবার যো ছিল না। তবে স্বগ্রামে বা তাহার কাছাকাছি গ্রামগুলির অধিবাসীদের প্রতি তাঁহার দল কখনও কোনও অত্যাচার করে নাই, কাজেই গ্রামবাসীরাও কোনও দিন রায় মহাশয়ের এই গুপ্ত পেশাটি লইয়া গোলযোগ বাধায় নাই। সুতরাং তিনি নিরাপদেই বংশধরদের জন্য প্রকাণ্ড ইমারত বাড়ী ও প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি রাখিয়া পরলোকের পথে পাড়ি দিতে পারিয়াছিলেন।

রায়-বংশের এখন বহু সরীক ; বাড়ী, বিষয় সমস্তই ভাগ বাঁটোয়ারায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। রতন রায়ই বর্ত্তমানে সরীকদের মধ্যে বড় এবং সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। শুধু সরীকরা কেন, জয়াপুর গ্রামের সকলেই তাঁহাকে ভয় করে। প্রবীণরা বলেন, রতন রায়ের প্রপিতামহ আর রতন রায় একই লোক ; বংশের মায়া কাটাইতে না পারিয়া তিনিই পুনরায় প্রপৌত্র হইয়া বংশে অবতরণ করিয়াছেন। তবে এখন আইন-কানুন খুবই কড়া হইয়াছে বলিয়া লাঠির বদলে বুদ্ধি লইয়া প্রকারান্তরে ডাকাতি চালাইতেছে।

তবে একটি বিষয়ে তাঁহাদের মনে সন্দেহ জাগিত, সেই সন্দেহের বিষয়টুকু এই যে, প্রপিতামহ প্রতিবাসী ও সন্নিহিত গ্রামসমূহের অধিবাসীদের প্রতি কখনও বিরূপ হন নাই, কিন্তু রতন রায়ের যত কিছু

আক্রোশ ইহাদেরই প্রতি। কোনও প্রতিবাসী ইঁহার কোপে পড়িলে আর রক্ষা নাই! মিথ্যা মামলা সাজাইয়া বা অনুরূপ কোনও শঠতার আশ্রয় লইয়া তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত না করা পর্য্যন্ত ইঁহার রাগ পড়ে না। পৃথিবীতে আসিয়া এই মানুষটি শুধু পয়সাই চিনিয়াছেন, পয়সার জন্য কোনও অপকর্ম্ম করিতে ইঁহার বাধে না। অথচ, এমন কৌশলে এই সব কাজ সমাধা করেন যে, কেহই ইঁহাকে ধরিতে ছুঁইতে পারে না।

ভাগ্যবলে এক সহকর্ম্মীও তিনি পাইয়াছিলেন। তিনি অক্রুর বাবা, যাদব ঘোষাল। বিদ্বান্ লোক, দুই তিনটি ভাষায় পণ্ডিত। বারুইপুরে ব্যবসায়ে ব্রতী হইয়াছিলেন। সেই সঙ্গে রেসের নেশা মাথায় ঢুকিয়াছিল। সেই নেশা গাঢ় হইয়া উঠিতেই দেনার দায়ে যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় হইয়া যায়। সেই অবস্থায় স্ত্রীর হাত ধরিয়া যাদব ঘোষালকে শ্যালকের শরণাপন্ন হইতে হয়।

রতন রায় হিসাবী মানুষ, মনে মনে হিসাব করিয়া তিনি ভগিনীপতিকে তখন কহিয়াছিলেন,—তুমি জানোয়ারের পেছনে ছুটে যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে এসেছ, আর আমি মানুষের পেছনে ছুটে কি ভাবে আমার অদৃষ্ট ফিরিয়েছি, তা তো দেখছো?

যাদব ঘোষাল কথাটা শুনিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াই জবাব দেন,—তোমার বাড়-বাড়ন্তর কথা শুনেই আশা ক'রে এখানে এসেছি, চোখেও তাই দেখছি। এখন তুমিই আমাদের গতি।

রতন রায় গম্ভীর হইয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন,—মানুষের বুদ্ধিই মানুষকে চালায়, সেই তাকে দেয় গতি। এত বড় দুনিয়ায় এত সব মানুষ থাকতে তুমি জানোয়ারের পেছনে ছুটেছিলে ভাগ্য ফেরাতে, তাতেই মজেছো। এখন যদি ফিরতে পার, মানুষের পেছনে ছুটতে সাহস কর,

তা হ'লে আমি বলছি তোমাকে—কুচ পরোয়া নেই আবার সব ফিরে পাবে।

শ্যালকের রহস্যপূর্ণ কথায় তাঁহার মুখের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া যাদব ঘোষাল তখন বলিয়াছিলেন,—তোমার কথাগুলো যে হেঁয়ালীর মত ভাই, ঠিক যে বুঝতে পারছিনা! মানুষের পেছনে ছুটতে বলছো তুমি, এ ভাবে তো কখনো ছুটিনি!

রতন রায় জবাব দিয়াছিলেন—সেইজন্যেই তো কিছু করতে পারোনি। এখন থেকে গড়ের মাঠ আর ঘোড়া ছেড়ে এই লোকালয়ে লোকের পেছনে ছোটাই হবে তোমার কাজ। অবশ্য আমি তোমাকে রাস্তা বাতলে দেব। যদি রাজী থাকো, আজ থেকে তোমাদের ভাতকাপড়ের ভাবনা কেটে গেলো, স্বচ্ছন্দে এখানে থাকতে পারো।

যাদব ঘোষালের তখন মাথা গুঁজিবার স্থান নাই; কাল কি খাইবেন, তাহারও সংস্থানের অভাব; এদিকে স্ত্রী মানদা অন্তর্ব্বত্নী, তাহাকে দেখিতে কেহ নাই। শ্যালকের এই কথায় তাঁহার বিবেক সম্মতি না দিলেও অভাব ও অবস্থার দিকে চাহিয়া তাঁহাকে অগত্যা তাহাতে সায় দিতে হইয়াছিল।

রতন রায়ের কত যে কাজ, তাহার হিসাব কেহ রাখিতে পারেনা। তাঁহাকে ছাপাইয়া কাহারও কোনও কিছু করিবার সাধ্য ছিলনা। গ্রামে যখন যে কাজ হইবে, তাহার মোড়লী করিবেন রতন রায়। বারোয়ারীর মেরাপ বাঁধা হইতে যাত্রার দল বাছাই ও বায়না করা পর্য্যন্ত যাহা কিছু সবই হইবে রতন রায়ের ইচ্ছায়।

ছেলেমেয়ের বিবাহে রতন রায়কে অবহেলা করিলে আর রক্ষা নাই; সে বিবাহে একটা গণ্ডগোল দেখা দিবেই। কোনও কিছু কেনাবেচা ব্যাপারে রতন রায় উপেক্ষিত হইলে দলিলের গলদ মাথা নাড়া দিয়া অমনই

একটা ব্যাঘাত ঘটাইবে। মামলা-মকদ্দমা বাধিলে রতন রায়কে যে পক্ষ দলে না লইবে, তাহার দুর্গতির আর অন্ত থাকিবে না, মামলায় জিতিলেও রতন রায় আদাজল খাইয়া তাহাকে জেরবার করিয়া দিবেন।

৩

ভগিনীপতি যাদব ঘোষালের মাথা আছে এবং সেই মাথাটি খেলাইবার ব্যবস্থা দিলে তাহা কাজে লাগিবে বুঝিয়াই রতন রায় তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, ভগিনী ও ভগিনীপতির সকল ভারই লইয়াছিলেন। এইখানেই তাঁহার হিসাবে ভুল হইয়াছিল। মাথা যাদব ঘোষালের সত্যই ছিল এবং তাহার ভিতরে পয়সা কামাইবার স্পৃহাটুকুও গিস্‌গিস্ করিতেছিল সত্য; কিন্তু সেই স্পৃহাটিকে পরিবেষ্টন করিয়া পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙতে বা পরের পকেটের অর্থ তাহার অজ্ঞাতে নিজের পকেটে পূরিতে তাঁহার হাত দু'খানি কোনও দিনই নিস্‌পিস্ করিতনা; এমন কি, আশ্রয়দাতা শ্যালককে পরিতুষ্ট করিতে অসত্যের পথে পাড়ি দিতেও তাঁহার সরল চিত্তটি বিদ্রোহী হইয়া উঠিত।

দুই জনের মনের ধারা যেখানে বিভিন্নমুখী, সেখানে উভয়ের মধ্যে সত্যকার মিল হইতে পারেনা; এই অনৈক্যের জন্য যাদব ঘোষাল শ্যালকের মনের মত হইতে পারিলেননা। কিন্তু রতন রায় হিসাবী মানুষ, লোকসান সহিতে তিনি অভ্যস্ত নহেন; ভগিনী ও ভগিনীপতির উপর যে খরচ তিনি করিয়াছেন, সুদসহ তাহা উসুল না করিয়া তিনি নিরস্ত হইবেন কেন!

উসুল করিবার একটা উপলক্ষও হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছিল। একটা

সঙ্গীন মামলা সাজাইতে এমন এক সাক্ষীর প্রয়োজন, যাহার ভাল রকম পড়াশুনা আছে, কৌসুলির জেরায় মুখটি উঁচু করিয়া শিক্ষার পরিচয় দিতে পারে। রতন রায় বুঝিয়াছিলেন, এ-ব্যাপারে উপযুক্ত পাত্র হইতেছেন—ভগিনীপতি যাদব ঘোষাল। কিন্তু প্রস্তাবটি তাঁহার নিকট তুলিতেই তিনি তৎক্ষণাৎ মুখখানা কঠিন করিয়া কহিলেন,—মিথ্যা সাক্ষী? আমার দ্বারা এ হবেনা, ভাই!

রতন রায় রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন?

যাদব ঘোষাল কহিলেন,—এর সোজা উত্তর, ওটা অন্যায়, ওতে অধর্ম্ম।

রতন রায় শ্লেষের সুরে কহিলেন,—বটে! কিন্তু এই সাক্ষী সাবুদ আর আইন-আদালতের ওপর ইংরেজের রাজত্ব পাকা হয়ে রয়েছে তা জান?

যাদব ঘোষাল হাসিয়া উত্তর দিলেন,—তোমার ও-নজীর খাটেনা, ন্যায়ের মর্য্যাদা দিতেই আইন-আদালত, সাক্ষীসাবুদ সেখানে মাপ-কাঠি। তাতে যদি গলদ হয়, সে দোষ আইনের নয়, আদালতেরও নয়, সে দোষ ঐ কাঠির। সাক্ষীর মিথ্যাচারে ন্যায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হ'লে, সাক্ষীকেই তার জন্য নিমিত্তের ভাগী হ'তে হয়, এটা তোমার জানা উচিত।

রতন রায় মনের রাগ মুখে প্রকাশ না করিয়া প্রকারান্তরে যাদব ঘোষালের নির্ম্মল মনটির উপর তীক্ষ্ণ খোঁচা দিলেন। বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কহিলেন,—ন্যায় আর ধর্ম্ম—ওরা যখন তোমার এত বড় সহায়, তা হ'লে অন্নের জন্য এখানে ধাওয়া না করলেই পারতে?

আঘাতটি সাংঘাতিক হইলেও ইহা সহ্য করিতে যাদব ঘোষাল অভ্যস্ত হইয়াছিলেন; নতুবা এই কয়মাস তিনি এমন হৃদয়হীন আত্মীয়ের গলগ্রহ

হইয়া সস্ত্রীক তাঁহার অন্ন ধ্বংস করিতে পারিতেননা। এই আঘাতটুকুও অনায়াসে সংবরণ করিয়া তিনি উত্তর দিলেন,—সে দোষ আমারই; ন্যায়েরও নয়, ধর্ম্মেরও নয়। সহসা সর্ব্বস্বান্ত হয়ে সাময়িক দুর্ব্বলতায় আমি ওদের উপর নির্ভর করতে পারিনি। কিন্তু এ কথাও না ব'লে থাক্‌তে পারছিনা, আশ্রয় আর অন্নের বিনিময়ে আমার যোগ্য কাজ তুমি দেবে, এ ভরসাও আমার ছিল।

রতন রায় এবার উষ্ণ হইয়া কহিলেন,—আমিও ঐ ভরসায় গুরুর আদরে তোমাদের মাথায় ক'রে আমার সংসারে তুলেছিলুম, কিন্তু কোন্ কাজটায় তুমি হাত দিয়েছ শুনি?—লেখা মিলিয়ে খাতাখানা তোমাকে নকল করতে দিলুম, তুমি অমনি সেখানা ফিরিয়ে দিয়ে বললে—তোমার দ্বারা হবে না। সে কাজটা আর একজনকে দিয়ে করাতে পঞ্চাশ টাকা গলে গেলো। তুমি ও কাজ করলে, টাকাগুলো তো ঘরেই থাকতো! কংগ্রেসওলাদের নামে সিকাইত ক'রে দরখাস্ত এক্‌খানা কালেক্টরের কাছে পাঠাতে অত সাধাসাধি করলুম, তুমি কিছুতেই কলম ছুঁলেনা, ওরাই হ'ল তোমার আপনার; আর, এখন তারা আমার পীঠে বাঁশ ডলছে। যেখানে গোলমাল, তুমি সেখানে ঘেঁসবেনা; বেঁকা রাস্তায় তুমি পা বাড়াতে নারাজ! কি কাজ আমার হয়েছে তোমাকে নিয়ে, আর এর পরই বা কি হবে?

যাদব ঘোষাল শ্যালকের মুখে তাঁহার সম্বন্ধে এই উত্তেজনাপূর্ণ কথাগুলি শুনিয়াও নিজে কিছুমাত্র উত্তেজিত হইলেননা, স্নিগ্ধকণ্ঠে শুধু কহিলেন,—একটা কথা আমি শুধু বলতে চাই, দুনিয়ায় জাল জোচ্চুরি ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কি কোনো কাজ নেই?

বারুদের স্তূপে যেন এবার আগুন পড়িল; রতন রায় তর্জ্জনের সুরে

উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—রেসের মাঠে ঘোড়ার জুয়াখেলা বুঝি ভারি সাধুতার কাজ? ওর পেছনে ঘর বাড়ী বিষয় আসয় সব ঘোচালে কেন? দেনা তো অনেকেরই হয়, কিন্তু তোমার মতন তাতে যথাসর্ব্বস্ব হারায় ক'জন শুনি? বুদ্ধি থাকলে দেনাকেও বুড়ো আঙ্গুল দেখানো যায়, সেটা দোষ নয়; তাকে জোচ্চুরী কিম্বা ফেরেববাজী বলেনা! আর তোমার মতন বুদ্ধিমান্‌রা যদি তাই বলে, বয়েই গেলো! তুমি নিজেকে মস্তবড় ধার্ম্মিক কিম্বা ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির গোছের কিছু মনে করতে পারো, কিন্তু আমি বলি তুমি একটা মহা আহাম্মুখ!

যাদব ঘোষাল স্তব্ধভাবে ভাবিতে লাগিলেন—কি কথার কি উত্তর শ্যালক তাঁহাকে দিলেন! কিন্তু আজ তিনি তাঁহার অন্নদাস, আশ্রিত; তাঁহার একমাত্র অবলম্বন প্রাণাধিকা পত্নীর প্রসবকালও আসন্ন! মানসিক বিক্ষোভ এবং অলসভাবে জীবন যাপন এই সত্যনিষ্ঠ মানুষটির বিবেক বুদ্ধি ও মর্য্যাদাবোধের স্বাভাবিক শক্তিটুকুও সম্ভবতঃ শিথিল করিয়া দিয়াছিল; তাই শ্যালকের এই অন্যায় ও অযৌক্তিক আঘাত তিনি অতঃপর নীরবেই সহ্য করিলেন!

রতন রায় বুঝিলেন, ঔষধ ধরিয়াছে; রোগও অতঃপর ছাড়িবে। গম্ভীরভাবেই এবার যুক্তি দিলেন,—অসময়ে আশ্রয় যখন পেয়েছ, আমার আপদে বিপদে বা প্রয়োজনে কিঞ্চিৎ উপকার করাও বোধ হয় তোমার ধর্ম্ম!

যাদব ঘোষাল শ্যালকের মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, আমার স্বভাব তো তুমি জানো। ভালো, কি উপকার আমার দ্বারা তোমার হ'তে পারে বলো আমি প্রস্তুত।

রতন রায় কহিলেন,—সেই কথাই তোমাকে বলছি। একটা দেনা-

পাওনার ব্যাপার নিয়ে মস্ত মামলা রুজু হয়েছে হাইকোর্টে। আসছে হপ্তায় সে মামলা বোর্ডে ওঠবার কথা। কম নয়, দশ বারো হাজার টাকা নিয়ে এই মামলা ; দেনদার এখন আমিই, পাওনাদার বোম্বাইওয়ালা বাবুরাম ভাটিয়া, কিন্তু এক কথায় এ মামলা আমি ফতে করতে পারি যদি তোমাকে সাক্ষী পাই।

বিস্ময়ের সুরে যাদব ঘোষাল কহিলেন,—অত বড় মামলার ব্যাপারে আমার মতন তুচ্ছ লোকের সাক্ষ্যের কি দাম ?

রতন রায় কহিলেন,—মামলার ব্যাপারে সময়বিশেষে এমন অনেক তুচ্ছই তরিয়ে দেয়। আসল কথা হচ্ছে, এ মামলায় রেসের একটু গন্ধ আছে, সেইটিই হচ্ছে আমার ব্রহ্মাস্ত্র ; তুমিও রেসের ফেরৎ, তাই তোমার দাম এ ব্যাপারে আছে।

বিব্রত ভাবে যাদব ঘোষাল কহিলেন,—কিন্তু আমি তো কিছু জানিনা।

রতন রায় আশ্বাসের সুরে কহিলেন,—সে জন্যে ভাবনা কিছু নেই, আমি তোমাকে জানিয়ে শুনিয়ে একেবারে ওয়াকিবহাল ক'রে তুলবো।

যথাসময়ে সঙ্গীন মামলাটির শুনানী আরম্ভ হইল এবং এই মামলায় যাদব ঘোষাল শিক্ষামত সাক্ষ্য দিয়া ও প্রতিপক্ষ কৌন্সলীর জেরার জাল কাটাইয়া এমন অক্ষত দেহে বাহির হইয়া আসিলেন যে, রতন রায় অতি উল্লাসে তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন,—সাবাস্! ওদিকে যেমন তিন তিনটে পাশ করেছিলে, এ লাইনের একজামিনেও তেমনি এক দিনেই ফাষ্ট ক্লাস ফাষ্ট হলে !

এই মামলার সংস্রবে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদিগকেও একবাক্যে স্বীকার করিতে হইল যে, রেসের ব্যাপারের এই সাফাই সাক্ষীর জন্যই ফরিয়াদীর

মামলা ফাঁসিয়া গেল। কিন্তু যাদব ঘোষাল বুঝিলেন, দাবীর আসল দশ হাজার ও সুদ দুই হাজার, এই মোটা অঙ্কের টাকাটার দায়ী ছিলেন সত্যই রতন রায়। পাওনাদারের এই ক্ষতিটুকুর জন্য এখন ধর্ম্মের দিক্ দিয়া দায়ী হইলেন তিনি স্বয়ং। কিন্তু সমস্ত জীবনব্যাপী পরিশ্রমেও কি এ ঋণ তিনি পরিশোধ করিতে পারিবেন ?

ইতিমধ্যে মানদা অতিশয় কষ্ট পাইয়া একটি কন্যা প্রসব করে এবং প্রসবান্তেই সে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়। তখন সকলেই আশ্বাস দিয়াছিলেন, ইহাতে চিন্তার কিছু নাই, এমন হয়ই। মকর্দ্দমার দিন প্রত্যুষে প্রসূতির অবস্থা ভালই এরূপ শুনা গেল, জ্বরও ছাড়িয়াছে এরূপ খবরও বাহিরে আসিল। রতন রায় উৎসাহের সুরে কহিলেন,---দেখলে তো ! যা বলেছিলুন, এ-জ্বর তিন দিনের বেশী থাকে না ; হলোও তাই।

কিন্তু মামলা রুতে করিয়া সন্ধ্যার পর বিষণ্ণ ভগিনীপতিকে প্রসন্ন মুখে ভবিষ্যতের বিবিধ আশার বাণী শুনাইতে শুনাইতে রতন রায় যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন মানদার অন্তিমকাল উপস্থিত। ধুলোপায়েই উভয়ে সূতিকাগারের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন। প্রসূতির তখন পূর্ণ বিকার অবস্থা, দুই চক্ষু রক্তাভ, সর্ব্বাঙ্গ নীল হইয়া গিয়াছে, মধ্যে মধ্যে কত কি প্রলাপ বকিতেছে !

যাদব ঘোষাল অশ্রুপূর্ণলোচনে পত্নীর দিকে চাহিয়া কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন,—মানদা !

স্বামীর কণ্ঠস্বর যেন শলাকার মত সাধ্বীর কর্ণে বিঁধিল, সেই বিঘোর অবস্থাতেও সে ধড়মড় করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে শক্তি তাহার বহু পূর্ব্বেই লুপ্ত হইয়াছিল ; শুধুই তখন স্বামীর স্বর লক্ষ্য করিয়া দ্বারের দিকে দৃপ্ত নয়নে চাহিল, দুইটি ডাগর চক্ষুর কালো কালো তারকাযুগল

যেন কোটর হইতে ছুটিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল ; কি প্রখর সে দৃষ্টি,—কত কথাই তাহাতে নিহিত !

যাদব ঘোষাল বালকের মত কাঁদিতে কাঁদিতে প্রশ্ন করিলেন,—কি কষ্ট তোমার হচ্ছে, মানদা ?

প্রখর দৃষ্টি দেখিতে দেখিতে যেন স্নিগ্ধ হইয়া আসিল, বিজলীর তীক্ষ্ণ প্রভায় আকাশের বারিধারা মিশিল ; পরক্ষণেই ক্ষীণকণ্ঠের মর্ম্মভেদী স্বর শ্বসিয়া উঠিল,—কেন ও-কাজ করলে গো ! কেন করলে !

পরক্ষণেই সব চুপ ! দেহলতা এলাইয়া পড়িল, চক্ষুর দীপ্তি নিবিয়া গেল ; গলার ভিতর দিয়া একটা ঘড় ঘড় শব্দ যেন বিদ্রূপের সুরে শুনাইয়া দিল—চলিলাম। স্বামীকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য, শেষের ঐ কয়টি কথা শুনাইবে বলিয়াই এই সাধ্বী যেন প্রাণটুকু ধরিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ঐ কয়টি মর্ম্মভেদী কথা মরণ-পথের যাত্রীর বিকারের প্রলাপ কিম্বা বেদনাতুর চিত্তের পরিপূর্ণ প্রকাশ, তাহা কে বলিবে !

শ্মশানের এক প্রান্তে বসিয়া যাদব ঘোষাল নিষ্পলক নয়নে স্ত্রীর জলন্ত চিতার দিকে চাহিয়াছিলেন, শেষ অগ্নিশিখাটুকু নির্ব্বাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে অন্য কোন দিকেই দৃষ্টি ফিরাইতে দেখিল না। রতন রায় পার্শ্বে বসিয়া কত আশ্বাস দিলেন, ভবিষ্যতের জন্য কত ভরসা দিতে চাহিলেন, কিন্তু যাদব ঘোষাল যেন মর্ম্মরমূর্ত্তি—কোনও উত্তরই তাঁহার নিকট হইতে আসিল না।

রতন রায় পুনরায় কণ্ঠে জোর দিয়া তাঁহাকে শুনাইয়া দিলেন,—কোনো ভাবনাই তোমার নেই, আমার বোন গেলেও তোমার আদর যত্নের ত্রুটী হবে না জেনো।

যাদব ঘোষাল তথাপি এ কথায় কোনরূপ সায় দিলেন না ; তিনি

নিশ্চয়ই তন্দ্রাতুর হন নাই, দুই চক্ষুর দৃষ্টি চিতার দিকেই বদ্ধ রহিয়াছে দেখা গেল ; কিন্তু মুখে কথা নাই।

রতন রায় নিরুৎসাহ না হইয়া আপন মনেই বলিয়া চলিলেন,—মেয়েটাই যেন কাল হয়ে এলো, এসেই মাকে খেলে ; আঁতুড় থেকে ওকেও যে বেরুতে হবে না তা জানি, কিন্তু এই সঙ্গেই যদি যেতো, দু'দিন পরে আবার ভুগতে হ'ত না ! একেই বলে—অদৃষ্টের ফের ! কিন্তু তুমি ও রকম মন-মরা হয়ে রয়েছ কেন ? কথা কও, ও ভাবনা ভেবে কি আর হবে ? এই তো ভবের খেলা, সব মিছে, সব ফক্কিকার, কেউ কারো নয় রে, ভাই !

এই সময় চিতায় জল দিবার জন্য ডাক পড়িল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যাদব ঘোষাল উঠিলেন। অদূরে শ্মশান-বন্ধুগণ বোতল খুলিয়া শ্রমাপনোদনে ব্যস্ত হইয়াছিলেন ; রতন রায় কাসিয়া কণ্ঠটি পরিষ্কার করিতে করিতে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন।

বোতল কয়টি শূন্যগর্ভ হইলে শ্মশান-বন্ধুদের সহিত রতন রায় যখন স্নানের জন্য নদীতে নামিলেন, তখন যাদব ঘোষালের কথা সহসা মনে পড়িল ! সত্যই তো, মানুষটা গেল কোথায় ? তখনই বহুকণ্ঠে ডাকাডাকি আরম্ভ হইল, অনুসন্ধান চলিল ; কিন্তু তাঁহাকে পাওয়া গেল না। বাড়ীতেও তিনি ফিরেন নাই এবং তদবধি যাদব ঘোষালের কোন সংবাদই আর পাওয়া যায় নাই।

এই ঘটনার পর পনেরটি বৎসর কত পরিবর্ত্তনের তরঙ্গ তুলিয়া কালসমুদ্রে মিশিয়াছে। মাতৃহারা অশ্রু এখন পঞ্চদশী তরুণী। এখন সে ভাবিবার অবকাশ পায়, জীবনের এতগুলি দিন এই বাড়ীতে কি করিয়া কাটাইয়া সে এত বড় হইতে পারিয়াছে! স্মৃতিশক্তি প্রখর করিয়া অতীতের যবনিকা তুলিয়া চাহিলে যে সকল দৃশ্য পর পর প্রকাশ হইতে থাকে, তাহাতে এখনও সে শিহরিয়া ভাবে, কেমন করিয়া সে বাঁচিয়া আছে? অথচ অনাদর, অযত্ন, অবহেলার ভিতর দিয়াই ত সে মানুষ' হইয়াছে; শাসন পীড়ন নির্য্যাতন, খাওয়া-পরার নানা ব্যতিক্রম তাহার স্বাভাবিক অনবদ্য স্বাস্থ্যকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। মামার মেয়েরা পাড়ার স্কুলে গিয়াও যে শিক্ষা পায় নাই, স্কুলে ভর্ত্তি হইবার সুযোগ তাহার অদৃষ্টে না ঘটিলেও, নিজের চেষ্টায় সে তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী শিখিয়াছে। সর্ব্বক্ষণই তাহাকে সংসারের কাজে ছুটাছুটি করিতে হয়, মামীর কোলের ছেলেমেয়েগুলিকেও সেই সঙ্গে কোলেপীঠে করিয়া না সামলাইলেই নয়; মামার ফাই-ফরমাজ খাটিতে ডাকিবামাত্রই অশ্রু হাজির না হইলে আর রক্ষা নাই; ইহাদের উপর মামাতো ভাইবোনদের নানারূপ হুকুম তো আছেই! কিন্তু কিছুতেই এই মেয়েটির দৃক্‌পাত নাই, অবিরাম খাটুনিতেও ভ্রূক্ষেপ নাই, কোনও দিনই তাহার অসীম সহিষ্ণুতা ক্ষুণ্ণ হয় না, ধৈর্য্যের বাঁধন শিথিল হইতে দেখা যায় না। অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিশ্রম তাহাকে সুরু করিতে হইয়াছে, একটানায় সমানভাবেই প্রায় চলিয়া আসিয়াছে। অবশ্য, কখনও কখনও ব্যাধির প্রকোপ বিঘ্ন

তুলিলেও মেয়েটির মনের দৃঢ়তা ও আরোগ্য হইবার আকুলতা তাহাকে স্থায়ী হইতে দেয় নাই। এত পরিশ্রমের মধ্যেও কখন যে কি ভাবে সময় করিয়া লইয়া সে মোটামুটি-রকমের লেখাপড়াও আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা এ বাড়ীর এবং এই সমৃদ্ধ পল্লীটির প্রত্যেককেই চমৎকৃত করিয়া দেয়।

মামার আশ্রিত ও তাঁহারই অন্নে প্রতিপালিত অশ্রুর আত্মমর্য্যাদা রক্ষার প্রবৃত্তিও অসাধারণ। অতি শৈশব হইতেই তাহার কোমল মনটি অন্যায়ের দিকে ঝুঁকিতে চাহিত না। ইহা যেন তাহার জন্মগত সংস্কার অথবা মাতার এই গুণটি সন্তানে বর্ত্তাইয়াছিল। অথচ,নানাবিধ অন্যায়াচার এই পরিবারটির যেন গা-সওয়া হইয়া গিয়াছিল। এইখানেই হইল অশ্রুর সহিত তাহার মামার পরিবারবর্গের গরমিল। মামা চক্ষু পাকাইয়া ভ্রূকুটি করেন, মামী মুখ বাঁকাইয়া খোঁটা দেন, মামাতো ভাই-বোনরা ব্যঙ্গের সুরে কত কথাই শুনায়। সত্যই তো, যাহাতে তাহাদের কাহারও মনে কুণ্ঠা নাই, যে সব কাজ করিয়া তাহারা বাহবা লয়, তাহাদেরই স্নেহ-দয়ায় মানুষ হইয়াছে যে মেয়েটা, সে কি না সেই সব কাজে নাক সিঁটকায়!

অশ্রু তখন নয় দশ বছরের মেয়ে। এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছে। বহু নিমন্ত্রিতের সমাগম হইয়াছে, সারি সারি পাতা পড়িয়াছে। কিন্তু পাতার উপর লুচি পড়িবামাত্রই তৎক্ষণাৎ সেগুলি অদৃশ্য হইতেছিল। অশ্রু অবাক্ হইয়া দেখিল, যাহারা পাতা কোলে করিয়া বসিয়াছিল, তাহারাই পাতার লুচি অতি সন্তর্পণে চোরের মত কোলের কাপড়ে লুকাইতেছে! অশ্রু তাহার মামাতো ভাই-বোনগুলির সহিত একটি সারিতে একসঙ্গে বসিয়াছিল; সে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিল, এই কার্য্যে ইহাদের কি আগ্রহ! অশ্রুকে চুপ করিয়া বোকার মত বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাদের একজন কহিল,—এই

নেকী, চটপট লুচিগুলো তুলে ফেল্ না, নইলে দেবে না আর পাতে। অশ্রু কিন্তু বসিয়া বসিয়া ঘামিতে লাগিল, তাহার হাত উঠিল না।

বাড়ীতে মামী কৈফিয়ৎ চাহিলেন,—তুই যে বড় খালি হাতে এলি? তোর 'ছাঁদা' কই?

অশ্রু ঘাড়টি হেঁট করিয়া দাঁড়াইল, উত্তর দিল তাহার সেই ভাইটি; বিকৃতকণ্ঠে কহিল,—জানলে মা, একখানা লুচিও তোলে নি, হাত-গুটিয়ে ব'সে রইল, আমি কানে কানে কত বললুম, তবু শুনলে না।

শান্তি নামে মেয়েটি হাসিমুখে কহিল,—জানো মা, আমাদের সারে তরকারি দিতে দেরি করেছিল, তাতেই না দু দুবার লুচিগুলো তুলতে পেরেছি। অশ্রু পোড়ারমুখী হাঁ ক'রে ব'সে রইল, নইলে ওর পাতা থেকেই উঠতো আরো আট খানা।

মামী কৈফিয়ৎ চাহিলেন,—কি হয়েছিল তোর, শুনি?

অশ্রু মুখখানি তুলিয়া উত্তর দিল,—আমার লজ্জা করছিল।

মামী মুখখানা মচকাইয়া কহিলেন,—কিসে লজ্জা এল?

অশ্রু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল,—হবে না লজ্জা? তারা তো খেতেই বলেছিল, তুলে আনতে তো বলেনি; তবে?

বিচারের নিষ্পত্তি কিন্তু এখানেই হইল না, মামা বাড়ী ফিরিলে তাঁহার এজলাসে অশ্রুর ডাক পড়িল। তিনি প্রশ্ন করিলেন,—হাঁ রে অশ্রু, বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে তুই না কি আজ ছাঁদা বেঁধে আনিস নি, খালি হাতে ফিরেছিস?

সপ্রতিভ কণ্ঠে অশ্রু উত্তর দিল,—হাঁ, মামা।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া মামা প্রশ্ন করিলেন,—কেন? সবাই যদি ছাঁদা বেঁধে আনে, তুই অমনি অমনি ফিরবি কেন?

অশ্রু কহিল,—আমার চোখে ওটা যে খারাপ লাগে, তাই।

মামা উষ্ণ হইয়া কহিলেন,—বটে! তোমার চোখে খারাপ লাগে!

অশ্রু কহিল,—লাগবে না? তুমিই বল না, আমাদের বাড়ীতে যদি কখনো অমনি নেমন্তন্ন ওরা খেতে আসে, আর খেতে ব'সে পাত থেকে লুচিগুলো কোঁচড়ে লুকুতে থাকে, তোমার চোখে খারাপ লাগে না?

মামার মুখ দিয়া অস্ফুটস্বর বাহির হইল,—হুঁ!

মামা রতন রায়ের যত দোষই থাকুক, কিন্তু তাঁহার মুখের উপর সাহস করিয়া কেহ স্পষ্ট কথা শুনাইয়া দিলে, তাঁহার রোষবহ্নি তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া ধূম্রের মত উদ্গীরণ করিত শুধু একটি—হুঁ!

মামী সেদিন রন্ধনে ব্যস্ত, দালানে বাটনা বাটার কাজ সারিয়া অশ্রু হাত ধুইতেছে, এমন সময় খিড়কীর বাগানের দিকে একটি গুরুগম্ভীর শব্দ উঠিল। মামী তৎক্ষণাৎ ব্যগ্র কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—ছুটে যা অশ্রু, তালপড়লো, শীগ্‌গির কুড়ো—

মামীর কথার সুরের সঙ্গে সঙ্গে অশ্রু ছুটিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাহাকে রিক্তহাতে ফিরিতে দেখিয়া মামী ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিলেন,—খালি হাতে ফিরলি যে বড়? তাল কোথায়?

অশ্রু উত্তর দিল,—ও তাল আমাদের নয়, সরিকদের গাছের।

মামী তিক্তকণ্ঠে কহিলেন,—তালে কি সরিকদের নাম লেখা ছিল পোড়ারমুখী, তুই কেন কুড়িয়ে আনলি নি?

অশ্রু কহিল,—আমাদের নয় জেনেই আনি নি মামীমা, তুমি মিছে রাগ করছ।

মামী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন,—ভারি আস্পর্দ্ধা তোমার বেড়েছে, মুখের ওপর কথা; যা করতে বলবো, তাতেই 'না'!—

অশ্রু কহিল,—তুমি যাই বলো মামীমা, যেটা ঠিক নয়, তা আমা হ'তে হবে না।

কথাটা বলিয়াই সে ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল এবং পাঠ্য গ্রন্থখানি লইয়া সুর করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল,—"না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়; চুরি করা অতি অন্যায়—"

মামা সে সময় অবশ্য বাড়ী ছিলেন না। কিন্তু বাড়ীতে আসিবামাত্রই অশ্রুর এ দিনের স্পর্দ্ধা ও অবাধ্যতার কথা মামী তাঁহাকে শুনাইয়া দিলেন। মামা তৎক্ষণাৎ তর্জ্জনের সুরে ডাকিলেন,—অশ্রু।

অশ্রু তখন মামার হাত মুখ ধুইবার জল ও কাচা কাপড়খানি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিতেছিল। আহ্বান শুনিয়াই ছুটিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এ তলবের কারণ বুঝিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই, উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই সে যুগল চক্ষুর নির্ভীক দৃষ্টি মামার অপ্রসন্ন মুখখানির উপর তুলিয়া ধরিল।

মামা দুই চক্ষু পাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন,—হাঁ রে, মামীর সঙ্গে ফের ঝগড়া করেছিস্?

অশ্রু বিস্ময়ের সুরে কহিল,—সে কি, মামা! মা-মামী—এঁদের সঙ্গে মেয়ে করবে ঝগড়া! ও-মা, শোনো কথা!

মামা ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন,—ডেঁপোমী করতে হবে না আর! আমি সব শুনেছি। মামী তাল কুড়িয়ে আনতে বলেছিল, তেজ দেখিয়ে—আনা হয় নি কেন?

অশ্রু কহিল,—মামীমা বলতেই তো আমি ছুটে গিয়েছিলুম, মামা; কিন্তু যেই দেখলুম, আমাদের নয়—অমনি ফিরে আসি।

মামা উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন,—কেন ফিরে এলি? আমার পুকুরে

যখন পড়েছিল, তোর মামী যখন বলেছিল, কেন তুই তুলে আনিস নি শুনি ?

অশ্রু ধীরকণ্ঠে কহিল,—তাহ'লে বলতে হ'ল মামা, সে দিন যখন আমাদের বাগানের গাছের নারকোলটা সরকারী রাস্তায় পড়লো, নাপতেদের ছেলে গোবরা সেটা কুড়িয়েছিল বলে, তুমি তার হাতখানা মুচড়ে দিয়ে নারকোলটা কেড়ে নিয়েছিলে কেন ? তোমার গাছের জিনিস বলেই তো ?

মামার মুখখানা মুহূর্ত্তমধ্যে অন্ধকার হইয়া গেল ; দাঁতে দাঁত চাপিয়া বিকৃত সুরে কহিলেন,—আচ্ছা, আচ্ছা, খুব কথা শিখেছিস— যা এখান থেকে।

এই ভাবে প্রায়ই এ সংসারে এই মেয়েটিকে লইয়া কথা কাটাকাটি চলিত। কিন্তু বয়সের দিক্ দিয়া যতই সে ছোটো হউক না কেন, নিষ্ঠার সহিত ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াইয়া এমন যুক্তিযুক্ত কথা সে মামা-মামীকে শুনাইয়া দিত যে, তাঁহাদের অপ্রতিহত প্রতাপও যেন খর্ব্ব হইয়া পড়িত। কত দিন মামা কোপ বরদাস্ত করিতে না পারিয়া এই স্পষ্টবক্তা আশ্রিতা ভাগিনেয়ীটিকে প্রহারে সায়েস্তা করিবার জন্য ছুটিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মেয়েটির মুখের দিকে তাঁহার আরক্ত মুখখানা পড়িতেই তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাত দুইখানা যেন আড়ষ্ট হইয়া পড়িত, তাহার পীঠে আর পড়িতে চাহিত না।

সময় সময় মামা কহিতেন,—বংশের ধারা যাবে কোথায়, ঠিক বাপের প্রকৃতি পেয়েছে ; কেবলই ন্যায় আর ধর্ম্ম, দুনিয়া যেন এই দুটো নিয়েই চলেছে !

অশ্রুও জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বাবার কথা স্মরণ করিয়া

আসিতেছে। এ বাড়ীতে না শুনিলেও, পাড়া-প্রতিবেশীদের মুখে সে তাহার বাবার সত্যকার পরিচয় পাইয়াছে। সেই নিরুপায় মানুষটিকে অন্যায়ের পথে নামাইবার জন্য তাহার মামার প্রাণপণ প্রয়াস এবং অবশেষে একটি দিনের অন্যায়াচারের বিধিদত্ত নির্ঘাত শাস্তির ইতিহাস সে রুদ্ধনিশ্বাসে কতবারই শুনিয়াছে! এই মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শুনিয়া অশ্রুর চিত্ত কোনও দিনই পিতার প্রতি অভিমানে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে নাই, সে শুধু ভাবিত,—তিনি কি বাঁচিয়া আছেন? থাকিলেও, তাঁহার কন্যাটি যে সূতিকাগারের সকল সঙ্কট কাটাইয়া মামার গলগ্রহের ভারটি ক্রমশঃই বাড়াইয়া চলিয়াছে, তাহা কি তিনি জানেন?

মনের ভিতর পিতার সম্বন্ধে যে চিত্র অশ্রু আঁকিয়া রাখিয়াছিল, কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেও, তাহা মুছে নাই বা ম্লান হয় নাই, বরং ক্রমশঃ উজ্জ্বলতরই হইতেছিল। যে পিতাকে জীবনে সে কখনও দেখে নাই, তাঁহার স্নেহপূর্ণ স্পর্শ পাইবার জন্য এখনও তাহার মন আকুল হইয়া উঠে।

৮

কয়েক বৎসর হইতে মাতুলালয়ের নানা অবাঞ্ছিত আবেষ্টনের মধ্যে কেবল একটি প্রাণীর সমবেদনাপূর্ণ সহানুভূতি অশ্রুর নিরানন্দময় জীবনটি যেন উৎসাহে উদ্দীপিত করিয়া রাখিয়াছে।

ভবিষ্যতের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়াই দূরদর্শী রতন রায় জয়াপুর হাই স্কুলের ফোর্থ মাষ্টার যাদুধন ভট্টাচার্য্যকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। যাদুধন রিপণ কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতেই জয়াপুর স্কুলে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া দরখাস্ত করিয়াছিল।

ইহার মূলে যে অপ্রীতিকর ঘটনাটির সংস্রব ছিল, তাহা বিশ্লেষণ করিলে এই আত্মনির্ভরশীল ছেলেটির সৎসাহসেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

যাদুধন বিরলা গ্রামের সুপরিচিত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, পূর্ব্বের কাহিনীতে আমরা যে পরিচয়টুকু তাহার পাইয়াছি, তাহাতে এই ছেলেটির সম্বন্ধে এই মাত্র আভাস পাওয়া গিয়াছে যে, লাঞ্ছিতা ভ্রাতৃজায়া উষার প্রতি সে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল, বধূর ব্যথায় তাহার প্রচুর সহানুভূতি এবং বাড়ীর মধ্যে এই ছেলেটির মনোবৃত্তিই শুধু বিভিন্ন-মুখী। দাদা ও দিদির কূটবুদ্ধি ও চণ্ডনীতির সে পক্ষপাতী যেমন ছিল না, বাবার আচরণে তাহারই উপর একটা আপাতমধুর আবরণ টানিয়া দিবার প্রয়াসটুকুও সে সহ্য করিতে পারিত না। এ বাড়ীর অভিভাবকদের নিদারুণ অর্থলিপ্সা ক্রমশঃই তাহাকে যেন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছিল।

হঠাৎ একদিন যাদুধন জানিতে পারিল, তাহার অভিভাবকগণ—এমন এক কন্যাদায়গ্রস্ত মক্কেল পাকড়াও করিয়াছেন—যিনি প্রচুর পণের উপরও জামাতার পাঠ্য-জীবনের ব্যয়ভার বোঝার মাথায় শাকের আঁটির মতই বহন করিতে প্রস্তুত! কিন্তু যাদুধন বাঁকিয়া বসিল, দৃঢ়স্বরে জানাইল,—বি-এ পাশ না করিয়া সে বিবাহ করিবে না এবং তাহার বিবাহে পণের নামগন্ধও থাকিবে না,—শ্বশুরের পয়সায় পড়াশুনা তো পরের কথা। যাদুধনের অভিভাবকরা এমন দাঁও হাতছাড়া হইতে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, তাঁহারাও কঠিন হইয়া নির্দ্দেশ দিলেন যে, তাহা হইলে যাদুধনের কলেজের খরচ চালাইতেও তাঁহারা অতঃপর অক্ষম। কিন্তু যে ছেলের মনোবৃত্তি এতটা উচ্চস্তরের, মানুষের হুমকি বা অবিচার তাহাকে কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে না। ইহার পরেই আঠারো টাকার চাকরী লইয়া এই জেদী যুবার জয়াপুরে আবির্ভাব।

রতন রায় স্কুলকমিটীর সদস্য ছিলেন। তিনি যখনই শুনিলেন, তাঁহারই স্বজাতি ও স্বশ্রেণীর এই ভদ্র ছেলেটি গ্রামেরই কোনও ব্রাহ্মণ বাড়ীতে আহার ও বাসস্থান প্রার্থী, বিনিময়ে সেই পরিবারের ছেলেদের শিক্ষার ভার লইতে সে প্রস্তুত ; তখন তিনিই সর্ব্বাগ্রে তাহাকে আশ্বাস দিলেন,—বেশ কথা, তুমি আমার বাড়ীতেই চলো, মাষ্টার ; দুবেলা খাবে, বাইরের একখানা ঘর তোমাকে ছেড়ে দেব, থাকবে ; আর আমার ছেলে-মেয়েগুলোকে পড়াবে।—কিন্তু পড়াশুনার এই প্রস্তাবটি ছিল গৌণ ; ইহাকে উপলক্ষ করিয়া যে আসল উদ্দেশ্যটি রতন রায়ের মনের মধ্যে তখনই আশার শিকড় গাড়িয়াছিল, তাহা অপর কিছু নহে—তাঁহার একাদশবর্ষীয়া কন্যা শান্তিকে অনায়াসে পার করিবার একটা অপ্রত্যাশিত উপায়।

যাদুধন রতন রায়ের বাড়ীতে আশ্রয় পাইল এবং তাহার মধুর ব্যবহারে অল্প দিনের মধ্যেই এই পরিবারটির অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সে সদাসর্ব্বদাই সচেতন থাকিত। প্রাইভেটে পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল বলিয়া নিজের পড়াশুনা তাহাকে যেমন সযত্নে করিতে হইত, বাড়ীর ছেলে-মেয়েগুলির শিক্ষা সম্বন্ধেও কোনও দিন তাহাকে কিছুমাত্র অবহেলা করিতে দেখা যাইত না।

মাতুলকন্যা শান্তি অশ্রুর অপেক্ষা বয়সে দুই বছরের ছোট ছিল। অশ্রুর বয়স সে সময় তেরো। মামার ছেলে-মেয়ে সকলেই স্কুলে পড়িবার সুযোগ পাইলেও, অশ্রু তাহাতে বঞ্চিত ছিল। সংসারের নানাবিধ কাজগুলি এমনই তাহাকে ঘিরিয়া রাখিত যে, এক সঙ্গে দুটি ঘণ্টা কোনও বিষয়ে মন নিবিষ্ট করিয়া লিপ্ত হইবার মত অবসর তাহার ছিল না ; সুতরাং কি করিয়া সে স্কুলে যাইবে! অথচ, বিদ্যাভ্যাসের জন্য তাহার

কি অদম্য আগ্রহ! যাহার চিত্তে ইহার প্রভাব প্রবল ও স্থায়ী হইয়া থাকে, সুযোগ-সুবিধা নানা বিঘ্ন-অন্তরায়ের ভিতর দিয়াও তাহা পথ করিয়া লয়। অশ্রু স্কুলের ত্রিসীমানায় না গিয়াও তাহার মামাতো ভাই-বোনদের পড়ার বই লইয়া প্রাথমিক শিক্ষা এমনই তৎপরতার সহিত শিখিতেছিল যে, স্কুলে প্রত্যহ ছয় সাত ঘণ্টা পাঠাভ্যাস করিয়াও প্রায় সমবয়স্ক ভাইবোনরা তাহার নাগাল পাইত না।

প্রতি রবিবার পড়িবার ঘরে যখন ইহাদের পাঠ-চর্চ্চা হইত এবং অশ্রুর মামার জ্যেষ্ঠপুত্র ও হাইস্কুলের ছাত্র পনেরো ষোলো বছর বয়সের রাধানাথ ছোটো ছোটো ভাইবোনগুলির পড়ার পরীক্ষা লইত, অশ্রুও সে সময় হাতের কাজ সারিয়া এক একদিন সেখানে হাজিরা দিত। যদিও প্রতি রবিবার এ সুযোগ সে পাইত না, কিন্তু যে দিনই সে রাধানাথের নিকট নিজের পড়ার ও হাতের লেখার পরীক্ষা দিত, তাহার প্রশংসা রাধানাথের মুখে আর ধরিত না। অঙ্কে তাহার কি মাথা, নামতায় একটি কথাও সে ছাড় করে না, মানসাঙ্ক যতই জটিল হউক না, সঠিক উত্তর দিতে অশ্রুর কিছুমাত্র বাধে না। রাধানাথ উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে কহিত,—বাঃ! মেয়ে তো অশ্রু, ওরা সব গাধা!

মামীর কিন্তু এই সকল ভাল লাগিত না। যাহার মা নাই, বাপ নাই, পরের দয়ায় যে মানুষ হয়, তাহার আবার কিসের পড়া-শুনা! কিন্তু অশ্রু প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজই শেষ করিয়া পড়াশুনার যে সময়টুকু করিয়া লইত, মামীর তাহাতে বলিবার কিছু না থাকিলেও সময় সময় তাঁহার আচরণে ছলের সম্ভাব দেখা যাইত এবং সেই সূত্রে নূতন প্রয়োজন উপস্থিত হইয়া অশ্রুকে বিচলিত করিয়া তুলিত।

যাদুধন এই বাড়ীতে থাকিয়া এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সকলের সহিত

মিশিবার সুযোগ পাইয়া বুঝিতে পারিয়াছিল, কিরূপ আবেষ্টনের মধ্যে সে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহারই মধ্যে অশ্রু মেয়েটির আশ্চর্য্যরকমের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও পড়াশুনার দিকে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাহাকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল। এই মেয়েটির জীবনেতিহাস তাহার মামা ও মামী উভয়েই তাহাকে শুনাইয়া দিয়াছিলেন এবং মাতৃহারা পিতৃপরিত্যক্তা এই অভাগী যে তাঁহাদেরই গলগ্রহ হইয়া রহিয়াছে, সে পরিচয়টুকু প্রকাশ করিতেও দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু যাদুধন এ বাড়ীতে বাসা পাতিয়াই এই মেয়েটির প্রকৃতিগত যে পরিচয় পাইয়াছিল, তাহাই তাহার উদার চিত্তটির উপর মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল।

ছেলে-মেয়েরা সকলেই যাদুধনকে যাদুদাদা বলিয়া ডাকে; অশ্রু প্রথম প্রথম ইহার সংস্পর্শে আসে নাই, কিন্তু পরে সংস্পর্শ কাটাইয়া থাকা তাহার পক্ষে সম্ভবপরও হয় নাই। কথাবার্ত্তা যখন চলিল, তখন যাদুধনই একদিন তাহাকেও পড়িবার ঘরে আহ্বান করিল।

মামী প্রতিবাদের ভঙ্গীতে কহিলেন,—ওকে আর কেন, বাবা! যে বিদ্যে শিখেছে, তার ঠেলাতেই বাড়ীশুদ্ধ সবাই অস্থির; কি হবে ওর পড়ে?

যাদুধন উত্তর দিল,—লেখা-পড়া শেখাটা তো দোষের নয়, মা। তাতে জ্ঞান-বুদ্ধির উৎকর্ষ হয়। ওকেও তো আপনাদের পার করতে হবে, আজ কাল পড়াশুনা না জানলে মেয়েদের বে'ই হয় না, শিখুক না কিছু, তাতে শান্তিরও পড়াশুনার সুবিধে হবে।

রতন রায় সে সময় উপস্থিত ছিলেন। মাষ্টারের কথাটা তাঁহার মনের মতই হইয়াছিল। প্রসন্নভাবে কহিলেন,—বেশ তো পড়ুক না, ক্ষতি কি তাতে।

মামী আর আপত্তি তুলিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখখানা অন্ধকার হইয়া গেল।

অশ্রুর নির্দ্দিষ্ট বই কিছুই ছিল না, খাতা, শ্লেট, পেনসিল এ সবের বালাইও তাহার নাই; তথাপি তাহার পড়াশুনা চাই! কয়েকদিন পরেই তাহার নূতন কয়েকখানি বই আসিল, সঙ্গে সঙ্গে তিনখানি খাতা, একখানা শ্লেট, একবাক্স পেনসিল।

অশ্রু তাহার ছল ছল চক্ষু দুটি মাষ্টারের মুখের দিকে তুলিয়া কহিল,—আপনি এ সব কেন কিনে আনলেন গাঁটের পয়সা দিয়ে?—জানেন তো এ-গুলোর দাম পাবেন না।

যাদুধন হাসিমুখে কহিল,—আমি যখন পড়াবার ভার নিয়েছি, তার জন্ম যা যা দরকার—সেগুলো যোগাবার দায়িত্বও আমার; এর জন্ম দাম তো কারুর কাছে আমি চাইনে।

অশ্রু চক্ষুর দৃষ্টি উজ্জ্বল করিয়া কহিল,—বা-রে! তা হ'লে বাড়ীতে কি পাঠাবেন? নিজের পড়ার খরচ কি ক'রে চালাবেন? আমার পড়ার বই পত্তর যোগাতেই যদি সব যায়।

যাদুধন কহিল,—যাবে কেন? তোমার বিয়ের সময় তোমার মামাকে একটা লম্বা ফর্দ্দ দেব, তিনি আগাগোড়ার সব দাম তখন চুকিয়ে দেবেন।

মুখখানা আরক্ত করিয়া অশ্রু কহিল,—যা-ন্! আপনি ভারি দুষ্টু।

কিন্তু এই দুষ্টু ছেলেটি তাহার কোনও আপত্তিই কানে না তুলিয়া তাহাকে যথাযথ ভাবে পড়াইয়া ও প্রয়োজন মত বই খাতা যোগান দিয়া চলিল। ইহার ভিতরেই যাদুধন প্রাইভেটে বি, এ, পরীক্ষা দিয়াছিল। একদিন সকলেই বিস্ময়ানন্দে শুনিল, যাদুধন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাস করিয়াছে।

অশ্রুর আনন্দ সে দিন দেখে কে! পূজা-পার্ব্বণের সময় মামার নিকট অশ্রুও কিছু কিছু পয়সা পাইত, কিন্তু পয়সাগুলি খরচ না করিয়া সে সঞ্চয় করিয়া রাখিত। এই দিন সে সঞ্চিত পয়সাগুলি গুণিয়া দেখিল, পাঁচসিকা হইয়াছে। যাদুধন হিঙ্গের কচুরীর বিশেষ ভক্ত ছিল। অশ্রু অতিকষ্টে মামীর অনুমতি লইয়া স্বহস্তে কচুরি তৈয়ারী করিতে বসিল।

অপরাহ্ণে যথাসময় যাদুধন পড়িবার ঘরে আসিতেই এক থালা কচুরি লইয়া অশ্রু সেখানে দেখা দিল। অন্যদিন এই সময় এক বাটি মুড়ি ও একটু গুড় তাহার জলযোগের জন্য আসিত, আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া সে সবিস্ময়ে কহিল,—এ কি ব্যাপার!

শান্তি ও অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা পিছু পিছু আসিয়াছিল। তাহাদের এক জন জানাইয়া দিল,—জানেন মাষ্টার মশাই, দিদি রথে, চড়কে, দোলে, বাবার কাছে যে পয়সা পেয়েছে, খরচ করে নি একটিও; আজ সেগুলো দিয়ে নিজের হাতে এই সব করেছে!

যাদুধন অশ্রুর মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে কহিল,—বটে!

শান্তি কহিল,—কেন করেছে, তা বুঝি জানেন না? আপনি পাস করেছেন, তাই আপনাকে খাওয়াচ্ছে।

যাদুধন এবার প্রফুল্ল মুখে কহিল,—য়্যাঁ, তাই না কি! তা হ'লে তো ভারি ভুল তুমি ক'রে ফেলেছো, অশ্রু! পাস যখন আমি করেছি, খাওয়ানো তো আমারই উচিত; তুমি কেন খাওয়াবে?

শান্তি কহিল,—মা'ও ঠিক এই কথা ওকে বলেছিল, কিন্তু ও শোনে নি।

অশ্রু এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল এবং টেবলটি ঝাড়িয়া থালাখানি যথাস্থানে রাখিয়া কথা কহিবার সুযোগটির প্রতীক্ষা করিতেছিল। এবার

কহিল,—কিন্তু ও কথা আমার মনে ধরে না তো! আপনি পরিশ্রম ক'রে পড়ে পাস করেছেন, খাওয়ানো তো আমাদেরই উচিত আপনাকে—আর কি-ই বা এমন আপনাকে খাওয়াচ্ছি,—খানকতক কচুরি, এই তো! উঠুন, হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নিন, নৈলে জুড়িয়ে যাবে!

একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দে যাদুধনের চিত্তটি তখন দুলিয়া উঠিতেছিল!

৬

স্ত্রীর নির্দ্দেশে একদা রতন রায় বুঝিতে পারিলেন, কন্যা শান্তির গতিমুক্তি সম্বন্ধে যে উদ্দেশ্য তিনি পোষণ করিতেছিলেন, তাহাতে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইতেছে ভাগিনেয়ী অশ্রু।

অশ্রুর প্রতি যাদুধনের অতিরিক্ত মমতা, তাহার পড়াশুনার উন্নতির জন্য নানা ভাবে দান-খয়রাত এবং যাদুধনের সুখ-সুবিধার সম্বন্ধে অশ্রুর অতি সতর্কতা—এ বাড়ীর প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। অবশ্য ইহাতে দোষের কিছু না থাকিলেও ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া সন্দেহ করিবার অনেক কিছুই ছিল।

মামী কহিলেন,—এইজন্যেই তখন বলেছিলুম, ওর আর পড়াশুনায় কাজ নেই, ঐ থেকেই তো অত মাখামাখি; যাদুদা বলতেই অজ্ঞান; কথা কানে যদি গেল, আর রক্ষে নেই! মাষ্টারও তাই, অশ্রুর দরদে চোখ দিয়ে অশ্রুর দরিয়া বয়!

রতন রায় উদ্বিগ্নভাবে কহিলেন,—এমন যে হবে, তা ভাবি নি। যার কেউ কোথাও নেই, তার দিকে কেউ ফিরে চাইবে না এইটেই ছিল

আমার ধারণা। যাই হোক, তুমি ভেবো না, কাঁটা শীগ্‌গিরই সরিয়ে দিচ্ছি।

যাদুধনের পদোন্নতি হইয়াছে, এখন সে জয়াপুর স্কুলের থার্ড মাষ্টার। বেতন বাড়িয়া বত্রিশে উঠিয়াছে। কিন্তু পড়া সে ছাড়ে নাই, এক সঙ্গে 'এম, এ' ও 'ল' পড়ে।

মধ্যে রতন রায় যাদুধনের নিকট তাঁহার মনের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যটির বিষয় অসঙ্কোচেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। যাদুধন কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া উত্তর দিয়াছিল,—ও চিন্তা আমার মনেও এখন স্থান পাবে না, রায় মশাই! আগে তো এম, এ-টা দিই; তখন এ সম্বন্ধে ভাবা যাবে।

ইহার উপর রতন রায়ের আর কথা চলে না; মনে যাহাই থাকুক, যাদুধনকে চটাইবার সাহসও তাঁহার নাই। ইহারই বিশেষ চেষ্টায় তাঁহার বড় ছেলে রাধানাথ ভাল করিয়া ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে, এখন সে কলেজে পড়ে। সে ব্যবস্থাও যাদুধন করিয়া দিয়াছে এবং এখনও তাহার তত্ত্বাবধান করে। পরবর্ত্তী ছেলেগুলিও পড়াশুনায় বিশেষ উন্নতি করিয়াছে, মেয়েগুলিও লেখাপড়া শিখিয়া এই কয় বৎসরেই বেশ চটপটে হইয়া উঠিয়াছে। এখন যাদুধন যদি হাতছাড়া হয়, সকল দিক্ দিয়াই তাঁহার ক্ষতি। কিন্তু গৃহিণী যে নূতন সন্দেহটির কথা তুলিয়াছেন, তাহাও উপেক্ষা করিবার নহে। এ অবস্থায় মনের সমস্ত চিন্তা দ্বেষে পরিণত হইয়া এই নিরপরাধা আশ্রিতা বালিকাটির উপরেই পড়িবার কথা,—যে হেতু, তাঁহারই স্বার্থের পথে এই মেয়েটিই এখন বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহাকে অচিরাৎ না সরাইলেই নয়। রতন রায়ের মনে যখনই যে সঙ্কল্প দৃঢ় হইয়া উঠে, তাহাই অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না।

সে দিন শনিবার ; প্রত্যুষেই রতন রায় সকলকেই শুনাইয়া দিলেন,—অশ্রুর বিয়ে ঠিক করেছি, ঘর বর খুবই ভালো ; বিষয়-আসয়, টাকাকড়ির কমতি নেই, তা ছাড়া পাত্তর নিজেও মোটা মাইনের চাকরী করে, যা তা চাকরী নয়—ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট কোম্পানীর অফিসের বড়বাবু ; পৌনে দুশো টাকা মাইনে পায়। আজ অফিসের পার্টী এসে মেয়ে দেখে যাবে, পছন্দ যদি হয়—এই মাসেই কাজ হবে। এখন জগদম্বার ইচ্ছা।

বালক-বালিকাদের নিকট এ সংবাদ খুবই তৃপ্তিকর হইল ; তাহারা উল্লাসে কলোচ্ছ্বাস তুলিল,—কি মজা ! অশ্রুদির বে হবে !

অশ্রুর মামী গম্ভীর মুখে কহিলেন—মেয়ে যদি পছন্দ হয়, তবে তো ! যে ধেড়ে মেয়ে, দেখেই না পেছোয়।

অশ্রুর মামা কহিলেন,—সেইজন্যই তো বলছি, এখন জগদম্বার ইচ্ছা।

কথাটা অশ্রুর কানেও উঠিল, কিন্তু তাহার মুখে কোনও পরিবর্ত্তন কেহ দেখিতে পাইল না।

যাদুধন সে সময় প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া আইনের একখানা বই লইয়া বসিয়াছিল, গৃহস্বামীর কথাগুলি যেন একটা আকস্মিক নির্ঘাত আওয়াজের মত তাহাকে স্তব্ধ ও আড়ষ্ট করিয়া দিল। সেই ভাবেই আইনের কেতাবটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হরপগুলির উপর নিস্তেজ চক্ষুর ক্ষীণ দৃষ্টি মেলিয়া বহুক্ষণ সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যে কথাগুলি সুস্পষ্টভাবে তাহার দুইটি কানের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, সেইগুলিই যেন মর্ম্মের দুয়ারে গিয়া গোলযোগ বাধাইয়া দিল,—অশ্রুর বিয়ে ! ঘর-বর খুবই ভালো ! টাকা-পয়সার অভাব নেই, ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট কোম্পানীর বড়বাবু, পৌনে দুশো টাকা মাইনে !

খুট্ করিয়া একটু শব্দ হইতেই যাদুধনের চিন্তার সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল।

চিত্তের এ দুর্ব্বলতাটুকু কাটাইয়া সোজা হইয়া বসিতেই সে দেখিল, অশ্রু আস্তে আস্তে চায়ের পিয়ালাটি টেবলের উপর রাখিতেছে। চোখোচোখি হইবামাত্র উভয়কেই আজ চমকিত হইতে হইল। এখন অশ্রুর বয়স হইয়াছে, অনেক বই পড়িয়াছে, বাঙ্গালা মাসিকের কোনও গল্পই তাহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে না মাষ্টার মহাশয়ের সৌজন্যে; বাঙ্গালীর ঘরের পনেরো বৎসরের মেয়ে এরূপ ক্ষেত্রে চক্ষুর ভাষাও পড়িতে পারে। আর কোনও দিন তো সে এই মানুষটির দৃপ্ত দুইটি চক্ষুর এরূপ অপূর্ব্ব দৃষ্টি দেখে নাই! আজ যাদুধন দেখিল, তাহার দুই চক্ষুর ভাবময় দৃষ্টিতে ভালো করিয়াই দেখিল, এই মেয়েটি মনের ভিতর এতদিন যে বিক্ষোভ অসন্তোষ অভিমান সবলে চাপিয়া রাখিয়াছিল, কাহাকেও তাহার আভাসটুকুও জানিতে দেয় নাই, আজ যেন তাহার সকল প্রয়াস উপেক্ষা করিয়া সেগুলি দুটি আয়ত চক্ষুর ভিতর দিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে!

ক্ষণকাল কাহারও মুখে কথা নাই, উভয়ের ত্রুটি যেন উভয়ের দৃষ্টি ধরাইয়া দিয়াছে। এই সময় মামীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আহ্বান দুইজনকেই নিষ্কৃতি দিল। অশ্রু ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল; কিন্তু সে সময় তাহার চক্ষু দুইটি শুষ্ক ছিল কি?

অপরাহ্নের দিকে পূর্ব্বাহ্নের কথিত পাত্র অশ্রুকে দেখিতে আসিলেন। রতন রায় আদর করিয়া তাঁহাকে বাহিরের ঘরে বসাইলেন, যাদুধনকে ডাকিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। যাদুধন প্রথমে ভাবিয়াছিল, আগন্তুক পাত্রের পিতা কিম্বা অন্য কোন অভিভাবক, কিন্তু সে ভ্রম তাহার পরক্ষণেই ভাঙিয়া গেল। পাত্র স্বয়ং উপস্থিত অশ্রুকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া রতন রায়কে দায়মুক্ত করিতে।

আগন্তুকের নাম নরহরি গঙ্গোপাধ্যায়। সহসা দেখিলে মনে হয়,

বয়স পঞ্চান্নর কম নয়, স্থূলকায়, দেহের বর্ণ যেমন তেমন কালো নহে—তাহা এতই গাঢ় যে, আফিসের পদমর্য্যাদার অনুরোধে কালো আলপাকার যে চাপকান গায়ে চড়াইয়াছিলেন, গায়ের রঙের সহিত তাহা যেন আশ্চর্য্য রকমেই মিশিয়া গিয়াছে। কেবল গলার উপর দিয়া ধোপ দুরস্ত শাদা উড়ুনিখানি পাকানো অবস্থায় দুলিতেছিল বলিয়া যেন বাধা পাইয়া মুখখানির সৌন্দর্য্য আরও স্পষ্ট ও গাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। মাথাটি ভরিয়া টাকের মসৃণতা, সুতরাং চুল কাঁচা কিংবা পাকা ধরিবার উপায় নাই, গোঁফের পাটও এ ক্ষেত্রে থাকা সম্ভব নহে, রীতিমত ক্ষৌরিত এবং মাথার মতই ঐ অঙ্গ মসৃণ।

পাত্রটির বংশ পরিচয় তাঁহার দৈহিক পরিচয়ের মতই বিপুল এবং উল্লেখযোগ্য। তিন পুত্র বিদ্যমান, তাঁহারা প্রত্যেকেই কৃতী; পাঁচটি কন্যা আছে, তাহারা বহুকাল পূর্ব্বেই বিবাহিতা হইয়াছে। পুত্র-কন্যারা প্রায় প্রত্যেকেই সন্তানবতী। জমিজেরাৎ যথেষ্ট আছে, পাত্রের হাতে টাকাও কিছু আছে। ডায়মণ্ডহারবারের সান্নিধ্যেই ইঁহাদের পৈতৃক বসতবাটী। তবে পাত্রটি চাকরী-সূত্রে টালিগঞ্জে এক আত্মীয়ের বাসায় থাকেন, বিবাহের পর নববিবাহিতা পত্নীকে লইয়া স্বতন্ত্র বাসা পাতিবেন বাসনা আছে। মাস কয়েক হইল ইনি বিপত্নীক হইয়াছেন এবং তদবধি মনোমত পত্নী-নির্ব্বাচনে নানাস্থানেই ঘোরাঘুরি করিতেছেন; কিন্তু কোথাও কন্যা পছন্দ হয় নাই। কন্যা পছন্দ হইলে কন্যাপক্ষের কোনও চিন্তাই নাই, বিবাহের যাহা কিছু ব্যয়-ভূষণ তিনিই করিবেন।

বাহিরের ঘরে এই সব কথাবার্ত্তাই চলিতেছিল। রতন রায় প্রসন্ন ভাবেই পাত্রের কথায় সায় দিয়া যাইতেছিলেন। যাদুধন অপ্রসন্ন মুখে এক পার্শ্বে বসিয়া ইঁহাদের কথা শুনিতেছিল। সে আজকালকার ছেলে,

সুশিক্ষা পাইয়াছে, বিশেষতঃ মনোবৃত্তি তাহার অনুরূপ; বৃদ্ধের কথা সে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিতেছিল না। রতন রায় অশ্রুকে আনিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই সে সহসা সোজা হইয়া বসিল এবং প্রখর দৃষ্টিতে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ঘনকৃষ্ণ মুখখানির দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—কি উদ্দেশ্যে মহাশয়ের এই বিবাহের বাসনা?

বৃদ্ধের মুখখানা এই প্রশ্নের আঘাতে স্ফীত হইয়া উঠিল,—ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন,—এ কথা বলবার মানে তো বুঝলাম না।

যাদুধন কহিল,—মানে এই, সংসারধর্ম্ম, বংশরক্ষা, কুলকর্ম্ম এদের সবগুলোই তো আপনার হয়ে গেছে, তবে আবার কেঁচে গণ্ডুষ কেন?

বৃদ্ধের মুখে ক্রোধের চিহ্ন দেখা দিল, কথার সুরেও তাহার আভাস পাওয়া গেল; কহিলেন,—আমার ইচ্ছা; পয়সা যার থাকে, সব ইচ্ছাই তার হ'তে পারে।

যাদুধন সঙ্গে সঙ্গে কহিল,—ইচ্ছা হ'লেও তা পূরণ হ'তে পারে না—সব ক্ষেত্রে সেটা মনে রাখবেন। আপনার এ ইচ্ছার মানে—হত্যার বাসনা; হাঁ, একটা বালিকাকে হত্যা করতেই আপনার আসা।

বৃদ্ধের দুই চক্ষু এবার আরক্ত হইয়া মুখের শোভা তাঁহার বাড়াইয়া দিল। কণ্ঠের স্বরও সেই সঙ্গে উচ্চ হইয়া উঠিল,—কি! তুমি যা তা ব'লে আমাকে খেলো করতে চাও, ছোকরা? জানো আমার পঞ্জিস্থান,—জানো, আমি তোমাকে—

ক্রোধের আতিশয্যে তাঁহার কণ্ঠের স্বর এখানে রুদ্ধ হইয়া গেল। রতন রায় অশ্রুকে সঙ্গে করিয়া ধীরে ধীরে আসিতেছিলেন, চীৎকার শুনিয়া শশব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন, ব্যগ্রকণ্ঠে জানিতে চাহিলেন,—কি, কি, ব্যাপার কি? হয়েছে কি?

বৃদ্ধ কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—আবার কি! ঐ ছোকরাটাকে কি আমায় অপমান করতে আপনি রেখে গেলেন? বলে কি না—এ বয়সে আমার এ ইচ্ছা কেন? কি এমন আমার বয়স হয়েছে মশায় বলুন তো!

রতন রায় একবার যাদুধনের দিকে দৃষ্টি ফেলিয়াই তৎক্ষণাৎ দুইদিক সামলাইয়া লইলেন। দৃষ্টি যেন যাদুধনকে চুপ করিতে মিনতি জানাইল, বৃদ্ধকে কহিলেন,—আপনি রাগ করবেন না, ও আপনাকে ঠাট্টা করেছে, যে সম্পর্ক হ'তে চলেছে, তাতে ঠাট্টা করবার অধিকার ওর আছে। এখন স্থির হয়ে কন্যা দেখুন তো।

কন্যা ইতঃপূর্ব্বেই দরদালানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং তাহার জন্য স্নেহময় মাতুলের বহুযত্নে সংগৃহীত পাত্রটির রোষারক্ত মুখখানি এক দৃষ্টিতেই দেখিয়া লইয়াছিল। মামার আহ্বানে এবার তাহাকে ভিতরে যাইতে হইল, ফরাসের এক পার্শ্বে বসিবার পূর্ব্বে সে এই নূতন অতিথি, মাতুল ও যাদুধন এই তিন সম্মানভাজন ব্যক্তির চরণে একে একে মাথা ঠেকাইল।

পাত্রীকে দেখিয়াই বৃদ্ধের মনের সমস্ত গ্লানি একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল, মুখে প্রসন্নতার আভা পড়িল। নাম হইতে আরম্ভ করিয়া নানা প্রশ্নই বৃদ্ধের তরফ হইতে আসিল, অশ্রু মুখখানি নীচু করিয়া সব প্রশ্নেরই উত্তর দিল। বৃদ্ধ অতঃপর রায় প্রকাশ করিলেন,—বাঃ! পাস হয়ে গেছো, একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাসে।

অতঃপর রতন রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ হাসিমুখে কহিলেন,—এবার তা হ'লে কাজের কথা আমাদের হোক, রায় মশাই!

যাদুধন মনে মনে অতিশয় অস্বস্তি অনুভব করিয়া অশ্রুকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—তুমি বাড়ীর ভেতর যাও, অশ্রু!

অশ্রু যেন কাঠগড়া হইতে নামিবার নির্দ্দেশ পাইল। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে

যাদুধনের মুখের দিকে একটিবার চাহিয়াই সে উঠিল। বৃদ্ধের ইচ্ছা নয় যে, অশ্রু তাঁহার সম্মুখ হইতে উঠিয়া যায়, কিন্তু এই বিদ্বেষভাজন ছেলেটির মুখের উপর এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ তুলিবার সাহসও তাঁহার আসিল না।

অতঃপর এই ছেলেটির দিকে বক্রদৃষ্টিতে একবার চাহিয়া বৃদ্ধ বেশ জাঁক করিয়াই কাজের কথা সুরু করিলেন। নানারূপ ভঙ্গিমা করিয়া তিনি প্রকাশ করিলেন,—মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে। আর আমার যে কথা, সেই কাজ। খরচ-পত্রের জন্য আপনাকে কিছুই ভাবতে হবে না, সে ভার সব আমার। গয়নায় আমি মেয়েকে মুড়েই নিয়ে যাব এখান থেকে। হাঁ, তবে আপনি সেদিন বলেছিলেন, অনেক কিছুই করেছেন মেয়েটির জন্য, সব ভার নিয়ে এত বড় কোরে তোলা, লেখাপড়া শেখানো,—খরচ করেছেন বৈ কি; বলতে পারেন আপনি; অবুঝতো আমি নই,—একটা মার্চ্চেণ্ট আফিসের হোল এসটাব্লিসমেণ্ট আমার হাতে—মালিকরা তো থাকেন সিঙ্গাপুরে। হাঁ, যা বলছিলুম, হাজার টাকা আমি আপনাকে প্রণামী ব'লে দেব। তার মধ্যে যে দিন পাত্রীকে পাকা দেখে যাবো, সে দিন দেব পাঁচশো আগাম, বাকিটা বিয়ের রাতে। এখন পাঁজীটা আনান, দিনটা দেখি।

রতন রায়ের ইচ্ছা ছিল না যে এসব কথা যাদুধনের সমক্ষে ওঠে। কিন্তু পাত্র এমন কায়দায় কথার পীঠে কথা পাড়িয়া বসিলেন, যখন আপত্তি তুলিবার আর উপায় ছিল না।

পাঁজী দেখিয়া জানাইলেন,—আসছে শুক্রবার ছাড়া পাকা দেখার দিন এ মাসে আর নেই। এ দিনটায় একটু বাধা এই যে, আফিসটা কামাই করতেই হবে; কেন না, বেলা এগারোটা পনেরো মিনিট সাতাশ সেকেণ্ড থেকে পৌনে একটা পর্য্যন্ত শুভদিন এবং মাহেন্দ্রযোগ। যাক্,

এ দিনটা না হয় ছুটীই নেবো।—হাঁ, তার পর বিয়ের দিন—এর পরের হপ্তায় পর পর তিনটে আছে, এরই একটা বেছে দিন স্থির সেই দিনই করা যাবে।

রায় মহাশয়ের মনের মধ্যে তখন স্ফূর্ত্তির উজান বহিয়াছে,—কয়দিন পরে পঞ্চশত মুদ্রা হস্তগত হইবে,—পরবর্ত্তী সপ্তাহে আরও পাঁচশো! ভবিষ্যতে আরও নানা প্রাপ্তি এবং পদস্থ এই পাত্রটির অনুকম্পায় কত না সুযোগ সুবিধার সম্ভাবনা!—মনের মধ্যে ভাবি আশাগুলি তখন হুটোপাটি আরম্ভ করিয়াছে! কোনও রূপে আত্মদমন করিয়া তিনি অনুরোধ জানাইলেন,—ঐ দিন কিন্তু এখানে মধ্যাহ্ন ভোজন করা চাই, এইটুকু আমার একান্ত অনুরোধ।

এই অনুরোধ রক্ষা করিবার সম্মতি দিয়া এবং এ দিনের উপস্থাপিত জলযোগ শেষ করিয়া হাসিমুখেই নরহরি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সন্ধ্যার পর যাদুধন রায় মহাশয়কে কহিলেন—কাজটা কি ভাল করছেন?

রতন রায় বিরক্তভাবে কহিলেন,—কি মন্দ করছি শুনি?—ওর অবস্থার কথা তো স্বকর্ণেই শুনেছো; বি, এ, পাশ ক'রে তুমি মাসে কত কামাচ্ছ, সে তো আমার অজানা নেই! আর ও মাসে মাইনে পায় পৌনে দু'শো। অত বড় আফিসের বড়বাবু, উপরি উপায়ও বড় অল্প করে না। অশ্রু তো রাজরাণী হ'তে চলেছে হে! আর ওর কল্যাণে আমার বাচ্ছাগুলোরও কিছু না কিছু হিল্লে হয়ে যাবে, লেখাপড়া শিখে পাস করেই বা করবে কি ওরা! আর ওদের আফিস কি শুধু একটা, এক জায়গায়? কলকেতা, কটক, মাদ্রাজ, দিল্লী, বোম্বাই, সিলোন,

সিঙ্গাপুর, বর্ম্মা,—কোথায় নেই? বড় কেউ-কেটা লোকের হাতে আমি অশ্রুকে তুলে দিচ্ছি না, এটা মনে রেখো। তবে বলতে পারো বটে, বয়েস একটু হয়েছে; তা হলেই বা! আসল কথা হচ্ছে, ইজ্জত আর পয়সা, পাত্রের যখন এ দুটোই আছে, তখন আবার কথা কি!

এতদূর তলাইয়া যিনি এমনভাবে কথা কহিতে পারেন, সেখানে কথা বলাই বিড়ম্বনা। কাজেই যাদুধন নিরুত্তরেই উঠিয়া গেল।

রতন রায় বক্রদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া মনে মনে হাসিলেন মাত্র; সে হাসির অর্থ ইহাই ধরিয়া লওয়া যায় যে,—যেখানে তোমার ব্যথা, সেইখানেই দিয়েছি আঘাত; জ্বালা তো হবেই!

রাত্রিতে আহারের আগেই পড়িবার ঘরে অশ্রুর সহিত সহসা দেখা হইতেই যাদুধনের মনের রুদ্ধ আবেগ উথলিয়া উঠিল; আর্ত্তস্বরে সে জানিতে চাহিল,—তুমি ব'লে দাও, অশ্রু, কি ক'রে তোমাকে বাঁচাই, কি করতে-পারি আমি তোমার জন্যে?

ম্লান মুখখানি তুলিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে অশ্রু কহিল,—কি করতে চান আপনি? কি করতে পারেন?

যাদুধন উত্তেজিতকণ্ঠে কহিল,—সবই পারি, অশ্রু, তোমার জন্যে, তোমাকে রক্ষা করতে, এই অতি অন্যায় দমন করতে।

অশ্রু ধীরকণ্ঠে কহিল,—কিন্তু এ তো অন্যায় নয়, কেন আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন বলুন তো?

অন্যায় নয়! তুমিই বলছ, অশ্রু?

হাঁ। আমার কথা কেন আপনি ধরছেন, ওঁদের দিক্ দিয়েই বিচার ক'রে দেখুন, তা হলেই বুঝবেন!

আমি বুঝতে পারলুম না।

পারলেন না? আচ্ছা যাদুদা, আঁতুড়ঘরেই আমি যদি মরতুম, এ সমস্যা তো আজ উঠতো না। ওঁদের অনুগ্রহেই না আমি এত বড় হয়েছি! আপনার মতন মহাপ্রাণ মানুষটির সাহচর্য্য যে পেয়েছি, তার মূলেও তো আমার মামা! আজ তিনি যে ব্যবস্থা করেছেন আমার সম্বন্ধে, সেইটি মেনে চলাই কি আমার উচিত নয়, যাদুদা? আমার বাবা অত বড় জ্ঞানী আর বিদ্বান্ হয়েও উপকারীর ঋণপরিশোধ করতে অন্যায়ের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। আমি তাঁরই মেয়ে, সেই রক্তই তো আমার দেহে; আমি যদি আজ আমার আশ্রয়দাতা প্রতিপালকের এই বিধান মেনে নিই, সেটা কি অন্যায়?

কথাগুলি বলিয়া অশ্রু ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। যাদুধন বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ দ্বারের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে উত্তেজিতভাবে সোজা হইয়া বসিল, নিজের মনেই কহিল,—তোমার এ যুক্তি আমার অন্তর স্পর্শ করলো না, অশ্রু। আমি পারলুম না তোমার কথা রাখতে; উপায় আমাকে করতেই হবে তোমাকে বাঁচাতে; দেখি, কি করতে পারি।

পরক্ষণেই সে চিঠির প্যাড ও ফাউণ্টেইন পেনটি লইল।

৭

আজ সেই নির্দ্ধারিত শুভদিন;—ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট কোম্পানীর বড় বাবু নরহরি গঙ্গোপাধ্যায় অশ্রুকে পাকা রকমে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন! বাহিরের ঘরখানি ভাল করিয়া সাজান হইয়াছে। রতন রায়ের ছেলেরা সকলেই আজ বাড়ীতে উপস্থিত। যাদুধনও তাঁহার অনুরোধে ছুটী লইতে

বাধ্য হইয়াছে। রতন রায়ের কুলপুরোহিত এবং তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গস্থানীয় পল্লীর কতিপয় বয়োবৃদ্ধ এই উৎসবে আমন্ত্রিত হইয়াছেন। বাহিরের ঘরখানি প্রায় ভরিয়া গিয়াছে।

ফরাসের মধ্যস্থলে পাত্রপক্ষের সর্ব্বস্ব হইয়া একাই পাত্ররূপী নরহরি গঙ্গোপাধ্যায় আসীন। ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট কোম্পানীর তখন ভারি নাম-ডাক, এই আফিসে নাম লিখাইবার জন্য দরখাস্ত লইয়া কত উমেদারই ছুটাছুটি করে! সেই আফিসের বড় বাবু স্বয়ং উপস্থিত এই পল্লীতে—এই বাড়ীতে নিজের পাত্রী নিজে দেখিতে। পাত্রের বয়স ও বিসদৃশ বাসনা তাঁহার পদমর্য্যাদার প্রভাবে আলোচনার বাহিরে সরিয়া গিয়াছে। এই ভাগ্যবান্ মানুষটির মুখের কথা শুনিতে বা মুখোমুখি হইয়া দুই চারিটি কথা কহিতে প্রায় সকলেই ব্যগ্র।

যথাসময় অশ্রুকে সভায় আনা হইল। যাদুধন তাহার দিকে একটিবার ছল ছল চক্ষুতে চাহিয়াই মুখখানা বাহিরের দিকে ফিরাইল। কন্যার পার্শ্বেই একখানি প্রকাণ্ড থালা, তাহাতে দধি, চন্দন, ধান্য, দূর্ব্বা প্রভৃতি সাজানো ছিল। থালাখানা আসিবামাত্রই পাত্র পকেট হইতে একটি নোটের তাড়া বাহির করিয়া তাহার এক ধারে রাখিলেন। রতন রায়ের মুখখানি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

এইবার আশীর্ব্বাদের পালা। কিন্তু ঠিক এই সময় বাড়ীর বহির্দ্বারের সম্মুখে একখানা প্রকাণ্ড মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। মোটরখানার গুরুগম্ভীর 'হর্ণ' বৈঠকখানায় সমবেত সকলকেই চমকিত করিয়া দিল।

পরক্ষণেই দেখা গেল, এক সৌম্যমূর্ত্তি দীর্ঘাকৃতি সাহেব ধীরে ধীরে বৈঠকখানার দিকেই আসিতেছেন, তাঁহার পশ্চাতে তকমাধারী এক পাঞ্জাবী আরদালী। যাদুধন গবাক্ষ-পথে বাহিরের দিকেই চাহিয়াছিল,

মোটরখানাকে এই বাড়ীর দ্বারদেশে আসিতে দেখিয়াই সে উদ্বেলিত বক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন আরদালী সহ সুবেশধারী সাহেবের উপস্থিতি সকলকেই স্তম্ভিত করিয়া দিল।

পাত্রের মুগ্ধ দৃষ্টি এতক্ষণ কন্যার মুখেই নিবদ্ধ ছিল, মোটরের আবির্ভাব তাঁহার অভিভূত অবস্থা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই, কিন্তু দ্বারদেশে নবাগতের বুটের শব্দে তাঁহার সমাধি ভাঙিয়া গেল। সেই সঙ্গে দ্বারের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি অনুভব করিলেন যেন তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট কন্যা ও ঘরশুদ্ধ মানুষগুলির সহিত তিনি নবাগত সাহেব-বেশী অতি-মানুষটির চারি পার্শ্বে ঘুরপাক খাইতেছেন!

কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে এই অভিভূত অবস্থা অতিক্রম করিয়া তিনি বিপুল দেহখানিকে নাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সঙ্গে সঙ্গে আবক্ষ মাথাটি নত করিয়া ভয়ার্ত্তস্বরে কহিলেন,—স্যার! আপনি! এখানে?

ইতিমধ্যেই আরদালী দ্বারদেশের এক প্রান্তে তাহার স্থান করিয়া লইয়াছিল এবং সাহেব-বেশী পুরুষটি অকুতোভয়ে ঘরের ভিতরে ফরাসের পার্শ্বেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মাথার টুপীটি খুলিয়া আরদালীর হাতে দিয়া তিনি এইবার বিস্মিত প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তর দিলেন,—জরুরী প্রয়োজনে আমাকে এখানে আসতে হয়েছে, গাঙ্গুলী! এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই; আশ্চর্য্য বরং আমাকেই হ'তে হয়েছে আপনাকেও এখানে দেখে। আমার যেন মনে হচ্ছে, বাড়ীতে আপনার ছেলের অসুখ, এইকথা জানিয়েই আপনি ছুটি নিয়েছিলেন—আজকের জন্য!

গাঙ্গুলীর কালো মুখখানা হইতে সমস্ত রক্ত যেন সেই মুহূর্ত্তে কোথায় সরিয়া গেল! কেশহীন মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি ভাঙা গলায় কহিলেন,—আপনি বসুন স্যার, আমি সব বলছি, ঘটনাচক্রে একটা

কাজ ক'রে ফেলেছি, আপনাকে সবই বল্‌ছি স্যার,—আপনি যখন মনিব, অন্নদাতা, সব কথা আপনাকেই আগে খুলে বলা উচিত ছিল, কিন্তু কলকেতার আফিসে নতুন এসেছেন তাই,—তা ছাড়া লজ্জায়,—যাই হোক এখন আপনিই আমার অভিভাবক স্যার—

ইতিমধ্যেই যাদুধনের ব্যবস্থায় চেয়ার আসিয়া পড়িল, আগন্তুক চেয়ারের পীঠটা দেওয়ালের দিকে ঘুরাইয়া ফরাসের দিকে মুখ করিয়া বসিলেন। আগন্তুক যে বড়বাবুর মনিব, তাঁহার কথায় সভাস্থ সকলেই তাহা বুঝিয়াছিলেন। সকলের দৃষ্টি এখন তাঁহারই দিকে।

আগন্তুক গম্ভীর মুখে কহিলেন,—বুঝতে পেরেছি, আপনার ছেলের অসুখের কথা মিথ্যা; আপনি এই বয়সে আবার বিয়ে করবার উদ্দেশ্যে মেয়ে দেখতে এসেছেন।

আমি তো এইমাত্র বললুম স্যার, এখন আপনিই আমার অভিভাবক! আপনি যখন দয়া ক'রে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, আপনিই আশীর্ব্বাদ করুন।

আপনি এই মেয়েটির সত্যকার পরিচয় পেয়েছেন?

পেয়েছি স্যার! এই ইনি—এই বাড়ীর মালিক—রতন রায় মহাশয় ওর মামা হন।

বাবার পরিচয় পেয়েছেন কিছু? তাকে জানেন?

না স্যার! শুনিছি তিনি বেঁচে নেই।

সেই সৌম্য সুদর্শন গম্ভীরমূর্ত্তি মানুষটির মুখ দিয়া এ কথায় এমন একটা অট্টহাসি নির্গত হইল, যাহা কক্ষস্থ সকলকেই ত্রস্ত করিয়া তুলিল। হাসির বেগ থামিতেই আগন্তুক কহিলেন,—কিন্তু আজ তিনি বেঁচে এসেছেন তাঁর মেয়েকে বাঁচাতে।

রতন রায় এতক্ষণ নির্নিমেষ নয়নে এই সাহেববেশী মানুষটিকে নিরীক্ষণ

করিতেছিলেন। এ স্বর যে তাঁহার পরিচিত, বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইলেও এ মূর্ত্তি যে তাঁহার দৃষ্টিতে—

সহসা উন্মত্তের মত বিকৃত ভঙ্গীতে রতন রায় কহিয়া উঠিলেন,—আমি চিনিছি, আমি চিনিছি,—তুমি, তুমি,—ওঃ! ও রে অশ্রু! ছুটে আয়, জড়িয়ে ধর, ছাড়িস নি আর—তোর বাবা ফিরে এসেছে!

সমাগত বিস্ময়মুগ্ধ বয়োবৃদ্ধগণের মুখেও তখন বিস্ময়ের স্বর ফুটিয়া উঠিল,—যাদব ঘোষাল, যাদব ঘোষাল!

অশ্রু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই টলিয়া পড়িল,—কিন্তু যাদব ঘোষালের দুই চক্ষু তাহার দিকেই তখন পড়িয়াছিল, ছুটিয়া গিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ভাব তাহার কাটিয়া গেল। দুই চক্ষু মেলিয়া সে দেখিল, তাহাকে চেয়ারখানির উপর বসাইয়া দিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অপরিচিত পিতা পাখার বাতাস করিতেছেন। কি সৌম্যমূর্ত্তি! মুখে কি দৃপ্ত প্রতিভার আভা! দুই চক্ষু দিয়া স্নেহের কি স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছে!

অস্ফুটস্বরে সে শুধু কহিল,—বাবা? আমার বাবা!

কন্যার মাথায় স্নেহভরে হাতখানি বুলাইতে বুলাইতে স্নেহময় বাবা গাঢ়স্বরে কহিলেন,—বাবা হলেও তোমার কাছে আমার কাজের কৈফিয়ৎ দিতে হবে, মা। নতুবা আমার ত নিষ্কৃতি নাই! আমি ভেবেছিলুম, স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে আমার বংশের চিহ্ন মুছে গেছে। যে অন্যায় আমি করেছিলুম, আমার মুখের কথায় যাদের ক্ষতি হয়েছিল, আমি তাদের কাছেই ছুটে যাই—নিজের জীবনব্যাপী পরিশ্রমের বিনিময়ে তাদের ক্ষতি-পূরণ করতে। প্রস্তাবটা শুনে তারা আমাকে লুফে নিলে, নানা কাজে লাগিয়ে কাজ শেখালে, এজেণ্ট ক'রে বিলেতে পাঠালে, তার পর ক'রে

নিলে অত বড় কোম্পানীর পার্টনার। এখনো এক হপ্তা হয়নি—আমি সিঙ্গাপুর থেকে কলকাতার আফিস তদারক করতে এসেছি। এসেই একখানা চিঠি পাই, আফিস মাষ্টারের .নামেই চিঠিখানা যায়। বেনামা চিঠি নয়, লেখকের নাম—যাদুধন ভট্টাচার্য্য বি, এ। সব কথা সেই পত্রে সে লিখে জানায়, তোমাকে রক্ষা করতে অনুরোধ করে। চিঠিতে তোমার মামার নাম ছিল, সুতরাং তখনই বুঝতে পারলুম—সে মেয়ে কে, কার মেয়ে। পাকাদেখার দিনটির কথাও সে লিখতে ভোলেনি, তাই ঠিক সময়েই আমার মাকে রক্ষা করতে পেরেছি।

স্তব্ধভাবে সকলেই এই অদ্ভুত মানুষটির কথা ভাবিতেছিল। অশ্রুর বুকের ভিতর তখন ন্যায় ও অন্যায়ের তরঙ্গ বহিয়াছিল, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের সমস্যা তাহার ভিতর দিয়া বুদ্‌বুদের মত পর পর ফুটিয়া উঠিতেছিল। সবলে মনের ভাব দমন করিয়া সে ডাকিল,—বাবা!

স্নেহার্দ্র কণ্ঠে উত্তর আসিল,—বল মা, কি বল্‌তে চাও।

অশ্রুর এই আহ্বানেই তাহার মনের প্রশ্ন যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল।

অশ্রু আবেগভরে কহিল,—কিন্তু মামার মনে আমি তো আঘাত দিতে পারবো না, বাবা! আমি আপনারই মেয়ে, উপকার তো আমি ভুলতে পারি না, আপনাকে পেয়েও নয়, আপনার ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনেও নয়।

তা হ'লে কি তুমি বল্‌তে চাও, মা? কি অভিপ্রায়, তোমার? তুমি যে আমার বড় ব্যথার অশ্রু!

অবিচলিত কণ্ঠে অশ্রু কহিল,—মামার যে অভিপ্রায় তাই আমার।

কিন্তু নরহরি গঙ্গোপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ উচ্ছ্বাসের সুরে কহিলেন,—কিন্তু এখন থেকে তুমি আমারও মা। তোমার মামার যে অভিপ্রায়ই থাকুক,

আমি আমার মত পরিবর্ত্তন করেছি। এমন কি, ঐ পাঁচশো টাকার মায়াও ছেড়ে দিচ্ছি।

রতন রায় এই সময় থালা হইতে নোটের তাড়াটি আস্তে আস্তে তুলিয়া নরহরি গঙ্গোপাধ্যায়ের পকেটের ভিতর পুরিয়া দিয়া কহিলেন,—মনে রেখো গাঙ্গুলী, আমিও অশ্রুর মামা। মানুষ ঠেকে শেখে, দেখে শেখে; আমার দুই শিক্ষাই হয়েছে, এতেও কি লোভ কাটাতে পারবো না, মানুষ হ'তে পারবো না—এমন মানুষের মতন মানুষের পরশ পেয়ে! মনের সমস্তই আজ দু' হাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মুখ উঁচু ক'রে বলছি,—আর আমি অন্যায়ের নই, ন্যায়ের; আরো বলছি,—যেমন মেয়ে অশ্রু, তেমনি ছেলে ঐ যাদুধন; ওদের দুজনের মন-প্রাণ এক তারে বাঁধা পড়েছে জেনেও আমি এত বড় অন্যায়ের দিকে ঝুঁকেছিলুম! অশ্রু মুখ বড় ক'রে বলেছে—মামার যা অভিপ্রায়, সেই অভিপ্রায় তার; আমিও তেমনি জোরগলায় জানাচ্ছি,—এখনি ঐ যাদুধনকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর ঘোষাল, এই আমার অভিপ্রায়।

অদৃষ্টের ইতিহাস

চতুর্থ অধ্যায়

অভিমান

১

ছেলেটিকে দেখিয়া আসিয়া আর সকলে ভালো বলিলেও, হাসির দাদা হর্ষকুমার মুখখানা মচকাইয়া কহিল,—আমার কিন্তু ভাল লাগল না।

ছেলের এই আপত্তি যেন শেলের মত বৃদ্ধ রঘুনাথের বক্ষে বিঁধিল। বিঁধিবারই কথা; কন্যা হাসিকে লইয়া আজ তাঁহার চিন্তার অবধি নাই; তাঁহার বংশে এ পর্য্যন্ত কোনও কন্যা বয়সের দিক্ দিয়া তেরো বৎসর অতিক্রম করিয়া ছাদনাতলায় দাঁড়ায় নাই, কিন্তু হাসি চৌদ্দ বৎসরে পড়িয়াছে, তথাপি বহু চেষ্টা করিয়াও উপযুক্ত ঘরবর পাওয়া যায় নাই। দুশ্চিন্তার প্রাবল্যে অন্ন-জল রঘুনাথের মুখে রুচিত না, বিরামদায়িনী নিদ্রাও তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারিত না। এমন অবস্থায় সহসা দেবতার আশীর্ব্বাদের মতই যেন এই ছেলেটির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে,—ছেলেটির বয়স অল্পই, পঁচিশ পূর্ণ হয় নাই; পরীক্ষায় কোন পাশ-টাস না করিলেও সুপারিসের জোরে শহরের কোনও নামী সওদাগরী আফিসে এই বয়সেই চাকরীতে পাকা হইয়া বসিয়াছে, ভবিষ্যতে উন্নতির আশাও আছে। স্ব-ঘর, ছেলের বাবা অতিশয় সজ্জন, দেখিলেই ভক্তি হয়। সুতরাং এমন ঘর কি ফেল্‌না? মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা এ ঘরের উপায়ক্ষম ছেলেকে কি অবহেলা করিতে পারেন? অবশ্য, একটি বিষয়ে ছেলেটির এই মাত্র খুঁত, সে খুব সুশ্রী নহে এবং তাহার গায়ের রংটি অতিশয় কালো। কিন্তু ইহাই বা এমন কি দোষের? সে যখন ছেলে এবং তাহারই গৃহদ্বারে কুলে শীলে আভিজাত্যে ও মর্য্যাদায় সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ হইয়াও রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়কে গললগ্নকৃতবাসে দাঁড়াইতে হইয়াছে। তবে?

হর্ষকুমার এ যুগের আদর্শ সন্তান। বৃদ্ধ রঘুনাথ নানা চিন্তার আবর্ত্তে পড়িয়াও মনে মনে ভগবান্‌কে এই বলিয়া ধন্যবাদ দেন—এক দিক্ দিয়ে তুমি আমাকে খুবই ভাগ্যবান্ করেছ ঠাকুর, যেহেতু—হর্ষর মত ছেলে আমাকে দিয়েছ!

সাতাশ বছরের ছেলে হর্ষকুমার বৃহৎ সংসারটি যেন মাথায় করিয়া রাখিয়াছে! ভালো আফিসেই সে এক দায়িত্বপূর্ণ কাজে ব্রতী; দায়িত্বের তুলনায় বেতন অল্প হইলেও, যে টাকাগুলি পায়, সমস্তই মায়ের হাতে আনিয়া দেয়। মা হাত তুলিয়া যাহা দেন, তাহাই সে মাথা পাতিয়া লয় ও তাহাতে সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াও কিছু কিছু সঞ্চয় করে। এমনই সে মিতব্যয়ী, এমনই তাহার বিচারবুদ্ধি। সংসারে হর্ষকুমারের মাতা প্রসন্নময়ীই সর্ব্বময়ী, তাঁহার মত সুগৃহিণী অল্পই দেখা যায়। অথচ এই বর্ষীয়সী মহিলার তেজস্বিতা ও মর্য্যাদারক্ষার দৃঢ়তা অতুলনীয়। সুবৃহৎ চট্টোপাধ্যায়-গোষ্ঠির আবাল-বৃদ্ধবনিতা এই স্পষ্টবাদিনী তেজস্বিনী গৃহিণীটিকে যেমন ভয় করে, তাঁহার পক্ষপাতশূন্য নির্ভীক আচরণগুলির উদ্দেশে তেমনই শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

এ হেন বিচক্ষণা গৃহিণীও ছেলের কথায় সায় দিয়া কহিলেন,—ও রকম কালো ছেলের হাতে হাসিকে আমি কিছুতেই তুলে দিতে পারব না।

রঘুনাথ রুক্ষকণ্ঠে কহিলেন,—একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর! যেই হর্ষ ছেলের সম্বন্ধে নাক সিঁটকুলো, তুমিও অমনি শানায়ের পোঁ ধরলে! হ'লোই বা কালো, কি তাতে হ'ল শুনি?

হর্ষ কথাটার উত্তর দিল খুব মৃদুস্বরে। রঘুনাথের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে সে কহিল,—আপনি ত দুনিয়ার কাউকে মন্দ দেখেন না, বাবা, কাজেই ছেলে আপনার চোখে কেন মন্দ ঠেকবে বলুন।

রঘুনাথ কণ্ঠের স্বর এবার একটু তীক্ষ্ণ করিয়াই কহিলেন, বেশ ত, তোমার চোখে ছেলের মন্দটা কি ঠেকলো, তাই বল না, শুনি। তার মন্দটা এই যে, তার গায়ের রং কটা নয়, কালো,—কেমন, এই কথাই ত বলবে?

হর্ষকুমার মুখখানি গম্ভীর করিয়া কহিল,—না, বাবা, ঠিক তা নয়; মানুষের গায়ের রং নিয়ে নিন্দে করবার অধিকার কোনো মানুষেরই নেই। আমি কিন্তু ঐ ছেলেটির গায়ের রংটিই শুধু দেখিনি, ওর মনের রংটুকুও দেখেছি; সেইজন্য জোর গলায় বলতে পারছি আপনার সামনে,—ছেলেটি নামেও যেমন কালো, এর ভেতর বাইরেও তেমনই কালো। হাসির সাদা মন, ওঁর হাতে পড়লে কখনই সুখী হবে না।

হর্ষের এক বিবাহিতা ভগিনী কিছুকাল কাশীতে ছিলেন এবং সেখানকার বহু অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। ভ্রাতার কথাগুলি তাঁহাকে উৎসাহিত করিল, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে একটা নজীর তুলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—হর্ষ ঠিকই বলেছে। কাশীর নামজাদা পণ্ডিত রামধন ভট্টাচার্য্যিমশাই বলতেন—রামচন্দ্রও ছিলেন কালো, শ্রীকৃষ্ণও ছিলেন কালো, কিন্তু তাঁরা জগৎ আলো করেছিলেন। আবার এমন কালো লোক আমাদের নজরে পড়ে তাদের দেহটা—কালো, মনটা কালো, স্বভাব পর্য্যন্ত কালো,—এরা সর্ব্বনেশে লোক। হাসির যে বর হবে শুনছি, তার আবার নামটিও কালো! কাজ নেই বাবা, এতগুলো কালোর ভেতর আমাদের গিয়ে!

রঘুনাথ এবার রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনোনীত ছেলেটির বিরুদ্ধে এভাবে বাড়ীশুদ্ধ সকলকেই একযোগে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে দেখিয়া তিনি মুখখানি কঠিন করিয়া কহিলেন,—তোমরা সবাই মিলে যখন দল বেঁধেছ,

ও ছেলে ত বাতিল হবেই। ছেলে আমার আফিস থেকে জ্যোতিষ শিখেছেন, মানুষের মন দেখেন, সেটা শাদা কি কালো! মেয়ে কাশীতে ছিলেন, পণ্ডিত হ'য়ে ফিরেছেন, জানিয়ে দিলেন—কালো হ'লেই মুস্কিল। আর, যিনি এ সংসারের গিন্নী, তিনি ঠিক দিয়ে রেখেছেন, বর হ'লেই রাঙা টুক্‌টুকে হ'তে হবে। কাজেই আমি নাচার, হাসির বিয়ের ব্যাপারে আমি আর নেই, যা তোমাদের খুসী কর; পরমসুন্দর রাজপুত্তুর ধ'রে এনে মেয়ের বিয়ে দাও।

প্রসন্নময়ী সুগৃহিণী হইলেও একটি বিষয়ে তাঁহার দুর্ব্বলতা দেখা যাইত। বর বা বধূর গায়ের রং কালো হইলেই তিনি ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিতেন, আর্ত্তস্বরে জানাইয়া দিতেন, মাগো! আমার চোখ দুটো যেন কর্‌ কর্‌ করছে! বে'র আগে এরা কি দেখাশোনা করে নি গা?

একবার নিজেরই এক দৌহিত্রীর বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়া যখন দেখিলেন, তাঁহার জামাতা অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যার জন্য যে পাত্র নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, গুণ তাহার প্রচুর থাকিলেও রূপ বলিতে কিছুই নাই। তিনি তখনই সর্ব্বসমক্ষে সাশ্রুলোচনে কহিলেন,—আমার সোনার প্রতিমা নাতনীকে একটা ধাঙ্গড়ের পাশে দাঁড় করাবে জানলে আমি কখনই এখানে আসতুম না,—আমার মন ত তোমরা জান, জেনে কেন আন্‌লে?

হর্ষকুমার মিষ্টস্বরে পিতাকে বুঝাইতে চাহিল,—আপনি কেন রাগ করছেন, বাবা, কথায় বলে—লাখো কথা না হ'লে বিয়ে হয় না। বেশ ত, কথা ত এখনো পাকা হয় নি, আমরা আরও দেখি না, যদি আরো ভাল ছেলে পাই।

রঘুনাথ কহিলেন,—তোমাদের এ সব আজে-বাজে কথা আমার

ভালো লাগে না বাপু,—এর চেয়ে ভালো ছেলে এই দরে কোথায় পাবে শুনি? বেশ ত দেখ না—

প্রসন্নময়ী কহিলেন,—ছেলের দর কমই বা কি দেওয়া হচ্ছে? সর্ব্ব-রকমে দু হাজার নেবে; তাই কি কম?

রঘুনাথ উষ্ণভাবে কহিলেন,—অন্যের কাছে এ ছেলের দর তিন হাজার, তা জান? আমার কথায় ভিজে ছেলের বাবা ওতেই রাজী হয়েছে; আর কি তাঁর ব্যবহার! যেন মাটির মানুষ, কে বলবে তাঁকে দেখে যে তিনি ছেলের বাবা!

গৃহিণী কহিলেন,—ঐখানেই সে বুড়ো বোড়ের চাল টিপেছে,- ওটা হচ্ছে মিছরির ছুরি! এর পর দেখে নিয়ো, ঐ দিয়ে হাড়ের মাংস পুঁচিয়ে কাটবে।

রঘুনাথ মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিলেন,—মহাভারত, মহাভারত! ও লোক এ যুগের নয়, সেকালের মুনি-ঋষির মত মন। এমন লোকের সম্বন্ধেও তোমরা সন্দেহ আনছ, তার ছেলেকে মন্দ ভাবছ! ছ্যা-ছ্যা!

হর্ষকুমার বুঝিল, পিতা মনে রীতিমত আঘাত পাইয়াছেন; ইহাও সে বুঝিল যে,এই ছেলেটিই তাঁহার মনোনীত। সুতরাং পিতার মন রাখিতে সে তৎক্ষণাৎ নিজের দৃঢ় অনুমানকে সবলে মন হইতে অপসৃত করিয়া দিল।

হর্ষকুমারের অনেকগুলি ভগিনী, অন্যান্য সকলের বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং প্রত্যেক ভগিনীর পতি-নির্ব্বাচন তাহার পিতাই এ পর্য্যন্ত করিয়াছেন। কনিষ্ঠা ভগিনী হাসিকে হর্ষকুমার প্রাণের সহিত ভালবাসিত, তাহার একান্ত ইচ্ছা, শেষের বোনটি অপেক্ষাকৃত ভালভাবেই পাত্রস্থা হয়। সেই জন্য পিতার মনোনয়ন সত্ত্বেও সে স্বয়ং সেদিন আফিসের পালটা ছেলেটিকে দেখিতে গিয়াছিল। কিন্তু ছেলে দেখিয়া তাহার মনের এমন

কি কালিমা হর্ষকুমারের চক্ষুতে ধরা পড়িয়াছিল, তাহা কেহই জানিবার অবকাশ পাইল না; সে নিজেও মনের মধ্যে এই ধারণা দৃঢ় করিয়া লইল,—অনুমান সব সময় সত্য না হইতেও পারে। এতগুলি ভগিনীর বিবাহ দিয়া বাবা যখন ঠকেন নাই, এই ছেলেটিকেও তিনি যখন পছন্দ করিয়াছেন, তবে তাহার এ আপত্তি কেন?

মায়ের হাতে পায়ে ধরিয়া হর্ষকুমার তাঁহারও সম্মতি আদায় করিয়া লইল, পিতাকে জানাইল,—আপনার যখন মত, আমাদের অমত থাকতে পারে না, বাবা। আপনি পাকা দেখার ব্যবস্থা করুন।

বৃদ্ধ সহর্ষে হর্ষের মাথার উপর হাতখানি রাখিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—দীর্ঘজীবী হও, বাবা। এই ত আমার ছেলের কথা!

২

কিন্তু বিবাহের পর পাকস্পর্শের দিন কন্যা-জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া বৃদ্ধ রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বুঝিতে পারিলেন, বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার ছেলে ভাবী জামাতার সম্বন্ধে যে অপ্রিয় কথা কহিয়াছিল, তাহা মিথ্যা নহে; নবজামাতার মনটি তাহার গায়ের রঙের মত কালোই বটে! একটা তুচ্ছ কথা হইতেই নবজামাতা কালোধনের মনের সত্যকার পরিচয় পাওয়া গেল।

বৈবাহিকভবনে আহারের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন সবিনয়ে জানাইলেন, তিনি কন্যাদান করিয়াছেন, দৌহিত্রের আবির্ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত এ বাড়ীতে পানভোজন করিতে পারেন না; তখন তাঁহার এই উক্তির উত্তরে ভিতর হইতে বামাকণ্ঠে শ্লেষের সুরে ঝঙ্কার উঠিল,—

জামাইবাড়ীতে খাবার বেলায় ত বিধিনিষেধ বেশ মানা চলে দেখছি, কিন্তু গায়ে-হলুদে দেওয়া জিনিস ফুলশয্যেয় চালিয়ে দিতে ত তালুই মশায়ের মনে একটুও বাধে নি!

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্তব্ধ বিস্ময়ে বৈবাহিক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখের দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—এ কথার মানে?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন,—ও সব বাজে কথা বেয়াই, ছেড়ে দিন না;—জানেন ত, মেয়েদের মুখ সদাই আল্‌গা, কথা ওরা চাপতে জানে না! হয়েছে কি,—যে বাটিতে ক'রে ওঁরা ছেলের গায়ের হলুদ পাঠিয়েছিলেন, সেই বাটিটাতেই আপনারা ফুলশয্যের চন্দন পাঠিয়েছেন,—এই আর কি! তা হ'লই বা, এতে কি এমন অপরাধ হয়েছে যে, না শোনালেই নয়?

অদূরেই হর্ষকুমার আহারে বসিয়াছিল, কথাগুলি সবই তাহার কানে কাঁটার মত বিঁধিতেছিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ছেঁদো কথা শুনিয়া তাহার চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে দৃঢ়স্বরে কহিল,—আপনারা যে আমাদের আকাশ থেকে ফেললেন দেখছি! আপনাদের দেওয়া বাটিতে আমরা চন্দন পাঠিয়েছি, এ কথা কি ক'রে আপনারা সৃষ্টি করলেন, তা ত বুঝতে পারছি না!

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও পুত্রের কথার পীঠে গাঢ়স্বরে কহিলেন,—বিয়ের সমস্ত বাজার খুঁটিনাটি ক'রে হর্ষ নিজের হাতে কিনেছে, ফুলশয্যের বাটি যে আমি নিজের চোখে দেখেছি বেয়াই!

শেষের কয়টি কথার সঙ্গে সঙ্গেই রঙ্গালয়ে অভিনীত বিবাহ-বিভ্রাটের ঝিএর মত বিচিত্র ভঙ্গীতে এক তরুণী অকুস্থলে দর্শন দিল। পরণে তাহার একখানা ধোপদুরস্ত কালো চুল-পাড় কাপড়, গায়ে শাদা সেমিজ, হাতে

একটা রূপার বাটি। মেয়েটির ছিপ-ছিপে গড়ন, রং কালো, চীনা প্যাটার্ণের মুখ এবং মুখরা ও কলহপরায়ণা মেয়েদের অতি পরিচিত ভঙ্গী যেন তাহাতে সুস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। হাতের বাটিটা কক্ষতলে সজোরে ঠুকিয়া মেয়েটি কর্কশকণ্ঠে কহিল,—মিছে কথার সৃষ্টি আমরা করেছি কি সত্যি কথাই বলেছি, চোখের মাথা যদি খেয়ে না থাকেন ত চেয়ে দেখুন, আর ডাকি পাড়ার দশ জনকে, তারাও দেখুক!

পিতা পুত্র উভয়েই অবাক্! নবাগতা তরুণীটি যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা ও এই বয়সেই সে আয়তির গৌরব হারাইয়াছে, ইহা উপলব্ধি করিতে তাঁহাদের বিলম্ব হয় নাই; কিন্তু ভট্টাচার্য্য পরিবারের বিধবার এই প্রকার বেশভূষা ও তাহার মুখে নূতন কুটুম্বের উদ্দেশে এরূপ রূঢ় ভাষা তাঁহারা দেখিবার বা শুনিবার প্রত্যাশা করেন নাই। সুতরাং মূঢ়ের মত পিতা-পুত্র যুগপৎ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই সময় অনুযোগের সুরে কন্যাকে কহিলেন,—পাগল হলি কি মনো,—তুচ্ছ কথা নিয়ে এ সব কি কাণ্ড, ঝগড়া-ঝাটি, ভজা-ভজি ব্যাপার,—ছি!

মনো অর্থাৎ মনোরমা পিতার মুখের উপর ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—দোষ বুঝি তুমি আমারই দেখলে, বাবা! মুখ-ঝাপটা দিয়ে অত বড় আস্পর্দ্ধার কথা বললে, সে সব বুঝি কানে ঢুকলো না? কি বলেছিলুম আমি, কি কথা থেকে, কি কথা তুললে হুমকী দিয়ে বৌয়ের ভাই!

বৌয়ের ভাইটি স্তব্ধভাব এবার জোর করিয়া কাটাইয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল,—দেখুন, আপনি যে কথা অনর্থক মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছেন, কোনো মেয়ে কোনো নতুন কুটুম্বর সম্বন্ধে সে কথা বলতে পারে না। তবু যদি কথাটা—

মুখের ভঙ্গী অতিশয় ভীষণ করিয়া মনোরমা হর্ষকুমারের কথায় বাধা দিয়া কহিল—কি এমন অন্যায় কথা আমি বলেছি তোমাকে শুনি? আমি না হয় হাসতে হাসতে বলেছি—যেটা দুদিন আগে আমরা দিয়িছি, সেইটিই না দিয়ে নতুন একটা কিছু দিলেই হ'ত! এই ত বাপু কথা, তোমরা বাপ-বেটায় অমনি চোখ মুখ পাকিয়ে থপ্ ক'রে ব'লে উঠলে কি না, আমি মিথ্যেবাদী, মিছে কথা বলেছি; এত বড় তোমাদের বুকের পাটা—

হর্ষকুমার কহিল,—আমরা অন্যায় কিছুই বলিনি, আপনি যে তুচ্ছ বস্তু নিয়ে আমাদের খোঁটা দিলেন, আমরা তার প্রতিবাদ করেছি মাত্র। আমি এখনও বলছি—ও বাটি আপনাদের দেওয়া নয়, আমরাই কিনেছি।

মনোরমা এ কথার উত্তরে অধিকতর তীব্রস্বরে কি বলিতে মুখখানা বিকৃত করিয়াছিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও কন্যাকে নিরস্ত করিতে বিরক্তভাবে কি বলিতে উদ্যত, ঠিক সেই সময় উভয়কেই চমৎকৃত করিয়া অত্যন্ত উদ্ধতভাবে কালোধন সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং কাহাকেও কোনও কথা কহিবার অবসর না দিয়া নিজেই শ্রদ্ধাভাজন জ্যেষ্ঠ শ্যালককে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল,—আমার বোনকে মিথ্যাবাদী বলতে বাকিই বা কি রাখলেন আপনি?

হর্ষকুমারের খাওয়া তখনও শেষ হয় নাই; এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ উঠিতেই সে হাত গুটাইয়া আলোচনায় যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছিল, হাত আর তাহার মুখে উঠে নাই, এবং হঠাৎ আসিয়া কালোধন যে কাণ্ড বাধাইয়া বসিল, তাহাতে হর্ষকুমারের খাওয়ার পর্ব্বটা এইখানেই শেষ হইয়া গেল। যেখানে বাড়ীর কর্ত্তা কথা কহিতেছেন, কর্ত্তার কন্যাও কোমর বাঁধিয়া রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে আসরে দেখা দিয়াছেন, নব-বিবাহিত পুত্রও যে

মারমুখী হইয়া সেখানে ছুটিয়া আসিতে পারে, এ ধারণা হর্ষকুমারের ছিল না। এমন অস্বাভাবিক ঘটনা সে পূর্ব্বে কখনও ঘটিতে দেখে নাই। এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটি উঠিবামাত্র সে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল, তাহার পর সরম-সঙ্কোচের আবরণ উদ্ঘাটিত করিয়া নূতন কুটুম্ববাড়ীর এই বিধবা কন্যাটির উপস্থিতি ও তাহার মুখের অতি সাংঘাতিক কথাগুলি যুগপৎ তাহাকে স্তব্ধ ও ক্ষুব্ধ করিয়া দিয়াছিল, এখন নূতন ভগিনীপতি আসিয়া যে ভাবে তাহার নিকট কৈফিয়ৎ চাহিল, তাহাতে হর্ষকুমারের চিত্তে সকল বিস্ময় ও বিক্ষোভের উপর শুধু এই প্রশ্নটি সহসা জাগিয়া উঠিল,—এর শেষ কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সুদূর ভবিষ্যতের সমস্যা যেন চাবুক তুলিয়া তাহার কণ্ঠ রোধ করিয়া দিল। পিতার নিষ্প্রভ মুখখানা ও দুইটি ছল ছল চক্ষুর মর্ম্মস্পর্শী করুণ দৃষ্টি যেন এই বলিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিতেছিল,—মেয়ে যখন দিয়েছি, তখন মুখ বুজিয়ে সবই আমাদের সইতে হবে; মুখ তুলে কিছু বলাটাই যে আমাদের মস্ত অন্যায়, এ কথা ভুলে যাচ্ছ কেন?

জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া হর্ষকুমার গণ্ডূষ করিতেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার মত হইয়া কহিলেন,—হাঁ হাঁ—ও কি হ'ল! এরই মধ্যে গণ্ডূষ করলে যে বড়? এখনো মাছের তরকারী পাতে পড়েনি,—চাটনি, পাঁপর ভাজা, দই, মিষ্টি—

হর্ষকুমার মুখে হাসির একটা ক্ষীণ রেখা টানিয়া কহিল,—আর কিছু দরকার নেই, তাল্‌ুই মশাই,—যা খেয়েছি, তাতেই পেট ভরে গেছে।

কন্যা মনোরমা শ্লেষের সুরে কহিল,—একেই বলে, বুকে ব'সে দাড়ী ছেঁড়া! যে ঘরে মেয়ে দিয়েছেন, সেই ঘরের গুষ্টী শুদ্ধুকে অপমান। বাপ বললেন, খেতে নেই; ছেলে যদি বা বসলেন খেতে, আধা খাওয়া হ'তেই

উঠে পড়লেন! দেখে দেখে খাসা ঘরের মেয়ে তুমি এনেছ, বাবা! ছি! ছি!

হর্ষকুমার নিরুত্তরে পিতার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু তাহাতে উত্তেজনার কোনও চিহ্নই দেখিল না। মুখখানা নত করিয়া কি যে ভাবিতেছিলেন, তিনিই জানেন।

এ পক্ষকে নীরব দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবার গলাটা ঝাড়িয়া অনুযোগের সুরে কহিলেন,—তোরা সত্যিই ভারি বাড়াবাড়ি ক'রে তুললি, মনো! শুভদিনে শুভকর্ম্মে এমন ক'রে কুটুম্বর সঙ্গে অসরল করতে নেই, তাতে নিন্দে হয়। বেয়াই, মেয়ের কথায় রাগ ক'র না, ভাই! ও ছেলেমানুষ, অবুঝ, ওর কথা ধরতে নেই। তোমাকেও বলছি বাবাজী, হাত-গুটোলে হবে না, খেতে হবে; আমি যখন বলছি, দোষ হবে না।

হর্ষকুমার কহিল,—আমার বোনকে যখন আপনার বাড়ীতে দিয়েছি, খেতে ত হবেই; কিন্তু আজ আর খাবার অনুরোধ করবেন না, তালুই মশাই! আমি মাপ চাইছি।

কালোধন পরক্ষণেই তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, এ কিন্তু আপনার অন্যায় রাগ।

হর্ষকুমারের ধৈর্য্যের বাঁধন এবার ছিঁড়িয়া গেল। তাহার আরক্ত দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি কালোধনের মুখের উপর সার্চ্চলাইটের মত ফেলিয়া সে যথাসম্ভব সংযতস্বরে কহিল,—একটা কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, কালোধন। তোমার বাবা আর বোন যেখানে কথা কইছিলেন, তুমি ওপরপড়া হয়ে ছুটে এলে কেন? তোমার লজ্জা হ'ল না?

কণ্ঠের স্বর অতিশয় রুক্ষ করিয়া কালোধন উত্তর দিল,—কিসের লজ্জা হবে, মশাই!—আপনি আমার বাড়ীতে এসে আমার বোনকে যা তা ব'লে অপমান করবেন, আর আমি চুপ ক'রে থাকব?

হর্ষকুমার মৃদু হাসিয়া কহিল,—শিক্ষার সঙ্গে যদি তোমার ভালরূপ সম্বন্ধ থাকত, তা হ'লে তোমাকে বোঝাবার আবশ্যক হ'ত না যে, তোমার আচরণে তোমার বাবাই অপমানিত হয়েছেন।

কথাটার অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কালোধন গুম্ হইয়া রহিল, কিন্তু তাহার মুখরক্ষা করিল মনোরমা; সে তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুরে কহিল,—ভাই বোনের যতদূর খোয়ার করবার তা ত করলে, এবার বাবাই বা বাকি থাকেন কেন, তাঁর মুখে ত চুণকালি দেওয়া চাই;—ধন্যি ঘরের ছেলে তুমি যা হোক, তোমার খুরে খুরে নমস্কার!

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সময় পুত্রের দিকে চাহিয়া আদেশের ভঙ্গীতে কহিলেন,—হর্ষ, আমি বলছি বাবা, তুমি থামো, ওঁর কথার কোনো উত্তর তুমি দেবে না।

আসন হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া হর্ষকুমার কহিল,—আমি বাইরে গিয়ে বসছি, বাবা!

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুত্রের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মনোরমার দিকে চাহিয়া করজোড়ে কহিলেন,—আমার ছেলের হ'য়ে আমি মাপ চাইছি মা, তুমি ওকে ক্ষমা কর। ও এখনো ছেলে মানুষ, গণ্ডারের চামড়ায় সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে মেয়ের বাপকে যে মেয়ের শ্বশুরবাড়ীতে আসতে হয়, সে তত্ত্ব ও জানে না, তাই মা, তোমাদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেছে। আমি মেনে নিচ্ছি মা, আমাদেরই ভুল হয়েছে, আমরাই অন্যায় করেছি; তোমাদের কোনো দোষই নেই।

৩

বাড়ীতে ফিরিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সকলকে ডাকিয়া কহিলেন,—দেখ, পাঁচের কোঠা পার হ'তে না হ'তেই সরকার যে চাকুরে বাবুদের আর কাজ করতে দেন না, পেনসান নিতে পীড়াপীড়ি করেন, সেটা ঠিকই করেন।

প্রসন্নময়ী পতি-পুত্রের মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন, মেয়ের শ্বশুরবাড়ী হইতে ইঁহারা সদ্ব্যবহার পাইয়া ফিরেন নাই। তথাপি তাঁহার মুখের স্বাভাবিক হাসিটুকু বজায় রাখিয়াই প্রশ্ন করিলেন,—নিজের পছন্দকরা কুটুম্ববাড়ী থেকে এই প্রথম এসেই এ কথা বলবার মানে?

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন,—কথাটা আগে ত শেষ করতে দাও, তা হলেই মানেটাও বুঝতে পারবে। হাঁ, যে কথা বলছিলুম, বয়েস বেশী হ'লে আর কাজে রাখে না কেন তা জান? পাছে ভুলচুক হয়। কথায় কথায় গলদ ধরা পড়ে। আমাদের শাস্ত্রকাররাও ব'লে গেছেন, পঞ্চাশ পার হ'লে বনে যাবে, অর্থাৎ কি না—সংসারের ব্যাপারে আর মাথা দেবে না। কিন্তু আমরা কি তা শুনি? বাড়ীর যখন কর্ত্তা আমি, সব বিষয়েই আমার কথাই হবে সার কথা, তা সে ভুলই হোক, আর অন্যায়ই হোক! নিজের এই দোষ আজ ধরা পড়ে' গেছে, যার জন্য হাসি আমার সত্য সত্যই জলে পড়েছে!

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বৃদ্ধ ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বৃহৎ গোষ্ঠীর সকলেই সুবৃহৎ দরদালানে সমবেত হইয়াছিলেন, অসীম ধৈর্য্যশীল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এভাবে কাতর হইতে তাঁহারা আর কোনও দিন দেখেন নাই। কেহ সান্ত্বনা দিলেন, কেহ বা পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন,

কি সূত্রে তাঁহার মানসিক চাঞ্চল্য—তাহা জানিবার জন্যও সকলে অধীর হইয়া উঠিলেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কহিলেন,—হর্ষকে জিজ্ঞাসা কর, ও তোমাদের শুনিয়ে দেবে—নায়ের কড়ি কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে দিয়ে কি ভাবে শেষে ডুবে পার হবার ব্যবস্থা আমি করেছি! কথার সঙ্গে সঙ্গেই সজোরে তিনি কপালে করাঘাত করিলেন।

সকলের ব্যাকুল দৃষ্টি হর্ষকুমারের মুখের দিকে, কিন্তু তাহার প্রশান্ত মুখখানার উপর কে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুত্রকে নিরুত্তর দেখিয়া আর্ত্তস্বরে কহিলেন,—বল বাবা হর্ষ, বল; আমার হুকুমে মুখ ত সেখানে বন্ধ ক'রে রেখেছিলে,—এখন সব শুনিয়ে দাও; এরা সবাই শুনুক আর একবাক্যে বলুক, ওদের সম্বন্ধে আমিই ভুল বুঝেছিলুম, কিন্তু, তুমি যা বুঝেছিলে, তাই-ই ঠিক,—ও ছেলের নাম কালো, রং কালো, মনটা তার চেয়েও কালো।

হর্ষকুমারের মুখে হাসির শ্বশুরবাড়ীর সেদিনের অপ্রীতিকর কাহিনী শুনিয়া এ বাড়ীর প্রত্যেককেই স্তব্ধ হইতে হইল। কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কথা নাই।

প্রসন্নময়ী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—যখনই এ সম্বন্ধ পাকা হয়েছে, আমার মন বলেছিল—হাসি ওখানে কখনই সুখী হবে না। বিয়ের সময় সবাই ত ছেলেকে দেখেছে, গায়ের রংএর কথা বলছি না, কত ছেলেই ত কালো আছে,—কিন্তু এ ছেলের মুখে একটিবারের জন্য হাসিটুকু কেউ দেখেনি, মুখখানা যেন সর্ব্বক্ষণই গোমড়া ক'রে আছে।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন,—আসল কথাটাই এবার জিজ্ঞাসা করি, ওদের দেওয়া বাটিতেই কি তোমরা ফুলশয্যার চন্দন পাঠিয়েছিলে?

প্রসন্নময়ীর সুন্দর মুখখানা এ প্রশ্নের আঘাতে যেন রাঙা হইয়া উঠিল, কোনও উত্তর না দিয়া ক্ষিপ্রপদে তিনি নিজের সুসজ্জিত ঘরখানির মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অনতিবিলম্বেই ছোট একটি বাটি হাতে করিয়া পুনরায় দেখা দিলেন। সকলেই বুঝিলেন, এই ক্ষুদ্র বস্তুটিকে উপলক্ষ করিয়াই এত বড় মর্ম্মান্তিক ঘটনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

প্রসন্নময়ী কহিলেন,—ওদের গায়েহলুদে দেওয়া আর সব জিনিসই গুছিয়ে রাখা আছে, হাসি যে সময় ঘর-বসত করতে যাবে, সঙ্গে দেওয়া হবে। তবে যে কাঁচা জিনিসগুলো ওরা দিয়েছিল, যেমন দই ক্ষীর মিষ্টি মাছ, এ সব ত আর থাকবে না, তাই খেয়ে ফেলা হয়েছে। এতগুলো মেয়ে পার হয়েছে, সবার বেলায় যেমন হয়েছে, হাসির বেলাও তাই হবে; ওদের দেওয়া বাটি ক'রে চন্দন পাঠাব আমি! মহাভারত! মহাভারত!

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাশ্রুলোচনে কহিলেন,—ইচ্ছে করছে এই বাটিটা হাতে ক'রে এখুনি ছুটে যাই সেখানে, তাদের সবার সামনে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ব'লে আসি—দু'হাজার টাকার সঙ্গে আমার মেয়েকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছি!

৪

কলিকাতার উপকণ্ঠে সমাজ-শাসিত দুইখানি গণ্ডগ্রামেই এই দুইটি পরিবার বসবাস করেন। গ্রাম দুইখানির দূরত্ব মাইল দশেকের বেশী নহে। রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চাকদা গ্রামখানির বিশিষ্ট বনিয়াদী অধিবাসী এবং এই অঞ্চলের সর্ব্বত্রই তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি যথেষ্ট। নিষ্ঠাবান্ ও সত্যবাদী বলিয়া ইঁহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাও আছে। অবস্থাও

অস্বচ্ছল নহে। উপর্য্যুপরি অনেকগুলি কন্যার বিবাহে নিদারুণ পণপ্রথার দাবী রোক-শোধ করিয়াও সর্ব্বস্বান্ত হন নাই বা তাঁহার ভিটাবাটী ও জমিজমার উপর ঋণের বাঁধন পড়ে নাই।

মনোমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনুরূপ যে গ্রামখানিতে বাস করেন, তাহা বিরলা নামে পরিচিত। ইনি অবশ্য এই গ্রামের বনিয়াদী বাসিন্দা নহেন। ইঁহার পিতা পূর্ব্ববঙ্গের এক অখ্যাত পল্লীতে কৌলীন্যের মর্য্যাদাটুকু লইয়াই অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করিতেন। কয়েকখানি মেটেঘর, সামান্য কিছু জমি ও কয়েক ঘর যজমান ছিল তাঁহার অবলম্বন। পিতার মৃত্যুর পর মনোমোহন ভাগ্যপরীক্ষা করিতে পল্লীর বাস তুলিয়া ও বাস-ভূমির বিক্রয়লব্ধ হাজার দুই টাকা মূলধন লইয়া কলিকাতায় আসেন। ঐ সামান্য টাকা তাঁহার ভাগ্য ফিরাইতে পারে নাই, পুঁজিটুকু কয়েক বৎসরের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যায় এবং তাঁহার দুর্দ্দশার অন্ত থাকে না। দোকানদারী, দালালী, যাত্রার দলের অধিকারিত্ব অনেক কিছুই করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্য তাঁহার প্রসন্ন হয় নাই। অবশেষে পৈতৃক যাজনবৃত্তি তাঁহাকে অকূলে কূল দেয়। অপ্রত্যাশিত ভাবে এক স্বজাতীয় সদাশয় তাঁহার সহায় হইলেন। বিরলায় তখন দশকর্ম্মান্বিত পুরোহিতের বিশেষ অভাব, উক্ত সদাশয় বিরলার এক বিশিষ্ট অধিবাসী ও শহরের কোনও সওদাগরী আফিসের মুৎসুদ্দি। তাঁহার সৌজন্যে মনোমোহন প্রতিষ্ঠা পাইলেন। ইতঃপূর্ব্বে অন্যান্য কার্য্যে যখন লিপ্ত ছিলেন, তখন ইনি ভট্টাচার্য্য পদবী বর্জ্জন করিয়া মুখোপাধ্যায় হইয়াছিলেন। স্বার্থগত সুবিধার দিকে চাহিয়া এখন পুনরায় পরিত্যক্ত পদবীকে বরণ করিয়া লইলেন। দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভাগ্যোদয় হইল, অবস্থা ফিরিল, ঘরবাড়ী হইল, জ্যেষ্ঠ পুত্র কালোধন

ভালো চাকুরী পাইল, কনিষ্ঠ যাদুধন সুখ্যাতির সহিত এই সময় ম্যাট্রিক পাশ করায় এবং উচ্চ শিক্ষার দিকে তাহার বিশেষ অনুরাগ থাকায় তাহাকে কলেজে পড়িবার সুযোগ দেওয়া হইল এবং পিঠাপিঠি দুইটি অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহ প্রায় এক সঙ্গেই সম্পন্ন হইয়া গেল। সুতরাং এ গ্রামে 'উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলেও' ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে এখন আর অবহেলা করা চলে না, এখন তাঁহাকে সম্পন্ন গৃহস্থই বলিতে হইবে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় পৌরোহিত্য করেন, ধনবান্ যজমানদের তুষ্টিবিধানের পন্থা তিনি জানেন। মনের সহজাত সংস্কার সংস্পৃষ্ট ভাবধারা সবলে রুদ্ধ করিয়া যজমানদের ঈপ্সিত পথে মনোবৃত্তিকে চালিত করিতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। ইহাতে কোনও সূত্রেই কাহারও সহিত ঠোকাঠুকি যেমন বাধে না, সেইরূপ স্বার্থেও কোনও রূপ অন্তরায় দেখা দেয় না। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ছেলে-মেয়েরা সকল ক্ষেত্রে তাঁহার এই সুবিধাবাদ নীতি গ্রহণ করিতে এখনও অভ্যস্ত হয় নাই, সেইজন্য স্থানবিশেষে কলহ বাধে, তর্ক উঠে এবং অশান্তিও আত্মপ্রকাশ করে।

জ্যেষ্ঠা কন্যা মনোরমা অধিক বয়সে পাত্রস্থা হইলেও, যে ঘরে সে পড়িয়াছিল, তাহা অবস্থাপন্ন ঘরের কন্যাদেরও বাঞ্ছনীয়। শ্বশুর বিত্তবান্, স্বামী বিদ্বান্ ও উপায়ক্ষম ; শাশুড়ী, দেবর, ননদ প্রভৃতি পরিজনপূর্ণ সুবৃহৎ সংসার ; দাস, দাসী, পাকা বাড়ী, পুকুর, বাগান, জমি-জেরাৎ কিছুরই অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু তথাপি এমন সংসারে মনোরমার স্থান হইল না। বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে একদা সহসা শ্বশুর বধূকে লইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সবিনয়ে জানাইলেন,—অনেক বেয়ে-চেয়ে আমরা দেখলুম ভট্টাচার্য্য মশাই, কিন্তু কিছুতেই আপনার কন্যাকে আমার সংসারে মানিয়ে নিতে পারলুম না।

সবিস্ময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রশ্ন করিলেন,—কেন?

বৈবাহিক মহাশয় কহিলেন,—আঠার বছরের ওপর যে কন্যাকে আপনি লালন পালন করেছেন, তাঁর প্রকৃতি কি আপনার অবিদিত?

শুষ্ককণ্ঠে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন,—আমার মেয়ের প্রকৃতিতে তো আর কোন দোষ দে'খিনি, ব্যেইমশাই! হ্যাঁ, তবে সে কিঞ্চিৎ মুখরা বটে, অন্যায় কথা বরদাস্ত করতে পারে না—

বৈবাহিক মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—অন্যায় বরদাস্ত করতে না পারা ত সাহসেরই পরিচয়। কিন্তু সংসারে যত রকমের অন্যায় আছে, আপনার কন্যা সেগুলোর একটি সমষ্টি।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন,—আপনার কথাগুলোও যে হেঁয়ালীর মতন ব্যেই মশাই, বুঝতে পারছি না ত!

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বৈবাহিক পাকা বিষয়ী লোক হইলেও যে অতিশয় রসিক, তাঁহার কথাবার্ত্তায় সে পরিচয় পাওয়া গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বুঝিবার ভুলটুকু প্রকাশ করিতে কহিলেন,—পুরাণে ত পড়েছেন, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রূপসী মেয়েদের তিল তিল রূপ নিয়ে ব্রহ্মাঠাকুর তিলোত্তমার সৃষ্টি ক'রেছিলেন অসুরকুল ধ্বংস ক'রবার জন্য; এ যুগের বিধাতাপুরুষ যেখানে যত কিছু দোষ ও অখুঁত আছে, তা থেকে একটু একটু সংগ্রহ ক'রে আপনার এই মেয়েটিকে তৈরী করেছেন—গৃহীর সংসার ভাঙতে।

কন্যা মনোরমা ইতিমধ্যে বাড়ীর ভিতর গিয়া তাহার রচিত কথার রসে মায়ের মনটি রসাইয়া দিয়াছিল এবং অনামুখো মিন্‌ষেকে রীতিমত সায়েস্তা করিবার জন্য দ্বারদেশে আসিয়া সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল।

বৈবাহিকের মুখের কথা এই স্থানে থামিবামাত্রই পুরাণে চিত্রিত

নিকষা ও সূর্পণখার মত মাতা ও কন্যা ভীতিপ্রদ ভঙ্গীতে অকুস্থানে অবতীর্ণ হইল।

মা কহিল,—কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার মেয়েকে বল ঘর-ভাঙানী, কোনও গুণ তার নেই, শুধু দোষই দেখেছ, এখন একটা ছুতো ধ'রে বউকে ত্যাগ করবার মতলব, তা আর বুঝিনি! কিন্তু ভেবেছ কি আমি অল্পে ছাড়ব? খোরপোষ আদায় ক'রব, আইন ক'রব, হাইকোর্ট ক'রব, কুরুক্ষেত্তর বাধিয়ে তোমার ভিটে মাটী ছাই ক'রে দেব তা জান!

ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্ত্রী-কন্যার প্রকৃতি জানিতেন, এ পক্ষে প্রতিবাদ করিলে তাহার কি পরিণাম, সে অভিজ্ঞতাও তাঁহার প্রচুর ছিল; সুতরাং বিমূঢ় দর্শকের মতই এই অপ্রীতিকর ব্যাপারে তিনি আড়ষ্টভাবে বসিয়া রহিলেন।

বধূর প্রকৃতির পরিচয় নিজের বাড়ীতেই শ্বশুর মহাশয় সর্ব্বতোভাবে পাইয়াছিলেন, বধূ আজ পিত্রালয়ে পদার্পণ করিয়া সুযোগ ও সুবিধাসূত্রে 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেও তিনি বিস্মিত হইতেন না। কিন্তু প্রাচীনা বৈবাহিকার এই অস্বাভাবিক বীরত্বাভিনয় তাঁহাকে চমৎকৃত করিয়া তুলিল! তথাপি অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি মনে মনে উপলব্ধি করিয়া লইলেন যে, পিতার প্রকৃতি সকল ক্ষেত্রে সকল পুত্র-কন্যা আয়ত্ত করিতে পারে না। ব্রহ্মর্ষি পিতার প্রকৃতি পাইয়াছিলেন শুধু বিভীষণ; রাক্ষসী-মাতার প্রকৃতি লইয়া জন্মিয়াছিল সূর্পণখা ও তাহার অন্য দুই পাপপরায়ণ ভ্রাতা। এতক্ষণে তিনিও যেন তাঁহার বধূরত্নের যথাযোগ্য আকরের সন্ধান পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী উত্তেজিতা হইলেই উদ্দাম নৃত্যের তালে তারস্বরে মুখের বিষটুকুর একটি ঝলক মাত্র উদ্গার করিয়া দিতেন, পরক্ষণেই

একেবারে নির্জ্জীবের মত বসিয়া পড়িয়া শ্বাস টানিতেন; যেহেতু, ইদানীং শ্বাসের ব্যাধি তাঁহাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। প্রতিবেশিনীরা বলিত,—বিশ্বনাথের কি বিচার! ভাগ্যিস্ তিনি অমন রোগটাকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন, তাই রক্ষে; নইলে এ পাড়ায় মানুষ ত পরের কথা—কাক-চিল পর্য্যন্ত তিষ্ঠুতে পারত না!

এদিনও বৈবাহিকের উদ্দেশে এক মুখ গরল উদ্গার করিয়াই ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী যখন দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া শ্বাস টানিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কন্যা মনোরমা মাথার ঘোমটা খাটো করিয়া মায়ের মনের বাকি বিষটুকু নিজের মুখ দিয়া বাহির করিতে অগ্রসর হইল।

শ্বশুর বধূর মূর্ত্তি দেখিয়া কহিলেন,—এবার বুঝি তোমার পালা পড়েছে, বৌমা; বেশ ত, যা বলবার ব'লে নাও; আমি ঠিক আছি, পীঠে কুলোও বাঁধিনি, কানে তুলোও গুঁজিনি।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিব্রতভাবে ডাকিলেন,—মনো! ভেতরে যাও তুমি।

কে তাঁহার কথায় কান দিবে! মনোরমার কণ্ঠ হইতে তখন গরল-প্রবাহ ছুটিয়াছে, শ্বশুরের উদ্দেশে সে তখন তীক্ষ্ণস্বরে অবাধ্য ভাষায় তর্জ্জন তুলিয়াছে,—ভগবান্ সাক্ষী, এর বিহিত তিনি করবেন, তেরাত্রি তোমার পোহাবে না, যে সব বেটার গুমোর কর, তাদের মাথা যদি না খাও, আমি ভট্টাচায্যির মেয়ে নই!

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবার ধৈর্য্য হারাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—রাম! রাম! মহাভারত! মহাভারত! ওরে সর্ব্বনাশী রাক্ষসী,—চুপ কর, চুপ কর,—নিজের ঘরে ঝিয়ের বাতি জ্বেলে যে সব ছারখার করতে ছুটেছিস্!

বৈবাহিক মহাশয় অবিচলিত কণ্ঠে কহিলেন—গেলেন আপনার মেয়ের

পরিচয় আজ ? কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই ;—পুরাণে ইতিহাসে বিষকন্যার কথা আছে না, ইনি তাদেরই এক জন। সেই জন্যই, অনেক ভেবে চিন্তেই এঁকে ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। আর একথাও ব'লে যাচ্ছি, খোরপোষের জন্য এঁকে আদালতে ছুটতে হবে না, তার ব্যবস্থাও আমি করেছি,—মাস মাস ত্রিশ টাকা ক'রে ইনি পারেন। এই থেকে যদি ওঁর শিক্ষা হয়, রীতিমত তপস্যা ক'রে প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করতে পারেন, তখন হয় ত আমার ছেলে ওঁকে আবার নিয়ে যেতেও পারে।

অতঃপর আর কোনও কথা না কহিয়া বা কাহাকেও এ সম্বন্ধে কোনও কথা কহিবার অবকাশ না দিয়াই এই স্পষ্টবক্তা হিসাবী মানুষটি সবেগে চলিয়া গেলেন। ভাবাভিভূত ভট্টাচার্য্য মহাশয় সচকিত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য বহু ডাকাডাকি ও সাধাসাধি করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর পশ্চাতের পদচিহ্নটির দিকে ফিরিয়া চাহিতেও দেখা গেল না।

কালোধনের বিবাহের প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই বিচিত্র ঘটনাটি ঘটিয়াছিল এবং তাহার আবর্ত্তে কন্যা মনোরমার অদৃষ্টের সহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুবৃহৎ সংসারটির গতি ভিন্ন পথ ধরিয়াছিল।

স্বামি-পরিত্যক্তা হইলেও যে কন্যার নামে প্রতি মাসে ত্রিশ টাকা মাসোহারা আসে, সাধারণ গৃহস্থ পিতার ঘরে সে কন্যার আদর বা প্রতিষ্ঠা অল্প নহে। বিশেষতঃ নিদারুণ অভাব ও দৈন্যের মধ্য দিয়া প্রতিপালিত হওয়ায় এই পরিবারটির প্রত্যেকেরই মনে অর্থের প্রতি এরূপ একটা মোহ নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল যে, আত্মমর্যাদাসূত্রে সাধারণ বিচারবুদ্ধি সেখানে প্রবেশ করিতেই পারে নাই। সুতরাং যে কন্যা শ্বশুরের সংসারে স্থান পায় নাই এবং যাহাদের উদ্দেশে চরম অভিশাপ বর্ষণ না করিয়া কন্যা কোনও দিন জলগ্রহণ করে না, সেই শ্বশুরপ্রদত্ত মাসোহারা হাত পাতিয়া

গ্রহণ করিতে এবং তাহাতে এ সংসারের নানা অভাব মিটাইতে তাহার মনে কিছুমাত্র বিক্ষোভ উঠিত না; পিতা, মাতা ও ভ্রাতারাও এ সম্বন্ধে বেশ নির্ব্বিকার!

ছয় মাস পরে একদা তারযোগে সাংঘাতিক সংবাদ আসিল,—মনোরমার স্বামী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। বাদামী রঙের কাগজখানি পড়িতে পড়িতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চক্ষুর উপর একটা তমোময় আবরণ ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চের যবনিকার মত যেন প্রলম্বিত হইতে লাগিল। জামাতার সদ্যোবিয়োগব্যথার সহিত মাসে মাসে ত্রিশ টাকার সমস্যাও একসঙ্গে তাঁহাকে অভিভূত করিয়া তুলিল।

সংবাদ পাইয়া মা তারস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, কন্যাও তাহাতে যোগ দিল; প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু সকলেই শুনিয়া স্তব্ধ হইলেন, মা ও মেয়ের আর্ত্তনাদে প্রিয়বিয়োগজনিত বিলাপ নাই, আছে—প্রমত্তের প্রলাপের মত সদ্যোমৃতের পরিজনদের নির্ম্মূল হইবার নিষ্ঠুর নির্দ্দেশ!

এই দুর্ঘটনার পর মনোরমার শ্বশুর বিধবা বধূর সহিত সকল সম্বন্ধই কাটাইয়া ফেলিলেন। মাসোহারা সূত্রে টাকা পাঠাইতে প্রতি মাসে বধূর নাম করিতে হয়, তাহার দস্তখত না দেখিলে নয়, খাতায় হিসাব রাখিতে হয়। কিন্তু এগুলিও যেন তাঁহার পক্ষে বিষময় হইয়া উঠিতেছিল। অবশেষে অনেক যুক্তি পরামর্শের পর এককালীন হাজার সাতেক টাকা দিয়া তিনি এই বিষকন্যাটির সংস্রব একেবারেই ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

এই ব্যবস্থা এ হেন অর্থগৃধ্নু পরিবারটির পক্ষে শাপে বর হইয়া দাঁড়াইল। পক্ষান্তরে এ সংসারে কন্যা মনোরমার যে প্রতিষ্ঠা ছিল, তাহা দৃঢ়তর হইল। টাকার বিষয়ে মেয়েটি টাকার মতই কঠিন ছিল।

মাসোহারার টাকা হইতে সে কিছু সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিল, এ টাকাটাও নিজের হাতে রাখিয়া সে মহাজনী করিতে প্রবৃত্ত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আশ্বস্ত হইলেন, অভাব পড়িলে ঋণের জন্য আর পরের দোরে ছুটিতে হইবে না। প্রথম দফায় তিনি নিজেই কন্যার খাতক হইলেন, বাস্তুভিটাখানি কন্যার নিকট বন্ধক রাখিয়া আড়াই হাজার টাকা লইয়া কয়েকখানি পাকা ঘর তুলিয়া ফেলিলেন।

কন্যার প্রতিষ্ঠা এ সংসারে দিন দিনই বাড়িতেছিল। মনোরমাই সংসারের কর্ত্রী। তাহার মুখের উপর কাহারও কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না। গৃহিণী নিজের কণ্ঠের কাঁসরলাঞ্ছিত স্বর ও অন্তরের তীব্র হলাহল্‌ নির্ব্বিচারে কন্যাকে সমর্পণ করিয়া দুর্ব্বার হাঁফানির সহিত বোঝাপড়া করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কাজেই সংসারের হাল মনোরমাকেই ধরিতে হয়। ভ্রাতারাও দিদি বলিতে অজ্ঞান। কালোধন সহোদরার স্বভাবটুকুর অধিকাংশই আশ্চর্য্যভাবে অনুকরণ করিয়া আত্মস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। দিদির মত তাহারও মুখে হাসির ঝিলিক উঠে না, লোকের টিকি ধরিয়া কথা কহে, তুচ্ছ ব্যাপারে শোরগোল বাধাইয়া তুলে; যেখানে স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা, সেখানে গড়াগড়ি দিতেও দৃক্‌পাত করে না, পক্ষান্তরে যত বড় গুরুজনই হউন, স্বার্থের বিরোধী হইলে অকাতরে লাঞ্ছনা করিতেও কুণ্ঠা পায় না। সে জানে, দিদির টাকায় বাড়ী, দিদির হাতেও যথেষ্ট টাকা, বাবা এখন বৃদ্ধ এবং অকর্ম্মণ্য; সুতরাং দিদির মন রাখিতে প্রয়োজন হইলে বাবাকেও ইতরের ভাষায় ছোট বড় কথা শুনাইতে তাহার বাধে না। বিধাতৃপুরুষ বোধ হয় অনেক বিবেচনা করিয়াই এই দুই ভ্রাতা-ভগিনীর সৃষ্টি কল্পনা করিয়াছিলেন! সুতরাং তুচ্ছ একটা বাটির প্রসঙ্গে একটা পারিবারিক

উৎসবে কালোধন যে দিদির পক্ষ লইয়া তাহার বর্ষীয়ান শ্বশুর ও কৃতী শ্যালকের অবমাননা করিবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই ছিল না।

৮

কালোধনদের আফিস বন্ধ হয় হয়, এমন সময় হর্ষকুমার তাহার টেবিলের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। কালোধন তাহার কাগজপত্র গুছাইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল। নূতন শ্যালক, বয়সে ও সম্মানে বড়, তাহারই অফিসে দেখা করিতে আসিয়াছে। কিন্তু কালোধনকে কিছুমাত্র উৎসাহিত হইতে দেখা গেল না, আনন্দের কোনরূপ চিহ্ন তাহার মুখে পড়িল না। বরং চেয়ারখানার উপর দেহের চাপ একটু জোর করিয়া দিয়াই একান্ত অবহেলার ভঙ্গীতে কহিল,—কি খবর?

হর্ষকুমার পকেটের ভিতর হইতে একটি রূপার বাটি বাহির করিয়া কহিল,—তোমাদের দেওয়া বাটিটা দেখাতে এনেছি, এটা নিয়ে গিয়ে মেলালেই বুঝবে, আমরা মিছে কথা বলিনি।

দুই চক্ষু পাকাইয়া কালোধন কহিল,—কাল আপনি আমাদের বাড়ী বয়ে অপমান করেছেন, আজ আবার আফিসে এসেছেন এই মতলবে?

হর্ষকুমার অবিচলিতকণ্ঠে কহিল,—না, আমি অপমান করতে আসি নি, যে অপবাদ তোমরা আমাদের ওপর চাপিয়েছ, তা থেকে মুক্ত হ'তে এসেছি।

মুখ ও চক্ষুর ভঙ্গী ক্ষিপ্তের মত অস্বাভাবিক করিয়া কালোধন

কহিল,—আপনার সাহস ত কম নয় দেখছি? যে বাড়ীতে বোনের বিয়ে দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে চলতে চান?

হর্ষকুমার কহিল,—বোনের বিয়ে দিয়েছি ব'লে যে তোমাদের অন্যায় পর্য্যন্ত মুখ বুজিয়ে আমাদের বরদাস্ত করতে হবে, এমন কোনও কথা আছে?

কালোধন গম্ভীরভাবে কহিল,—হ্যাঁ, তাই উচিত। ফি হাতে আপনাদের ভাবতে হবে—ভাবা উচিত, আমাদের ঘরে মেয়ে দিয়েছেন, মুখ তুলে বলবার আপনাদের কিছু নেই, আমরা যদিই বা অন্যায় কিছু ব'লে থাকি—সেটা আপনাদের মেনে নিতে হবে, যখন আমাদের অনুগ্রহই আপনাদের ভরসা আর আপনাদের মেয়ে আমাদের হাতের মুঠোর ভেতরে।

এ কথায় অতি বড় তার্কিক হর্ষকুমারেরে মুখও যেন সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল,—স্তব্ধভাবে সে কিছুক্ষণ বদ্ধদৃষ্টিতে কালোধনের কালো মুখখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

হর্ষকুমারকে নিরুত্তর দেখিয়া কালোধন ভাবিল, মুখের মত জবাব সে দিয়াছে, জোঁকের মুখে নুণ পড়িয়াছে, আর রোখ দেখাইবে না।

হর্ষকুমারের মুখে যোগ্য উত্তরও যে উদগ্র হইয়া আসে নাই, তাহা নয়, কিন্তু সে হাসির কথা ভাবিয়া আত্মসংবরণ করিয়া শুধু কহিল,—দেখ কালোধন, পরের মেয়ে আমাদের বাড়ীতে অনেক এসেছে, বছর দুই হ'ল আমিও এক পরের মেয়েকে বিয়ে করেছি, কিন্তু এ রকম মনোবৃত্তি নিয়ে কোনও দিন তার বাপ বা ভাইয়ের সঙ্গে কথা কইনি।

কালোধন কহিল,—আপনি কি করেছেন না করেছেন, সে সব জানতে আমার কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই। আপনি যদি আপনার শ্বশুর,

শাশুড়ী বা শালাদের কাছে জোড়হস্ত হ'য়ে থাকেন, তাদের মাথায় তুলে নাচেন, আমাকেও যে তাই করতে হবে, তার কোনও মানে নেই। আমার কথা কি শুনবেন? আপনাদের মেয়ে নেবার জন্য আমরা সাধতে যাইনি, আপনারাই সাধাসাধি ক'রে পায়ে ধরে' মেয়ে দিয়েছেন, এখন চোখ রাঙ্গান কিসের জন্যে বলুন ত? বরাবর আপনারা নীচু হ'য়ে থাকবেন, আমাদের মন যুগিয়ে চলবেন, আপনাদের সঙ্গে এই ত আমাদের সম্বন্ধ। এতে আপত্তি থাকে, মেয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।

হর্ষকুমার ম্লানমুখে কহিল,—তোমার এ কথার ওপর আর কথা নেই, কালোধন। আমি তোমাকে চোখ রাঙিয়ে শাসাতেও আসি নি, ঝগড়া করবার মতলবও আমার নেই। যে কথাটা তোমার বৌভাতের দিন উঠেছিল, সেই সূত্রেই আমি এই বাটিটা—

হর্ষকুমারের কথায় দৃঢ়স্বরে বাধা দিয়া কালোধন কহিল,—আবার ঐ বাটির কথা আপনি তুলছেন? ওর মানেই আমার দিদির অপমান করা। তিনি যদি ভুল বুঝেই একটা কথা ব'লে থাকেন, তার খণ্ডন আপনাদের না করলেই বুঝি নয়! মেয়ে যে ঘরে দিতে হয় মেয়ের বাপ-ভাইকে সেখানে পীঠে কুলো বেঁধে আর কানে তূলো গুঁজে যেতে হয়, এ জ্ঞান আপনার এখনও হয় নি, কিন্তু আমরা ছেলেবেলা থেকেই এটা জেনে আসছি।

হর্ষকুমার কহিল,—একটা বর্দ্ধিষ্ণু সমাজের ভেতরে থেকেও আমরা কিন্তু এ পর্য্যন্ত এটা জানতে পারিনি, কালোধন! বেশ, আমি বাবাকে বলব, তিনি এর পর ঐ ভাবেই প্রস্তুত হ'য়ে যেন তাঁর মেয়েকে দেখতে যান।

৬

রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে সুবৃহৎ গোষ্ঠীর কর্ত্তা, সেখানে গত বিশ বৎসরের মধ্যে প্রায় সতেরটি কন্যা পাত্রস্থা হইয়াছে। এই একান্নবর্ত্তী পরিবারের সকল কন্যাই যে বিবাহের পর পরম সুখী হইয়াছে বা সকল জামাতাই যে সর্ব্বগুণান্বিত বলিয়া প্রশংসা পাইয়াছে, এ কথা অবশ্য জোর করিয়া বলা চলে না। কিন্তু এই বংশের সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা হাসির পরিণয়সূত্রে যে কালোবরণ রত্নটি এ বংশের জামাতৃমালিকায় গ্রথিত হইয়াছিল, তাহার অপরূপ ব্যবহারপ্রাখর্য্যে আত্মীয় পরিজনের চক্ষুগুলি ঝলসিয়া গেল।

উপায়ক্ষম ছেলে, বাপ মা বিদ্যমান, ঘরবাড়ী আছে, খাইবার পরিবার কষ্ট নাই, বিদেশ-বেভুঁই নয়; সুতরাং হাসি এখানে আসিয়া সুখীই হইবে, ইহা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দৃঢ় ধারণা ছিল। বস্তুতঃ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে চাহিয়া বিবেচনা করিলে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন গৃহস্থকন্যার পক্ষে এ ঘর অবাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু বিবাহ ব্যাপারে ঘর-বর দেখিয়া মেয়ে দিলেও সকল ক্ষেত্রেই যে তাহা সুখদায়ক হয়, ইহা জোর করিয়া বলা চলে না।

ভট্টাচার্য্য-পরিবারে প্রবেশ করিয়াই তরুণী হাসি দেখিল, সে এক স্বতন্ত্র জগতে আসিয়া পড়িয়াছে। এখানকার খাওয়া-পরা, বিধি-ব্যবস্থা, চলা-ফেরা, জীবনযাত্রার যত কিছু ধারা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন! দুইবার হাঁচিলে এখানে কৈফিয়ৎ দিতে হয়, হাত হইতে হঠাৎ কোনও জিনিস পড়িয়া ভাঙিয়া গেলে শাশুড়ী ননদের তীব্র তিরস্কার ত আছেই;

উপরন্তু ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাহার প্রয়োজনীয় কোনও ব্যবহার্য্য বস্তুর বরাদ্দ বন্ধ হইয়া যায়। মাথা ধরিলেও নিষ্কৃতি নাই, নিদারুণ যন্ত্রণার ভিতর দিয়া দৈনন্দিন কার্য্য সমাধা করা চাই ; এমন কি, জ্বরে পড়িলেও বিশ্রাম মিলে না ; উপর হইতে নির্দ্দেশ আসে—ও কিছু নয়, মেয়েমানুষের আবার অসুখ কি, ওষুধ পথ্যই বা কি, নাইলে-খেলে অসুখ পালাতে পথ পাবে না।

এই সংসারে বধূর মর্য্যাদা লইয়া সুখী হইতে আসিয়াছে হাসি! তাহার সুন্দর চেহারা, স্বাস্থ্যপুষ্ট সুগঠিত দেহ সম্বৎসরের মধ্যে যেন কি হইয়া গেল! সংসারের নানা অসুবিধাও সে হয় ত গ্রাহ্য করিত না, অম্লানবদনে সমস্তই সহ্য করিয়া কষ্টকে উপহাস করিতে পারিত,—যদি দিনান্তেও পাইত স্বামীর স্নেহময় পরশ, প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার, ভালবাসার বিশল্যকরণী। বহু সংসারের বহু লাঞ্ছিতা বধূ শাশুড়ী-ননদের শক্তিশেলের আঘাতে মুহ্যমানা হইয়াও যে বাঁচিয়া থাকে, তাহার মূলে স্বামীর সহানুভূতিপূর্ণ দরদ, ভবিষ্যতের আশা। কিন্তু অভাগিনী হাসির পক্ষে এ পথও হইয়াছিল কণ্টকিত,—সারাদিন সংসারে নিষ্ঠুর নির্যাতন সহ্য করিয়া রাত্রেও শয়নমন্দিরে জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীর রূঢ় বাক্যবাণ তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিত।

তথাপি হাসি স্বামীর মন জোগাইতে কত চেষ্টাই না করিয়াছে! কিন্তু তাহার অদৃষ্টে তাহার কোনও প্রয়াস কি কোনও দিন সার্থক হইয়াছে? স্বামীর যাহা প্রয়োজন, যে যে বিষয়ে তাহার রুচি, হাসি যথাশক্তি সে সম্বন্ধে সচেতন থাকিত, কিন্তু তথাপি স্বামীর প্রসন্নতা পাইত না।

এক দিন সাহস করিয়া সে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল,—আমাকে বলতে পার, কি করলে তোমাদের মনের মত হই?

কালোধন তখন শয্যায় দেহখানি ঢালিবার উপক্রম করিতেছিল, সহসা সোজা হইয়া বসিয়া কহিল,—এ কথা বলবার মানে ?

হাসি স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল,—এমনই ; কিছুতেই ত তোমাদের মন পাচ্ছি না, তাই জানতে চাইছি।

তীব্রদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া কালোধন রূঢ়স্বরে কহিল,—কেন, তোমার বুকের ওপর কি এমন দশ-মণি পাথর চাপানো হয়েছে যে, ও কথা বলা হচ্ছে ?

মুখখানা ম্লান করিয়া হাসি কহিল,—আমি ত ওকথা বলিনি, তোমরা আমার বুকে পাথর চাপাতে যাবে কেন ?

বিকৃতমুখে কালোধন কহিল,—তবে ন্যাকামী ক'রে কথাটা বলা হ'ল কেন ?

স্বামীর সহানুভূতিটুকু উদ্রেক করিবার আশায় হাসি কথাটা পাড়িয়াছিল, যদি এই সূত্রে স্বামীর পক্ষ হইতে এমন একটা নির্দ্দেশ সে পায়, যাহা অবলম্বন করিলে প্রখরা ননদিনীর পীড়নচক্রের গতি কিঞ্চিৎ মন্থর হইতে পারে এবং সেও একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে স্বামী কথাটার অর্থ এমন ভাবে উল্টা করিয়া ধরিল যে, হাসির বুকের ভিতর টিপ্ টিপ্ করিয়া উঠিল, কান্না কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিল। কিন্তু এ বাড়ীতে বধূর চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিলে, তাহার পরিণাম যে কি সাংঘাতিক হইয়া উঠে, তাহা অনুভব করিয়াই হাসি যেন সবলে অশ্রুর উদগ্র প্রবাহকে ঠেলিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর দিকে চাহিয়া মিনতির সুরে কহিল,—আমাকে ক্ষমা কর, কি বলতে কি ব'লে ফেলেছি, কথাটা হয় ত ঠিক গুছিয়ে বলতে পারি নি।

অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চাহিয়া কালোধন কহিল,—ও সব নভেলি

ধাঁচের কথায় আমি ভুলি না, ওসব বেহায়াপনা এ বাড়ীতে চলবে না। ভেবেছ, দিদির নামে লাগিয়ে আমার মন ভাঙাবে, সে ছেলেই আমি নই।

হাসির দুই চক্ষুর দুর্ব্বার অশ্রু আর বাধা মানিল না, সেদিকে আর ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দুই হাতে স্বামীর পা দুইখানি ধরিয়া সে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কহিল,—ওগো, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, দিদির নামে আমি কিছু লাগাতে আসি নি, আমার কথা তুমি বিশ্বাস কর—

পা দুইখানা জোরে ছাড়াইয়া লইয়া কালাধন মুখখানা অধিকতর বিকৃত করিয়া কহিল,—হাঁ, হাঁ, ঢের হয়েছে, আর আধিখ্যেতা করতে হবে না, আমি কচি খোকা নই—সব বুঝি; এ রকম ছেনালীপনা চাকদার চাটুয্যে-বাড়ীতেই সাজে,—ছোটলোকের মেয়ে না হ'লে এমন হয়!

হাসি মেয়েটির স্বভাব যতই কোমল হউক, মুখখানি বুজাইয়া এ বাড়ীর যত অত্যাচারই সহ্য করিতে অভ্যস্ত থাকুক, তাহার ঋষিতুল্য পিতার সম্বন্ধে কোনও সূত্রে অযথা আক্রমণ হইলে—তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের উপর কেহ কটাক্ষ করিলে সে স্থান কাল ভুলিয়া প্রতিবাদের ভঙ্গীতে গ্রীবা তুলিয়া দাঁড়াইত। এই শ্রেণীর মেয়েরা পরের বাড়ীতে পড়িয়া সহস্র লাঞ্ছনা নীরবে সহিলেও পিতৃনিন্দার আঘাতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। কালোধনের শেষের কথায় হাসি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, দুই চক্ষুর অতি প্রখর দৃষ্টিতে স্বামীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকেও যেন বিবর্ণ করিয়া দিয়া সে দৃপ্তকণ্ঠে কহিল,—কি বললে তুমি, কি বললে?

দংশনোদ্যত কালসাপের চক্ষুর উপর সহসা টর্চ্চের প্রখর আলো পড়িলে সে যেমন তৎক্ষণাৎ বিমূঢ় হইয়া পড়ে, কালোধনের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। পরক্ষণেই নিজের অভিভূত ভাবটুকু

কাটাইয়া সে তর্জ্জন করিয়া উঠিল,—কেন, যা বলেছি, সে ত মুখ বুজিয়ে বলিনি, জোর গলাতেই বলেছি, কি হয়েছে তাতে ?

হাসি তাহার কণ্ঠস্বর এবার স্নিগ্ধ করিয়াই কহিল,—যে কথা মুখ দিয়ে বলেছ তুমি, তার জন্য তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।

উদ্ধতভাবে কালোধন প্রশ্ন করিল,—কেন, শুনি ?

হাসি পূর্ব্ববৎ স্নিগ্ধকণ্ঠেই উত্তর দিল,—আমাকে নিয়ে যেখানে কথা, আমার ওপর তোমাদের যখন পূর্ণ অধিকার, আমাকে নিয়ে তোমার যা ইচ্ছে তাই করতে পারো, কিন্তু আমার বাবাকে যা নয় তাই বলবে কেন ?

বিকৃতকণ্ঠে কালোধন কহিল,—বলি তোমার গুণে, আর তোমার গুণধর ভাইটির জন্যে ; নইলে, সে ভদ্রলোককে মিছিমিছি খোঁচা দিই, এ আমারও ইচ্ছে নয়।

হাসির সাহস সম্ভবতঃ মনের উত্তেজনাটাকে আশ্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ প্রশ্রয় পাইয়াছিল, তাই এবার সে কথার পিঠে সহসা বলিয়া ফেলিল,—তোমরা পুরুষ, যা ইচ্ছে তাই করতে পারো, শুধু ঘরের কোটরে ত তোমাদের পড়ে থাকতে হয় না, যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো, যা খুসী তাই করো,—কিন্তু আমাদের কথা ভাব দেখি—

শ্লেষের সুরে কালোধন কহিল,—বল, বল, ব'লে যাও—

হাসি আবেগের সহিত কহিতে লাগিল,—মা, বাপ, ভাই, বোন, কত আপনার জন, যে বাড়ীতে জন্মেছি, মানুষ হয়েছি, জ্ঞান হ'য়ে অবধি যেখানে কাটিয়েছি, একদিনেই সে সব কাটিয়ে কত দূরে, কত অচেনা অজানা জায়গায় আসতে হয়েছে ভাব দেখি ! কাউকে দেখিনি কখনো, মিশিনি কোনো দিন, তাদেরই সঙ্গে মিশে তাদেরই আপনার ক'রে নিতে হচ্ছে, নিতে হবে। পেছনের সব আকর্ষণ জোর ক'রে ছিঁড়ে ফেলে মন এখানে

বাঁধতে হচ্ছে। এ যে মেয়েদের কত বড় তপস্যা, এ ত্যাগ যে কত শক্ত, তোমরা পুরুষ, যদি একটিবার মন দিয়ে ভাবতে, তা হ'লে আমাদের ছোট খাটো ভুল-চুক ধরে কখনই খোঁটা দিতে না,—তাদের বাপ মার উদ্দেশে আঘাত দিয়ে হতভাগীদের কচি কচি মনগুলো ভেঙে দিতে চাইতে না। তোমরা কেন বুঝতে চাও না—মেয়ে সব সইতে পারে, কিন্তু বাপ মা'র ওপর খোঁটা তাদের বুকে বজ্রের মত বাজে, সে আঘাত তারা সইতে পারে না কিছুতেই।

হাসির কথা শেষ হইতেই কালোধন দুই হাতে সজোরে করতালি দিয়া কহিল,—এক্‌সেলেণ্ট, একসেলেণ্ট! ব্র্যাভো! ঠিক যেন কুসুমকুমারীর য়্যাকটিং শুনছি! বা! বা। আচ্ছা, কাল সকালে এই স্পীচটা দিদিকে একবার শুনিয়ে দিয়ো ভাল ক'রে!

পরক্ষণেই রুদ্ধ কক্ষের মুক্ত গবাক্ষের দিক্ দিয়া অদৃশ্য মুখের পরিচিত স্বর ঝঙ্কার দিল,—কাল আর কষ্ট ক'রে দিদিকে শোনাতে হবে না, দিদি গোড়া থেকে সবই শুনেছে।

কালোধন সচকিতভাবে গবাক্ষের দিকে চাহিল, আর হাসির মনে হইল, তাহাকে লইয়া সমস্ত ঘরখানাই যেন ঘুরপাক খাইতেছে।

৭

তিন বৎসর পরের ঘটনা। বহু আবেদন-নিবেদন, সাধ্য সাধনা, সপুত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বহুবার আনাগোনা ও ক্ষমাভিক্ষার পর মনোরমা এক মাসের কড়ারে হাসিকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে সম্মত হইল। মনোরমাই এ ব্যাপারে মত দিল, এ কথা বলিবার অর্থ এই যে, এ-পক্ষের প্রার্থনা যখন বার বার নিষ্ফল হইয়া গেল, ভিতর হইতে অলক্ষ্যে থাকিয়া মনোরমা বিষাক্ত শরজাল সেই সঙ্গে বর্ষণ করিয়া যখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চিত্তে দাহ উপস্থিত করিত এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট কথায় তাহাতে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতেন, সেই সূত্রেই একদা ললাটে হাত-খানি রাখিয়া চাপাকণ্ঠে তিনি এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন,—ব্যেই, আমাকে ধরাধরি মিছে, আমি এখন বুড়ো গাই, পিঁজরাপোলে পাঠালেই হয়; দুবেলা দু মুঠো খেতে দেয়, তার বদলে যজমানের কাজকর্ম্ম করিয়ে নেয়। আমার কথার কোনো দামই এখানে নেই। আমাকে ধরলে কিছু হবে না, ধরো আমার মেয়েকে। হাঁ, এ কথাও চুপি চুপি জানিয়ে দিচ্ছি ব্যেই, মেয়ের পূজো দিতে ভুলো না; জান ত সিন্নি পেলে পীরও তুষ্ট হয়, শুধু আঙুলে ঘি ওঠে না।

এই নির্দ্দেশ পাইবার পর রীতিমত পূজা ও দক্ষিণার সহিত মনোরমার আরাধনা চলে এবং তাহার ফল ব্যর্থ হয় নাই।

হাসি পিত্রালয়ে আসিয়াছে। কিন্তু এই কি সেই কলহাস্যময়ী আনন্দ-দায়িনী হাসি! কোথায় মিশিয়া গিয়াছে তাহার মুখের সেই অফুরন্ত হাসি, কে লুটিয়া লইয়াছে নিষ্ঠুরের মত তাহার পরিপুষ্ট দেহের কান্তি লাবণ্য

স্বাস্থ্য-সুষমা! মৃগশিশুটির মত যে কিশোরী এক সময় এ বাড়ীর সর্ব্বত্র কারণে-অকারণে চঞ্চল চরণে ছুটিয়া বেড়াইত, বিচিত্র গতিভঙ্গী প্রত্যেকের মনে প্রচুর তৃপ্তি জোগাইত, সরলতামাখা অকপট কথাগুলি সেই বয়সেই যাহার স্বভাবমাধুর্য্যের পরিচয় দিত,—পাগলী, আহ্লাদী, আনন্দময়ী ইত্যাদি প্রকৃতি-অনুযায়ী বিবিধ বিশেষণে যে মেয়েটি ভূষিতা হইয়াছিল,—মাত্র তিনটি বৎসর পরে তাহার আকৃতিতে একি পরিবর্ত্তন! এখন তাহাকে দেখিয়া সহসা চিনিতে পারিবার উপায় নাই—এমনই তাহার দেহের অবস্থা! বয়সের অনুপাতে মুখখানি হইয়াছে অস্বাভাবিক গম্ভীর, তাহাতে কোনও দীপ্তি নাই, লাবণ্য নাই, মুখের ছাঁচটুকুই শুধু পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য-সুষমার কথঞ্চিৎ আভাস দিতেছে; বড় বড় দুইটি চক্ষুতারকা কোটরগত হইলেও যেন জোর করিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে!

হাসির এ চেহারা দেখিয়া প্রত্যেকেই বিস্ময়াতঙ্কে কহিল,—ওমা, একি চেহারা হয়েছে তোর, হাসি! তিন বছরের ভেতরেই যেন তিরিশের কোঠায় উঠেছিস্! শ্বশুরবাড়ী ত সবাই যায়, কিন্তু এই বয়সে দেহ ত এমন করে কারুর ভেঙে পড়তে দেখিনি।

ইদানীং হাসির শরীর ভাঙিয়া গিয়াছিল, জল পর্য্যন্ত পেটে হজম হইতেছিল না। শ্বশুরবাড়ীতে চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থাই হয় নাই। পিত্রালয়ে আসিবার পর তাহার দেহের ও মনের রোগ ধরা দিয়াছে,—স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছে, হাসির এই অসুস্থতাই তাহাকে পিত্রালয়ে আসিবার এই সুযোগ দিয়াছে। অথচ হাসিকে পাঠাইবার সময় তাহার ব্যাধির সম্বন্ধে কোনও কথাই তাহারা ব্যক্ত করে নাই। একটা জীবনের উপর এভাবে অবহেলা সেখানেই সম্ভব, পুত্রবধূ যাহাদের বিচারে পরের মেয়ে—যাহার জীবনের কোনও দাম নাই।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেখানে কন্যাকে দেখাইয়াই শিহরিয়া উঠিয়া কহিয়াছিলেন,—একি চেহারা হয়েছে, মা, তোর? অসুখ হচ্ছে নাকি!

পিত্রালয় হইতে কেহ কখনও হাসিকে দেখিতে আসিলে অশোকবনের চেড়ীর মত শাশুড়ী ও ননদ দরজার দুই ধারে দাঁড়াইয়া পাহারা দিত, ঐ দিনও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই!

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখের কথা যেন লুফিয়া লইয়াই মনোরমা উত্তর দিয়াছিল,—অসুখ হবে কেন? ও-সব আধিখ্যেতা! সারারাত দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে থাকবে, লুচি পরোটা মিষ্টি কত কি নিয়ে নিত্যি সাধাসাধি, কার বাপের সাধ্যি মুখে কিছু তোলাতে পারে! বলে, না খেলে হাতী শুকিয়ে মরে, এতো মানুষ! ছ্যা-ছ্যা! এতে চেহারা খারাপ হবে না! এখন লোকে দুষবে আমাদের, বলবে—খেতে দিত না! বরাত! বরাত!

এ কথার উপরে সরলমন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আর কোনও কথাই বলেন নাই, কোনও প্রশ্ন তুলিতে সাহস পান নাই, কন্যাকে লইয়া ম্লানমুখে চলিয়া আসেন; মনে সান্ত্বনার বিষয় এইটুকু ছিল যে, বাড়ীতে লইয়া গিয়া সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন, সারাইয়া তুলিবেন।

কিন্তু ব্যাধি যেখানে মনের উপর দুর্ব্বার প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে, চিকিৎসায় সেখানে কি উপকার হইবে—ঔষধ কি প্রতীকার করিবে? নিজের রোগ সম্বন্ধে হাসির মুখে কথা নাই, শ্বশুরবাড়ীর বিরুদ্ধে কোনও নালিশ কোনও দিন সে তুলে নাই। আগে কথা আরম্ভ করিলে, যে হাসির মুখে খই ফুটিত, মা বিরক্ত হইয়া কহিতেন—তুই বড় বকিস, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কি ক'রে মুখ বুজিয়ে কাজ করবি কে জানে!—তখন বোধ হয় বিধাতা অলক্ষ্যে বসিয়া হাসিয়াছিলেন; মা'ও বোধ হয় ভুলিয়া

গিয়াছেন—সে বড় কঠিন ঠাঁই, বোবার সেখানে বোল ফোটে, মুখরার মুখ বন্ধ হয়, এমন কঠিন শাসন !

তথাপি কথায় কথায় নানা সূত্রে একটু আধটু করিয়া সুকৌশলী উকীলের জেরার মত বুদ্ধিমতী মা মেয়ের মুখ দিয়া বহু গোপন-কথাই বাহির করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে এই স্পষ্টবাদিনী তেজস্বিনী নারীর মাতৃহৃদয়টি নিদারুণ অনুশোচনায় বিষাইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তখন বুঝিলেন, প্রচুর পয়সা খরচ করিয়া কিরূপ অমানুষের ঘরে তাঁহারা তাঁহাদের এই আদরিণী মেয়েটিকে ফেলিয়া দিয়াছেন ! স্বামী শুধু সন্ধান লইয়াছিলেন, তাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল, খাইবার পরিবার ভাবনা নাই, মাথা গুঁজিবার মত পাকা ঘরবাড়ী বিদ্যমান, ছেলেও উপায়ক্ষম ! কিন্তু আসল বস্তুটির সন্ধান লন নাই, হৃদয় বলিয়া যে বস্তুটি প্রত্যেক মানুষের প্রধান ভূষণ—যার জন্য গৃহস্থের সংসার শান্তিময়, সেইটিরই ছিল ইহাদের একান্ত অভাব ! ইহারা শুধু পয়সাই চিনিয়াছিল, তাই নবোঢ়া বধূর গায়ের গহনাগুলি এই অমানুষদের দুর্ব্বার লালসায় ইন্ধনস্বরূপ হইয়া সুদের অঙ্ক পুষ্ট করিতেছিল ! যাহাদের হৃদয় নাই, সৌন্দর্য্যের মহিমা তাহারা কি করিয়া উপলব্ধি করিবে ? টাকা যখন টাকা আনিতে পারে, তখন প্রায় এতগুলি টাকা গহনায় আবদ্ধ হইয়া একটা তুচ্ছ মেয়ের বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিবে কেন ?

ইহাদের এই হৃদয়হীন ব্যবহারটি প্রসন্নময়ীর মনে সর্ব্বক্ষণই কাঁটার মত বিঁধিতেছিল ; মেয়ে যে প্রায় নিরাভরণা হইয়া—হাতে মাত্র দুই গাছা করিয়া সোনার আবরণ মণ্ডিত তামার রুলি পরিয়া সঙ্গে চলিয়াছে, ইহা পিতার চক্ষুতে ধরা পড়ে নাই। কিন্তু মাতা মেয়েকে দেখিয়াই সন্দিগ্ধ হইয়া উঠেন এবং পরে সমস্তই জ্ঞাত হন। মেয়ের দিকে চাহিলেই তাঁহার

সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়, প্রাণের ভিতর হাহাকার করিয়া উঠে। তিনি যে দেড় হাজার টাকার গহনা দিয়া মেয়েকে সাজাইয়া ইহাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন, সে দেনা যে এখনও সম্পূর্ণ পরিশোধ হয় নাই—মায়ের প্রাণে মেয়ের এতখানি খোয়ার কি সহ্য হয়? শুধু স্পষ্টবাদিনী প্রসন্নময়ী কেন, এমন অবস্থায় কোন্ মা মনে ধৈর্য্য ধরিতে পারেন?

প্রসন্নময়ীর মনের যখন এই অবস্থা, তখন একদিন সহসা আফিসের পাল্‌টা কালোধন এ বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে এই তাহার প্রথম পদার্পণ! শ্বশুর শাশুড়ী শ্যালক শ্যালিকা প্রভৃতির পক্ষ হইতে যদিও জামাতার আদর-আপ্যায়নের কোনও ক্রটী হইল না সত্য, কিন্তু তাহার বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বক্ষণে মর্ম্মপীড়িতা প্রসন্নময়ী অপ্রসন্নভাবে রুদ্ধ হৃদয়দ্বার এমনই অতর্কিতে উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন যে, তাহাতে আর এক অনর্থের সূত্রপাত হইল।

জামাতাকে লক্ষ্য করিয়া শাশুড়ী কহিলেন,—এ তোমাদের কোন্ দেশী বিচার-বিবেচনা, বাবা? হাসিকে একেবারে নেড়া ক'রে রেখেছ, এই ত ওদের গয়না-গাটি পরবার বয়েস, সেজে-গুজে কোথায় বেড়াবে, তা নয়, মেয়ে আমার খালি গায়ে এসে দাঁড়ালো, যে দেখে সেই কত কথাই বলে, শুনে যেমন লজ্জা হয়, তেমনি কষ্টও পাই।

কালোধনের মুখখানা মুহূর্ত্তে নিদারুণ বিরক্তিতে বিকৃত হইয়া উঠিল। যে অনুযোগ শাশুড়ী তুলিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা অপ্রতিভ না হইয়া সে শাশুড়ীর মুখের উপরেই স্বচ্ছন্দে কহিল,—কষ্ট যদি পান, গা'ভরা গয়না পরিয়ে মেয়েকে সাজিয়ে রাখতে পারেন?

প্রসন্নময়ীর সর্ব্বাঙ্গ যেন এ কথায় জ্বলিয়া উঠিল, কথার পিঠে যথোচিত কথা কহিতে কোনও ক্ষেত্রেই তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না, এ ক্ষেত্রেও

হইলেন না ; গায়ে বিঁধিবার মত তীক্ষ্ণস্বরেই কহিলেন,—সে দিক্ দিয়ে কোনো কসুরই ত করিনি, বাবা ? গা-ভরা গয়না পরিয়েই ত হাসিকে দিয়েছিলুম তোমার হাতে, কিন্তু সে সব কি হ'ল, বাবা ? যদি বুঝতুম, পেটের দায়ে গেছে, কোনো কথাই কইতুম না ; দেনা দিতে যদি মেয়ে আমার গয়নাগুলো খুলে দিত, ভাবতুম, এমনি পোড়া অদৃষ্ট ; বিষয়-আশয় কিনতে যদি সেগুলো যেত, তাতেও দুঃখু করবার কিছু থাকত না ; কিন্তু টাকা খাটিয়ে সুদ খাবার জন্যে ওর সাধ-আহ্লাদ ঘুচিয়ে ওগুলো যে বেচে ফেলেছ বাবা, সে কি ভালো করেছ ? তোমার বাবা ত ভট্‌চায্যি মানুষ, পূজো-পাঠ করেন, ন্যায়-অন্যায়ের বিধান দেন, তাঁকেই জিজ্ঞেসা ক'রে দেখো, তিনি কি বলেন ?

কালোধন মনের রাগ কষ্টে সংবরণ করিয়া কহিল,—তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে এই কথাই তিনি বলবেন—আমার ছাগল, আমি যদি ন্যাজের দিক্ দিয়ে কাটি, তাতে পরের কি ?

কথা কয়টি এক নিশ্বাসে বলিয়াই স্পষ্টবাদিনী শাশুড়ীকে উত্তর দিবার অবসর বা তাঁহার প্রতি কোনওরূপ প্রণতি জ্ঞাপন না করিয়াই সে ক্ষিপ্র-গতিতে বাহির হইয়া গেল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিক্ষুব্ধ ও অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ গৃহিণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—করলে কি ! কালসাপের ন্যাজে কেন লাঠির খোঁচা দিলে ?

গৃহিণী কহিলেন,—কি করব, আর বরদাস্ত হ'ল না।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন,—রাত্রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে অনেকটা সুপথে এনেছিলুম। বললুম, হাসিকে কোথাও হাওয়া বদলাতে নিয়ে যাও, বাবা, তা হ'লে সেরে যাবে। শুনে বললে যে আজ্ঞে, সেই ব্যবস্থাই করব। আর আজ অমনি তুমি গয়নাগাঁটির কথা তুলে সব মাটী ক'রে দিলে !

প্রসন্নময়ী তীব্রকণ্ঠে কহিলেন,—তোমার যেমন বুদ্ধি, তাই ঐ অনামুখোর কথা শুনে বিশ্বাস করলে! উনি আবার মেয়েকে পয়সা খরচ ক'রে হাওয়া বদলাতে নিয়ে যাবেন! কত অভাগ্যি নিয়ে জন্মেছিল হাসি, আর কত মহাপাপই আমরা জন্মে জন্মে করেছিলুম, তাই এমন নিমুক্কোদের ঘরে সে পড়েছে!

এই সময় হাসি ধীরে ধীরে আসিয়া ঘরের দেওয়ালটির সহিত শীর্ণ দেহখানি মিশাইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর কোটরগত দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি অস্বাভাবিকভাবে বিস্ফারিত করিয়া কহিল,—কি করলে, মা!

কি নিদারুণ প্রশ্ন? কথা কয়টি যেন শব্দভেদী বাণের মত মায়ের বক্ষ-পঞ্জর দীর্ণ করিয়া দিল; কন্যার করুণ দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের কত ভীতি-প্রদ মর্ম্মান্তিক আভাস,—ক্ষীণকণ্ঠনিঃসৃত কয়টি আর্ত্তস্বর কি নিদারুণ ভাবেই তাহার নির্দ্দেশ দিল!

মুহূর্ত্তে প্রসন্নময়ীর মুখখানা যেন শবের মত বিবর্ণ হইয়া গেল, মনের দৃঢ়তা, সহজাত ধৈর্য্য ও তেজস্বিতা উদ্দাম অশ্রুর আবর্ত্তে ভাসাইয়া দিয়া তিনি চীৎকার তুলিলেন,—আর যে পারি না ভগবান্, আমায় তুলে নাও, তুলে নাও!

আফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া কালোধন শ্বশুরবাড়ীর সকল কথাই মনোরমাকে শুনাইয়া দিল। শাশুড়ীর স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া মনোরমার বিস্ময়ের অন্ত নাই। একটা কোলাব্যাঙ সাপের মুখে ল্যাং মারিয়াছে শুনিলে যেমন বিস্ময়ে স্তব্ধ হইতে হয়, ইহাও অনেকটা সেই প্রকার। মেয়ের মা, জামায়ের সম্মুখে যাহার মুখখানা নত করিয়া থাকিবার কথা, তাহার এতবড় বুকের পাটা? আর সেই হারামজাদীটারই বা কি আক্কেল! বার বার তাহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এখানকার

কথাবার্তা সম্বন্ধে মুখখানা যেন সেলাই ক'রে রাখে, একটি কথা যেন না ফাঁস হয়! আচ্ছা, এক মাঘে ত শীত পালাবে না, আসুন এখানে আগে!

কালোধন শ্লেষের ভঙ্গীতে ইহাও জানাইল,—বুড়োর বলা হ'ল, শরীরটা ওর ভেঙে পড়েছে, পশ্চিমে নিয়ে গিয়ে হাওয়া বদলাবার ব্যবস্থা কর।

এক ধারে বসিয়া বুকের ব্যথা দুই হাতে চাপিয়া কালোধনের মাও এই প্রয়োজনীয় আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। শ্বাসের টান তখন একটু নরম হওয়ায় এক নিশ্বাসে কহিয়া ফেলিলেন,—তুই কেন বললিনি কালো, যমের দক্ষিণ দোরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা শীগগীরই করছি, হাড়গুলো আমাদের জুড়ুক!

এই সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয় একখানা চিঠি হাতে করিয়া আসরে দেখা দিলেন, গৃহিণীর শেষের কথাটাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি কহিলেন,—কি যে বল তুমি ভেবে পাই না, অল্প বয়সে বুড়িয়ে গিয়ে বুদ্ধিশুদ্ধিও তুমি হারিয়ে ফেলছ দিন দিন।

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী ভাঙাগলায় ঝঙ্কার তুলিলেন,—আহা, বউএর ওপর দরদ দেখে আর বাঁচি নে? কেন, অন্যায়টা কি আমি বলেছি? আজ যদি ও বৌ চিতেয় শোয়, কালই আমি ড্যাঙডেঙিয়ে কালোর নতুন বউ আনবো।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় চাপাকণ্ঠে কহিলেন,—তা এনো। কিন্তু ঘরের দেয়ালগুলোরও কান আছে, এ কথা ভুলে যেয়ো না। আমাকে দশজনের মন জুগিয়ে চলতে হয়। হাঁ, যা বলতে এসেছিলুম শোনো,—অনু চিঠি লিখেছে, এই পড়ো, আর কি করবে তা স্থির কর।

অনুপমা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা। শান্তিপুরে তাহার

শ্বশুরালয়, সে এই পত্র লিখিয়াছে। ভগিনীর চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে মনোরমার চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, পড়া শেষ হইলে সেখানা ভ্রাতার হাতে দিয়া সে কহিল,—আচ্ছা বাবা, ভেবে-চিন্তে কালই আমরা এর জবাব দেব।

বৃদ্ধ পিতাকে বিদায় দিয়া বিরলে ভ্রাতা ও ভগিনী পরামর্শ করিতে বসিল।

৮

কয়েকদিন পরেই চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ডাকযোগে জামাতার এক পত্র পাইলেন। সেই পত্রের মর্ম্ম এই যে, শ্বশুর মহাশয়ের নির্দ্দেশ মত তাঁহার রুগ্না কন্যাকে মধুপুরে চেঞ্জে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং কালোধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যাদুধন আগামী রবিবার তাহাকে এ বাড়ীতে আনিবে, পরদিনই পশ্চিম যাত্রা করা হইবে।

আনন্দের আতিশয্যে অভিভূত ও প্রায় মুক্তকচ্ছ অবস্থায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাড়ীর ভিতর ছুটিলেন, গৃহিণীকে ডাকিয়া গদ্‌গদ-স্বরে কহিলেন,—ওগো, এই দেখো; জামাইকে তোমরা যতটা মন্দ ঠাউরেছিলে তা নয়। বাবাজী আমার কথা রেখেছেন, এই শোনো—

চিঠি শুনিয়া প্রায় সকলেই প্রসন্নভাবে বলিলেন,—তবু ভালো, নজর তা হ'লে পড়েছে।

কিন্তু প্রসন্নময়ী সন্দেহসূচক ভঙ্গীতে কহিলেন,—তোমরা বলছ ভালো, আমার মন কিন্তু সায় দিচ্ছে না; বলে, অসুখ হ'লে যারা এক ডেলা মিছরী

এনে দিতেও নাক সিঁটকোয়, তারা পয়সা খরচ ক'রে মেয়েকে আবার হাওয়া খাওয়াতে পশ্চিমে নিয়ে যাবে !

কর্ত্তা এ কথায় রুষ্ট হইয়া কহিলেন,—তোমার সব বিষয়েই সংশয়। ওদের ভালোটাকেও তুমি আগে থাকতেই মন্দ ভেবে নিচ্ছ।

গৃহিণী কহিলেন,—আমি যে ঘর-পোড়া গাই, তাই যে সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরিয়ে উঠি ! তোমার কি বল না, দুটো মিষ্টি কথা শুনিয়ে দিলেই সব ভুলে যাও।

কর্ত্তা অসহিষ্ণুভাবে কহিলেন —তবে কি করতে চাও ?

গৃহিণী আর্ত্তস্বরে উত্তর দি ,—করাকরি আর কি ! মেয়ে যখন দিয়েছি, জোর ত আর নেই ; পাঠাতেই হবে। কিন্তু চিঠিখানা শুনেই আমার মন কিছুতেই সায় দিতে চাইছে না। যে নিমুক্তো সে দিন অমন ক'রে চ'লে গেলো, তার মন অমনি আজ টনটনিয়ে উঠলো—মেয়েকে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যাবার জন্যে !

কর্ত্তা ক্রুদ্ধভাবে প্রশ্ন করিলেন,—তবে কি মিছে কথা লিখেছে ?

গৃহিণী মুখখানা ম্লান করিয়া কহিলেন,—ভগবান্ জানেন।

প্রসন্নময়ী মুখে যাহাই বলুন, নির্দ্দিষ্ট দিনে যাদুধন যখন ভ্রাতৃজায়াকে লইতে আসিল, তখন কন্যা পাঠাইবার জন্য তাঁহাকে কোমর বাঁধিতেই হইল। কিন্তু ভ্রাতৃভক্ত এই অনুজটির মুখ দিয়া বহু চেষ্টা করিয়াও চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কোনও কথা বাহির করিতে পারিলেন না ; সকল প্রশ্ন সম্বন্ধেই তাহার মুখে একই সংক্ষিপ্ত উত্তর,—দাদা জানেন।

সত্যই, যাহা কিছু জানিবার দাদাই জানিত ; সরলবুদ্ধি এই প্রিয়দর্শন তরুণটি ভিতরের কিছুই জানিত না। বিচক্ষণ দাদা ও বুদ্ধিমতী দিদি তাহাদের এই কলেজের পড়ুয়া ভাইটিকে সকল বিষয়ে বিশ্বাস করিতে

পারিত না; ভ্রাতৃজায়া হাসির প্রতি এই তরুণ ছেলেটিকেই বাড়ীর মধ্যে একমাত্র সহানুভূতিশীল দেখা যাইত এবং সেই সহানুভূতি নিবিড় শ্রদ্ধায় পরিণত হইয়া বধূর চক্ষু দুইটিতে একটা অপরিসীম আনন্দের সঞ্চার করিত। কিন্তু এই পর্য্যন্ত; বধূর লাঞ্ছনার প্রতিকার সম্বন্ধে কোনো ক্ষমতাই তাহার ছিল না। উপস্থিত ক্ষেত্রেও বধূর প্রতি শ্রদ্ধাশীল এই দেবরটিকে—অনেক বুদ্ধি ব্যয় করিয়া অস্ত্রের মতই ব্যবহার করা হইয়াছিল।

দুই সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মধুপুর হইতে কোনও খবর আসিল না। মা মেয়েকে মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, যেখানেই থাকুক, সে যেন সপ্তাহে একখানি করিয়া চিঠি দেয়। ঠিকানা লিখিয়া কয়েকখানি ডাকঘরের খাম কন্যার তোরঙ্গের মধ্যে তিনি দিয়াছিলেন, কিন্তু সেও কোন সাড়া দিল না। চট্টোপাধ্যায় নিত্যই পুত্রকে তাগিদ দিতেন কন্যার খবর লইতে; মধুপুরের কোথায় বাসা লইয়াছে, কেমন আছে, সবিশেষ সংবাদ লইতে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইতেন।

অগত্যা একদিন হর্ষকুমার আফিসে কালোধনের সহিত সাক্ষাৎ করিল, একটু অনুযোগের স্বরেই কহিল,—বেশ ত, সেই থেকে কোনো খবরই নেই!

উপেক্ষার সুরে কালোধন কহিল,—খবর দেবার কি আছে বলুন!

মনে মনে বিরক্ত হইলেও মুখে সেভাব প্রকাশ না করিয়া হর্ষকুমার কহিল,—হাসিকে নিয়ে গেলে চেঞ্জে, কেমন আছে, মধুপুরের বাসার ঠিকানা, এ সব জানাবারও কি কিছু নেই! আমাদের ত জানতে ইচ্ছে হয়।

কালোধন কহিল,—সে ত মধুপুরে যায় নি।

হর্ষকুমার যেন আকাশ হইতে পড়িল, বিস্ময়ের সুরে কহিল,—সে

কি! তুমি বাবাকে ত সেই কথা লিখেই তাকে নিতে যাদুকে পাঠিয়েছিলে?

কালোধন কহিল,—হাঁ, লিখেছিলুম বটে, কিন্তু তারপর ভেবে দেখলুম, মধুপুরে পাঠাতে অনেক ঝঞ্ঝাট, তাই তাকে শান্তিপুরে পাঠানো হয়েছে।

হর্ষকুমার চমকিত হইয়া অস্ফুট স্বরে কহিল,—শান্তিপুর!

কালোধন কহিল,—শুনে যে চমকে উঠলেন! মধু সেখানে না থাকলেও শান্তি ত আছে। হাওয়া বদলানো নিয়ে কথা।

মনের রাগ মনেই চাপিয়া হর্ষকুমার কহিল,—ঐ কি শেষে তোমাদের চেঞ্জের জায়গা হ'ল! কিন্তু বাবার সঙ্গে চিঠি লিখে এ রকম শঠতাটুকু না করলেই পারতে!

কালোধন এবার নিজমূর্ত্তি ধরিল, দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল,—আপনার স্বভাবই হচ্ছে কুটুম্বের সঙ্গে ঝগড়া করা। আমার পরিবার, আমি যা ভাল বুঝেছি, করিছি, আপনি যান।

হর্ষকুমার বিচলিতকণ্ঠে কহিল,—আমি ত যাবই, কিন্তু এ অন্যায়ের জবাবদিহি একদিন তোমাকে করতে হবে, কালোধন, ভগবানের কাছে।

পুত্রের মুখে কালোধনের কথা শুনিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিছুক্ষণ কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন! তিনি যে অহর্নিশি কল্পনার দৃষ্টিতে অনুভব করিতেছিলেন, পশ্চিমে গিয়া, পাহাড়ের স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর সংস্পর্শে হাসির শীর্ণ চেহারা আবার পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে! কিন্তু এখন এ কি বিপরীত সংবাদ তাঁহার দুর্ব্বল বক্ষে শূলের আঘাত দিল! কিছুক্ষণ পরে তিনি বালকের মত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,—ওরে, আমি কি বলব? আমার তপ্ত নিশ্বাস যে ঘুরে ফিরে আমারই বুকখানা

পুড়িয়ে দেবে, হাসিকে যে তার হাতে দিয়েছি! হাসির ভালমন্দ যে কালোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রে!

প্রসন্নময়ী কহিলেন,—ওগো, আমি যে ওদের হাড়হদ্দ সব চিনে নিয়েছি, আমি যে মেয়ের মা! মেয়ের জন্যে আমাকে যে সবই ভাবতে হয়। এই যে শান্তিপুরে পাঠিয়েছে, এতেও ওদের কোনো মতলব আছে, আমি বলছি—তোমরা বরং খবর নিয়ে দেখ!

শান্তিপুরে এই পরিবারের এক নিকটাত্মীয় ছিলেন। হর্ষকুমার তাঁহাদের সাহায্যে অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারিলেন, তাহাতে প্রসন্নময়ীর অনুমানই যে সত্য, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ রহিল না।

শ্বশুরালয় হইতে ফিরিয়া কালোধন যে রাত্রে ভগিনী মনোরমার সহিত পত্নীর অপরাধের বিচার করিতে বসে, সেই সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয় কনিষ্ঠা কন্যা অনুপমার যে পত্রখানা সেখানে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাই অপরাধিনী হাসির বিচার নিষ্পত্তি করিয়া দেয়।

অনুপমা পত্রে লিখিয়াছিল,—বড়ই আতান্তরে পড়েছি, বাবা! এখনো বাইশ দিন আঁতুড়ে থাকতে হবে। এদিকে কন্না করতে কেউ নেই। শাশুড়ী তীর্থ ক'রতে গেছেন, বড় জা'এর অসুখ, পড়ে' আছেন; ছোট জা প্রথম পোয়াতি, এই দশ মাস, বাপের বাড়ী খালাস হ'তে গেছে। চাকর-চাকরাণী ম্যালেরিয়ায় ধুঁকছে। এক হাট পরিবার, গোরু বাছুর, কে যে কাকে দেখে ঠিক নেই। এখানে লোক মেলে না, ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া। ওখান থেকে শক্ত সমর্থ দেখে একটি মেয়ে লোক পত্রপাঠ না পাঠালে আমাদের কষ্টের সীমা থাকবে না—ইত্যাদি।

সেই রাত্রেই ভ্রাতাভগিনী যুক্তি করিয়া রায় দিয়াছিল,—ঠিক হয়েছে, যেমন বুড়ো মেয়েকে হাওয়া খাওয়াবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে, তেমনি দাও

তাকে পাঠিয়ে ঐ শান্তিপুরে—করুক সেখানে মাস দুই ওদের কন্না, তা হ'লেই টিট হ'য়ে আসবে।

সুতরাং মধুপুরে চেঞ্জে পাঠাইবার নাম করিয়া হাসিকে যথাবিহিত ব্যবস্থায় শান্তিপুরে অনুপমার শ্বশুরবাড়ীতে পাঠান হইয়াছিল। বাহিরের সকলে জানিল, বধূ হাওয়া বদলাইতে চলিয়াছে, কিন্তু বধূ বুঝিল, তাহার অদৃষ্টে এবার যে দণ্ডভোগের নির্দ্দেশ হইয়াছে, ফাঁসীর দণ্ড অপেক্ষা তাহা সাংঘাতিক ও মর্ম্মান্তিক!

৯

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মেয়ের মা-বাপের উপর অপ্রসন্ন হইলে ছেলের মা-বাপ মনের যত কিছু ক্ষোভ নানা আকারে যখন মেয়ের উপর নিক্ষেপ করিতে থাকেন এবং ক্রমে যখন তাহা সীমা ছাপাইয়া সাংঘাতিক হইয়া উঠে মেয়ের মা-বাপকেই তখন তাহার তাল সামলাইতে হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

হাসির দুর্ব্বল শরীরে যে গুরুভার পড়িয়াছিল, তাহার চাপে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাহার দেহের অবস্থা এরূপ অচল ও আতঙ্কজনক হইল যে, এ বাড়ীর সকলেই তাহাকে তখন দুর্ব্বিষহ ভার ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিল। অনুপমার স্বামী শ্বশুরকে লিখিল, কালোর বৌএর কঠিন অসুখ, আমাদের ভাল মনে হচ্ছে না, শীঘ্র আসুন।

পত্র পাইয়া ভ্রাতা ও ভগিনীকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতে দেখা গেল না, বরং তাহাদের মিলিত মস্তিষ্ক হইতে সময়োচিত যে যুক্তি নিষ্কাষিত হইল, তাহাতে এমন সঙ্কটকালেও তাহা সকল দিক্ দিয়াই অক্ষত রহিল।

পরদিনই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জবানী দেওয়া যে পত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তগত হইল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ ;—বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য বধূমাতাকে শান্তিপুরে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার শ্বশুরালয়ে পাঠানো হইয়াছিল। কিন্তু নিজের জেদ ও একগুঁয়েমী স্বভাবের জন্য তিনি সারিতে পারিলেন না। বর্ত্তমানে তাঁহার অবস্থা খুবই খারাপ। যদ্যপি আপনি কন্যাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া নিজের ব্যবস্থামত চিকিৎসা করাইতে ইচ্ছুক থাকেন, আমার কোনও আপত্তি নাই।

এরূপ নির্দ্দেশ পাইয়া কোন্ পিতা-মাতা স্থির থাকিতে পারেন? এ অবস্থায় অপরপক্ষের বিচার বিবেচনা বা দোষের কথা মনে স্থান পায় না, কন্যাকে বাড়ীতে আনিয়া চিকিৎসা করাইবার অনুমতিটুকু দিয়া যে অনুগ্রহ তাঁহারা করিয়াছেন তাহাতেই যেন কৃতকৃতার্থ হইয়া সেই দিনই চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া কন্যাকে শান্তিপুর হইতে নিজের আলয়ে আনাইলেন।

হাসিকে দেখিয়া সকলেই কাঁদিয়া উঠিলেন! তাহার দেহের মধ্যে প্রাণটুকুই শুধু তখনও ধুক্ ধুক্ করিতেছিল। প্রসন্নময়ী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন,—কি অপরাধ আমরা তোমাদের করেছিলুম, যার জন্যে আমার হাসিকে তোমরা এমন ক'রে হত্যা করলে!

হাসি অতি কষ্টে দুই চক্ষুর দৃষ্টি মেলিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিল,—কেন আমার বিয়ে দিয়েছিলে, মা!

মা আবার হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

সর্ব্বস্ব পণ করিয়া হাসিকে ফিরাইবার জন্য চিকিৎসা চলিল, সঙ্গে সঙ্গে শান্তি স্বস্ত্যয়ন পূজা পাঠ আরও কত মঙ্গল অনুষ্ঠান হইতে লাগিল তাহার আরোগ্য-কামনায়।

ভট্টাচার্য্য-মহাশয় একদিন বধূকে দেখিতে আসিলেন; যাইবার সময় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আশ্বাস দিয়া গেলেন, ভয় নেই বেয়াই, বৌমা সেরে উঠবেনই; আমি নিত্য নারায়ণের মাথায় তুলসী দিচ্ছি যে ওঁর কল্যাণে!

পাছে কলহ বাধে, কোনও কিচিকিচি হয়, হাসির জন্য শাস্তিকার্য্য বাধা পায়, এই সব ভাবিয়া এ বাড়ীর কেহ কোনওরূপ অপ্রিয়-প্রসঙ্গ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট তুলে নাই।

দীর্ঘ দুইটি মাস ধরিয়া ব্যয়বহুল চিকিৎসা ও দেবতার দ্বারে ধর্ণা দেওয়া অবশেষে সার্থক হইল। হাসি এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল। তাহার কান্তিহীন দেহে আবার লাবণ্যের সঞ্চার হইল, রক্তশূন্য পাণ্ডুর মুখখানি পুনরায় পুরন্ত ও আরক্ত হইতে দেখা গেল, শীর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিপুষ্ট হইতে লাগিল; কিন্তু তাহার স্বাস্থ্য ফিরিলেও বিকারবিহীন আনন্দের সঞ্চার তাহাতে হইল কি?

বাড়ীর সকলেরই দৃঢ় পণ, হাসিকে আর কিছুতেই শ্বশুরবাড়ীতে পাঠানো হইবে না। কথাটা হাসির কানে প্রবেশ করিলেই তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির একটা ক্ষীণরেখা ফুটিয়া উঠে। সকলেই দেখে, মধ্যে মধ্যে সে যেন সহসা চমকিত হয়, কি একটা ভীষণ আতঙ্ক তাহাকে যেন পরিবেষ্টন করিয়া ঘুরিতে থাকে। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কোনও উত্তরই তাহার নিকট হইতে আসে না।

তিন মাস পূর্ণ হয়, এমন সময় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহদ্বারে একখানা মোটর আসিয়া দাঁড়াইল এবং পরক্ষণে ছোট একটি বালকের হাত ধরিয়া এক তরুণী বিধবা বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

উঠানের সম্মুখে দরদালানে বাড়ীর মেয়েরা প্রায় সকলেই তখন

উপস্থিত, অপরিচিতা মেয়েটির দিকে সকলেই স-প্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতেই, হাসি তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তাহার পদধূলি লইল।

দুইটি অঙ্গুলি দিয়া হাসির চিবুকটি স্পর্শ করিয়া মেয়েটি কহিল,—বা, বেশ সেরেছ ত দেখছি! তা সারবে না, বাবা কি তোমার জন্যে সোজা মেহনত করেছেন। সব কাজকর্ম্ম ছেড়ে তোমার কল্যাণে শুধু ঠাকুর দেবতার কাছে হত্যে দিয়ে পড়েছিলেন; কত শান্তি, কত স্বস্ত্যেন, কত কি হোম-যাগ, যা হোক, মুখ যে তাঁর ভগবান্ রেখেছেন—সেই ভালো!

তখন আর কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না—এই অপরিচিতাটি কে! প্রসন্নময়ী ছুটিয়া আসিয়া মনোরমার হাতখানি সযত্নে ধরিয়া দালানে লইয়া গিয়া আসনে বসাইলেন; হাসি-মুখে কহিলেন,—কি ভাগ্য আমার, তুমি এসেছ, মা!

হাসি সঙ্গের ছেলেটিকে আদর করিয়া কাছে টানিয়া লইল, ছেলেটি তাহারই এক দূরসম্পর্কীয় ভাসুরের পুত্র।

মেয়েরা সকলেই মনোরমাকে ঘিরিয়া বসিল, সকলেরই সকৌতুক দৃষ্টি এই মেয়েটির মুখের দিকে। যাহার তর্জ্জনীর ইঙ্গিতে ভট্টাচার্য্য-পরিবার চালিত, কূটবুদ্ধির তীক্ষ্ণ শায়ক নিক্ষেপ করিয়া যে প্রতিপক্ষের সকল প্রয়াস ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়, যাহার জিহ্বা দিয়া বিষের প্রবাহ বাহির হয়,—এমন কত কথাই যাহার সম্বন্ধে শুনা গিয়াছে, সেই ভীষণ প্রকৃতির মেয়েটি আজ তাহাদেরই বাড়ীতে তাহাদেরই সম্মুখে উপস্থিত।

কিন্তু উঠানে হাসিকে দেখিয়া মেয়েটি যে কয়টি কথা হাসিকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছিল, তাহাতেই বর্ষীয়সীরা তাহাকে স্পষ্টভাবেই চিনিয়া ফেলিয়াছিলেন। নিজেদের অত বড় অপরাধ ও ত্রুটিগুলি এভাবে এক নিশ্বাসে নিশ্চিহ্ন করিতে তাহার কথা প্রয়োগের এই কৌশলটুকু

কি চমৎকার! অনেককেই বিস্ময়ে গালে হাতটি তুলিয়া অবাক্ হইতে হইয়াছিল।

দালানে আসিয়া মেয়েটি এমন নম্রভাবে শিষ্টাচারের পরিচয় দিল, বয়স্থাদের পদধূলি লইয়া—অতি পরিচিতের মত নানা কথার অবতারণা করিল, তখন কে বলিবে—এই মেয়েটির মুখ দিয়া বিষ ঝরে, ইহার হৃদয় নাই, আক্কেল বিবেচনা নাই, কোনও রূপ দরদ ইহার চিত্তটি অধিকার করিতে পারে নাই!

কত কথাই সে কহিয়া চলিল; এ বাড়ীর সকলে যে-সকল অতি-পরিচিত কথা নিছক মিথ্যা বলিয়া জানে, সেগুলির উপর একটা চমকপ্রদ আবরণ দিয়া কেমন নূতন করিয়াই সে ব্যক্ত করিল; নিজের অদৃষ্টের কথা শ্বশুরবাড়ীর সংস্রব ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে অবস্থিতির কারণ—এমনভাবে সে বর্ণনা করিল, যেন সকল দোষই তাহার শ্বশুরের এবং তাহার সত্যনিষ্ঠা, মনের দৃঢ়তা ও নারীত্বের মর্য্যাদা রক্ষায় পটুতার অন্ত নাই। এই অপূর্ব্ব আখ্যানটার উপসংহারও সে এইভাবে করিল,—তবুও বলছি মা, শ্বশুর যত দোষই করুন, যত বড় অন্যায়ই আমার সম্বন্ধে তিনি ক'রে থাকুন, কিন্তু আজ যদি তাঁর বাড়ীর একটা কাক-চিলও তাঁর হ'য়ে এসে আমাকে ডাকে, বলে—বৌমা, তুমি চলো; আমি কিছুতেই 'না' বলবো না।

সকলেই অতি বিস্ময়ে মনোরমার কথা শুনিতেছিল। এইবার কথার পিঠে মনোরমা যে কথা অতি সহজভাবেই কহিল, তাহাতে তৎক্ষণাৎ অভিভূতাদের মোহ কাটিয়া গেল এবং মনোরমার এই আকস্মিক উপস্থিতির উদ্দেশ্যও স্পষ্ট হইয়া পড়িল। মনোরমা কহিল,—হ্যাঁ, এবার তা হ'লে বাবার কথাটাই বলি মা, তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, হাসিকে নিয়ে যাবার জন্যে। নিজেই আসতেন, আসবার ইচ্ছাও খুব ছিল; কিন্তু তবু

তাঁর মনে ঝোঁক চাপলো—আমিই এসে হাসিকে নিয়ে যাই, আর এই সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয়ও হ'য়ে যায়।

সঙ্গীতমুখরিত জনপূর্ণ আসরে সহসা যেন কোনও দুর্ঘটনা আত্মপ্রকাশ করিল! মনোরমার মুখের নানা কথা এতক্ষণ সকলেই শুনিতেছিলেন, কেহও কল্পনাও করিতে পারেন নাই, শেষে এই প্রস্তাবই সে করিয়া বসিবে। হাসি কিন্তু ননদিনীকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিল, কি অভিপ্রায়ে তাঁহার আগমন! সর্ব্বক্ষণ এই সম্ভাবনাই দুঃস্বপ্নের মত তাহাকে উন্মনা করিয়া রাখিত। কথায় বলে, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে! মনোরমাকে দেখিবামাত্র হাসি বুঝিয়াছিল, সে আসিয়াছে কেন—এবং ইহাদের কথা-বার্ত্তার সময় কখন্ যে অতি সন্তর্পণে উঠিয়া গিয়াছিল, কেহ তাহা লক্ষ্য করিবারও অবসর পায় নাই!

প্রস্তাবটা প্রসন্নময়ীকেই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের আঘাত দিয়াছিল এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথমে সে আঘাত অগ্রাহ্য করিয়া দৃঢ়তার সহিত কহিলেন,—হাসিকে নিয়ে যাবার কথা এখন মুখেও এনো না বাছা, ওকে আমরা এখন পাঠাবো না।

তখনই শান্ত নির্ম্মল আকাশে দেখা দিল কাল-বৈশাখীর মেঘ; সকলে চাহিয়া দেখিল, মনোরমার মুখখানাও একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে, কি কদর্য্যতাই তাহার ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিতেছে!

কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া প্রসন্নময়ী যেমন মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, মনোরমাও ঠিক সেইভাবেই তাঁহার কৈফিয়ৎ চাহিল,—মেয়ে পাঠাবেন না—এর মানে?

মনের ভিতর যে বাধাটুকু এতক্ষণ অতীতের নানা অপ্রিয় প্রসঙ্গকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, মনোরমার মুখের দুইটি কথায় তাহা ভাঙিয়া কোথায়

অদৃশ্য হইয়া গেল ; তখন মর্ম্মপীড়িতা মাতৃহৃদয়ের নিদারুণ উচ্ছ্বাস বন্যার জলোচ্ছ্বাসের মত বাহির হইয়া মনোরমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

কিন্তু মনোরমাও হঠিবার পাত্রী নহে, তাহার তূণে যে সকল কল্পিত শর পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত ছিল, সেগুলি বর্ষণ করিয়া সে এ পক্ষকে ধরাশায়ী করিতে প্রচণ্ডার মত দাঁড়াইল।

এই সাংঘাতিক সময়ে একটি পরিচিত দৃঢ়-গাঢ় স্বর উভয়পক্ষকেই স্তব্ধ করিয়া দিল! সকলেই চমৎকৃত হইয়া চাহিয়া দেখিল—হাসি সাজিয়া গুজিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং মায়ের দিকে চাহিয়া কহিতেছে—মা, চুপ করো ; আমি দিদির সঙ্গে যাবো!

সেই হাসি, সেই মাতৃগতপ্রাণ আদরের কন্যা! কিশোর বয়স পর্য্যন্ত যে একটি দণ্ডও মায়ের সঙ্গছাড়া হইয়া থাকিতে পারিত না! তিন মাস পূর্ব্বেও শান্তিপুর হইতে শয্যাশায়িনী অবস্থায় যাহাকে এ বাড়ীতে আনা হইয়াছিল, মায়ের বুকের রক্ত জল হইয়া যাহার সম্বিৎশূন্য দেহে নবজীবনের প্রেরণা দিয়াছিল! সেই হাসি আজ মায়ের মর্ম্মবেদনা কিছুমাত্র অনুভব না করিয়া মায়ের বাধা দিবার দৃঢ় প্রয়াসকে শিথিল করিয়া নিঃসঙ্কোচে কহিতেছে—মা, তুমি চুপ করো, আমি যাবো!

মনের সমস্ত রোষ, অভিমান, বিদ্বেষ, আক্রোশ, বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া মায়ের মুখ দিয়া হাহাকারের মত বাহির হইল,—হুঁ, তাত যাবেই, যাবে না? কিন্তু মা, তিন মাস আগে মনের এ জোর কোথায় ছিল?

মেয়ের মনের ভিতর তখন কি হইতেছিল, কোন্ সমুদ্রের উদ্দাম তরঙ্গ সবেগে নৃত্য করিতেছিল, কিরূপ প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝা তাহার দেহমন দলিয়া দিতেছিল, কে তাহা বুঝিবে! সকল আক্রমণ সবলে দমন করিয়া মর্ম্মভেদী ভাষায় শুধু সে উত্তর দিল,—তুমি যে মা, কোল ত তোমার আছেই, কিন্তু

তোমাদের কাছে থেকে অহরহ কষ্টের হেতু আর হ'তে চাই না, তাই সেখানে চলেছি!

চক্ষুর অশ্রু অঞ্চলে মুছিয়া মনের অপ্রসন্নতা সবলে রুদ্ধ করিয়া তখনই প্রসন্নময়ীকে মেয়ে পাঠাইবার জন্য কোমর বাঁধিতে হইল।—বাড়ীশুদ্ধ সকলকে কাঁদাইয়া ননদের সহিত হাসি গাড়ীতে উঠিল, অশ্রুর উদ্দাম আবর্ত্ত প্রাণপণে সে রুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইলেও তাহার ভাগ্যাকাশে কাল-বৈশাখীর যে দুর্য্যোগ ঘনাইয়া উঠিতেছিল এবং তাহারই ভিতর দিয়া অদৃষ্ট-দেবতার যে প্রতিক্রিয়ার সূচনা ছায়াচিত্রের মত ধীরে ধীরে প্রতিফলিত হইতেছিল, তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর সে পাইয়াছিল কি?

অদৃষ্টের ইতিহাস

তৃতীয় অধ্যায়

সাধনা

১

সহরের নামী এটর্ণী রামকমল মিত্রের কৃতী পুত্র অবনীনাথের সহিত সেয়ার মার্কেটের ধনী কর্ম্মী দিবাকর বসুর বিদুষী কন্যা সুধার বিবাহ-সম্ভাবনা যেমন একদা আকস্মিকভাবে পাকা হইয়া গিয়াছিল, তেমনই একদিন সহসা অপ্রত্যাশিতভাবেই ভাঙিয়া গেল।

এই দুইটি অপরিচিত পরিবারের মধ্যে যে সূত্রে যোগাযোগ ঘটে, তাহা যেমন সুখশ্রাব্য, বৎসরব্যাপী মিলনানন্দের পর হঠাৎ যাহা ভেদ-বিচ্ছেদের হেতু হইয়া উঠে, সে আখ্যানটিও তেমনই ব্যথাপ্রদ।

তখনও দিবাকর বসু সেয়ার মার্কেটের সিংহবিশেষ। মুখের একটা কথাতেই লাখোটাকার কাজ চলে, বড় বড় দালালরা সর্ব্বক্ষণই তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকে; সর্ব্বত্রই সুনাম; আয়ের অন্ত নাই, ব্যয়েরও সীমা নাই। যেখানে পঞ্চাশে কাজ সমাধা হইতে পারে, সেখানে তিনি নির্ব্বিচারে পাঁচশো ঢালিয়া দিতে কুণ্ঠিত নহেন! বাড়ীর পর বাড়ী কিনিতেছেন, গাড়ীর পর গাড়ী, রাজার মত আড়ম্বরে থাকেন; ডি, বোসের নাম ভাগ্যান্বেষীদের জপমালা, আকাশ-বৃত্তির পাণ্ডারা প্রাতঃকালে উঠিয়াই তাঁহার নাম নিষ্ঠাসহকারে স্মরণ করে—ভাগ্যোদয়ের সম্ভাবনায়,—এমনই তখন তাঁহার সুসময় চলিয়াছে।

সেবার পূজার সময় দিবাকরবাবু সপরিবার চুণার যাইতেছিলেন। যে এক্সপ্রেসখানি প্রত্যূষেই চুণার ষ্টেশনে ধরে, তাহারই পাশাপাশি দুইখানি উচ্চশ্রেণীর কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ করিয়া তাঁহার এই যাত্রার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী কমলা এবং তরুণী কন্যা সুধা;

পার্শ্বের কম্পার্টমেণ্টখানি প্রায় খালিই ছিল, এক তক্‌মাধারী চাপরাসী উক্ত কামরায় সন্নিবেশিত মালপত্রগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিল বসু মহাশয়ের কিশোরবয়স্ক পুত্রদ্বয় কয়েকদিন পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে মাতুলালয়ে গিয়াছে, দিদিমা, মাতুলানী ও মাতুলকন্যাকে লইয়া বর্দ্ধমান হইতে তাঁহাদের এই ট্রেণে উঠিবার কথা। সেই জন্যই পার্শ্বের কামরাটি হাওড় হইতে রিজার্ভ করা হইয়াছিল।

ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে ট্রেণখানি থামিতেই ইঁহাদের কামরাটির অপর পার্শ্বের দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি কম্পার্টমেণ্টের আরোহীরা রীতিমত কোলাহল তুলিয়া প্লাটফরমে নামিয়া পড়িলেন; সঙ্গে সঙ্গে তারস্বরে কুলী, ষ্টেশনমাষ্টার ও ডাক্তারের আহ্বান হইল। এক্ষেত্রে ষ্টেশনের সহিত ট্রেণখানির আরোহীদের উৎসুকদৃষ্টি এদিকে পড়িবারই কথা। ভিতরের ঘটনাটাও তৎক্ষণাৎ জানা গেল। ব্যাপারটি এই যে, ট্রেণ হাওড়া হইতে ছাড়িবার কিছুক্ষণ পরেই ঐ কামরার আরোহীরা জানিতে পারেন যে, তাঁহাদেরই এক মাড়োয়ারী সহযাত্রী সংক্রামক বিসূচিকা-ব্যাধি গোপন করিয়া গাড়ীতে উঠিয়াছে এবং তাহার শোচনীয় অবস্থা তাঁহাদিগকে ত্রস্ত ও অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

কর্ত্তৃপক্ষদের ব্যবস্থায় উক্ত কামরাখানি তৎক্ষণাৎ ট্রেণ হইতে বিচ্ছিন্ন ও ব্যাধিগ্রস্ত যাত্রীটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল বটে, কিন্তু আর একখানি খালি কম্পার্টমেণ্ট তাহার স্থানে যোজনার সুব্যবস্থা সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। অগত্যা বিচ্ছিন্ন কামরার আরোহীদিগকে লটবহর লইয়া বিভিন্ন কামরায় আশ্রয় লইতে ছুটিতে হইল; কিন্তু এক অতিরিক্ত স্থূলকায় আরোহীকে এ অবস্থায় অতিশয় বিব্রত দেখা গেল। ষ্টেশনমাষ্টারের সহিত আইনের তর্কসূত্রে তিনি অন্যত্র স্থান-সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত সময়টুকুর

মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা নিষ্ঠুরের মত তাঁহাকে জানাইয়া দিল—এক্ষেত্রে তর্ক কিরূপ নিষ্ফল! তখন তাঁহাকে নিরুপায়ের মত ছুটিতে হইল প্লাটফরমের যে স্থানটিতে লগেজপত্র লইয়া তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র আদেশপ্রতীক্ষা করিতেছিল।

ট্রেণশুদ্ধ সকলেই বুঝিলেন, ভদ্রলোক বুদ্ধির দোষে ট্রেণটা 'মিস্' করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতে দিবাকর বসু নিজের কামরার দরজাটি খুলিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে সাদর আহ্বান করিলেন। ভদ্রলোকটি হাত নাড়িয়া স্ত্রী-পুত্রকে হুকুম দিলেন,—উঠে পড়—শীগ্ গির উঠে পড়।

দিবাকরবাবু ও তাঁহার স্ত্রী-কন্যার সময়োচিত সহায়তায় ভদ্রলোকের স্ত্রী ও পুত্র উঠিলেন, মালপত্রাদিও উঠিল এবং বিপুল প্রয়াসে যখন তাঁহাকেও কামরার মধ্যে টানিয়া তোলা হইল, তখন অজগর দেহখানা নাড়া দিয়া এক্সপ্রেস ট্রেণ ধীরমন্থরগতিতে অগ্রসর হইয়াছে।

এই স্থূলকায় ভদ্রলোকটিই বিখ্যাত এটর্ণী রামকমল মিত্র।

২

ব্যাণ্ডেল হইতে বর্দ্ধমানের মধ্যেই আগন্তুকদের সহিত দিবাকরবাবু এবং তাঁহার স্ত্রী-কন্যার পরিচয় ও সদ্ভাব এমনই নিবিড় হইয়া উঠিল যে, উভয় পক্ষই ব্যাণ্ডেলের দুর্ঘটনাকে তাঁহাদের এই অপ্রত্যাশিত শুভসংযোগের উপলক্ষ ভাবিয়া উল্লাস প্রকাশেও কুণ্ঠিত হইলেন না।

দুই পরিবারের দুই কর্ত্তা যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ছিলেন পরস্পর

অপরিচিত, কিন্তু নাম-সম্পর্কে উভয় নামজাদাই যে উভয়ের সংবাদ রাখিতেন, প্রথম আলাপেই তাহা স্পষ্ট প্রকাশ হইয়া পড়িল।

দিবাকরবাবু কহিলেন,—অনেক দিন থেকেই আপনার সঙ্গে আলাপ করবার বাসনা, কিন্তু হ'লে কি হয়, কাজের ঝঞ্ঝাটে ঘ'টে ওঠে নি; আজ দেখছি, ঐ য়্যাক্‌সিডেণ্টটাই এভাবে যোগাযোগ ক'রে দিলে!

রামকমলবাবু কহিলেন,—যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী! সেয়ার মার্কেটের রাজা আপনি, বাঙালী—বিশেষ কলকেতার এক কুলীন কায়েতের এতটা প্রতিপত্তি আর শ্রীবৃদ্ধির কথা শুনে কত বার ভেবেছি, একবার আলাপ ক'রে আসি; কিন্তু পেশা যার এটর্ণীগিরি, তার ফুরসদ মেলাই মুস্কিল! এখন তাই ভাবছি, আমাদের কিছুতেই হাত নেই। এই দেখুন না, মাড়োয়ারীটা যে কলেরা ক'রে বসেছে, আমার চোখেই প্রথম ধরা পড়ে; তখন কি কাণ্ডই না বাধিয়েছিলুম! অথচ দেখুন, ঐটিই উপলক্ষ হ'ল আমাদের আলাপের!

যা বলেছেন, আমাদের হাত কিছুতেই নেই, সবই তাঁর ইচ্ছায় হয়। এই আমার কথাটাই ধরুন না, কলেজে যখন পড়ি, সেয়ার মার্কেটের ওপর তখন কি ঘেন্না! ভাবতুম, স্পেকিউলেশন করা আর আগুন নিয়ে খেলা—একই কথা, ব্যবসা এটা ত নয়ই—বরং উৎসন্নের পথে নামবার থিওরী; কিন্তু এমনি মজা, কলেজ থেকে বেরিয়েই আমার এক মামার পাল্লায় পড়ে, এই পথেই পাড়ি দিতে হ'ল!

রামকমলবাবু কহিলেন—দেখুন, আমার এই তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, পথই বলুন, আর পেশাই বলুন, কোনটাই ক্যাল্‌না নয়, পয়সা প'ড়ে আছে সব রাস্তাতেই, কিন্তু কুড়িয়ে নেবার মত হিম্মত চাই।

তবে কি আপনি বল্‌তে চান, সব পেশাই পয়সা দেয়—যে কোনো পথেই উপার্জ্জন হয় ?

হয়। অবশ্য, যদি ঠিক শক্ত হ'য়ে তাতে মন লাগানো যায়,—যাকে বলে, ষ্ট্রীক্‌ট্‌নেস্‌! যে কোনো কাজেই লেগে পড়ুন না কেন, যদি সেই কাজের ওপর আপনার শ্রদ্ধা থাকে, মনে এইটুকু জোর থাকে যে—ওতেই আপনি বড় হবেন, তা হ'লে আপনার সিদ্ধি অনিবার্য্য।

দিবাকরবাবুর মনে বরাবরই একটা অহঙ্কার ছিল যে, যে অনিশ্চিত পেশায় পা দিয়া পৌনে ষোল আনা লোক উৎসন্নের পঙ্কে তলাইয়া যায়, একা তিনিই ভাগ্যের জোরে সেই পেশা অবলম্বন করিয়া আদর্শ কৃতী পুরুষ হইয়াছেন! কিন্তু রামকমলবাবুর মুখে পেশা সম্বন্ধে এইরূপ প্রশস্তি শুনিয়া তাঁহার অহঙ্কারে একটু আঁচড় পড়িল; কাজেই প্রতিবাদের সুরে প্রশ্ন করিলেন,—আপনি তা হ'লে বল্‌তে চান, কোনও পেশাই ফ্যাল্‌না নয়? ধরুন, ছোট রকমের পেশাতেও ভাগ্য ফেরানো যায়, বা যে সব পেশায় ভীষণ ঝক্কি আর দারিদ্র্য, তাতেও শ্রদ্ধার সঙ্গে লেগে পড়লে লোকে অদৃষ্ট ফেরাতে পারে ?

রামকমলবাবু কহিলেন,—পারে। তবে একটা কথা, তার সব দিকেই আঁটা-আঁটি কড়া-কড়ি থাকা চাই। আপনি বোধ হয় জানেন, আমাদেরই জাতীয় এক কুলীন কায়েত রাস্তার নেকড়া কুড়ানোর ব্যবসা শ্রদ্ধার সঙ্গে চালিয়ে একজন নামজাদা বড়লোক হয়েছিলেন।

দিবাকর বাবু কহিলেন,—তাঁর নাম সবাই জানে। আপনার এই দৃষ্টান্তটি চমৎকার!

আরও দুটো নজীর আপনাকে দিচ্ছি;—এক পয়সা পেয়ালার চা

বেচে কল্‌কেতা সহরে তিন চারখানা বাড়ী করেছে, এমন লোকের সন্ধানও আপনাকে দিতে পারি!

দিবাকরবাবু কহিলেন,—আমি এ কথা শুনেছি, আপনার কথায় অবিশ্বাস করবার কিছু নেই।

আর, যে পেশায় অনেকেই উৎসন্নে গেছে, সেই পেশাটাই নিষ্ঠার সঙ্গে চালিয়ে ভাগ্য ফিরিয়েছে,—এর দৃষ্টান্তও ত কলকেতা সহরে আমাদের চোখের ওপর রয়েছে দিবাকরবাবু! ধরুন, এই থিয়েটারের পেশা; কত বড় বড় ধনী এতে নেমে সর্ব্বস্ব খুইয়ে ফকির হ'য়ে গেছে; আবার একজন এই পেশায় আমীর হয়ে উঠেছেন, তাও ত দেখেছি; অথচ, তাঁকে আমীরী করতে কখনো কেউ দেখেনি; দেখেছে—দেশের নানা অনুষ্ঠানে তাঁর প্রচুর দান, কাশীতে তাঁর হাতে গড়া বিরাট প্রতিষ্ঠান—বাঙালী ধর্ম্মশালা। এই সর্ব্বনেশে পেশাতেও তিনি সিদ্ধি পেয়েছিলেন এই জন্য যে, তাঁর মনে বিশ্বাস ছিল, এতেই তিনি বড় হবেন; আর সব চেয়ে বড় কথা এই যে, পয়সার ওপরও তাঁর ছিল রীতিমত দরদ!

শেষের কথা কয়টি যদিও প্রাসঙ্গিকভাবেই রামকমলবাবু কহিলেন, কিন্তু সেগুলি খোঁচার মতই দিবাকরবাবুর চিত্তের যথাস্থানে যথাযথভাবে আঘাত দিল। যে লোকটির দৃষ্টান্ত তুলিয়া রামকমলবাবু প্রতিষ্ঠার নির্দ্দেশ দিলেন, তাঁহার অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, মিতব্যয়িতা ও বিলাস-ব্যাপারে অবহেলা যে একটা উপমার স্থল, তাহা অস্বীকার করা চলে না; উভয়েরই 'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে'র পেশা; উভয়েই ইহাতে সিদ্ধকাম হইয়াছেন, লক্ষ্মী লাভ করিয়াছেন; কিন্তু জীবনযাত্রার আড়ম্বর ও ব্যয়-বাহুল্য বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কত ব্যবধান!

তথাপি রামকমলবাবুর বিজ্ঞজনোচিত নির্দ্দেশ সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিল; এমন কি, দিবাকরবাবুর সহধর্ম্মিণী কমলা এবং কন্যা সুধা পর্য্যন্ত রামকমলবাবুর স্ত্রী অনুপমার সহিত আলাপের মধ্যেও কথাগুলি শ্রদ্ধার সহিত শুনিল ও মনে মনে সমর্থন করিল। অর্থ উপার্জ্জনে দিবাকরবাবু সিদ্ধহস্ত হইলেও, উপার্জ্জিত অর্থের উপর যে তাঁহার কিছুমাত্র দরদ নাই এবং এই দরদটুকুর যে বিশেষ দরকার, এতকাল পরে ট্রেণের এই কামরার মধ্যে বর্ষীয়ান্ নবাগতের নির্দ্দেশে যেন তাঁহারা এই প্রথম উপলব্ধি করিতে পারিলেন।

আলাপ কোন্ পথে গড়াইয়া চলিয়াছে তাহা বুঝিবামাত্রই দিবাকরবাবুও তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গটির মোড় ঘুরাইয়া দিলেন। বেঞ্চের এক কোণে যে ছেলেটি অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া টাইম্‌টেবলের পাতা উল্টাইতেছিল, তাহার দিকে চাহিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন,—এইটি বুঝি আপনার ছেলে?

রামকমলবাবু হাসিমুখে উত্তর দিলেন,—আজ্ঞে, হাঁ।

দিব্য ছেলেটি আপনার,—দেখতে-শুনতে চমৎকার! পড়াশুনা করছেন নিশ্চয়ই?

কলেজের পড়াশুনা গেল বছর ওর শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন চলেছে এটর্ণী-সিপের সাধনা।

বলেন কি,—এই বয়সেই এতদূর এগিয়েছেন বাবাজী! বাঃ! কিন্তু বয়স ত'—

এখন তেইশ চলছে; বাইশ বছরেই বাবাজী এম-এ পাশ ক'রে বেরিয়েছেন!

যদিও ইতঃপূর্ব্বেই 'বাবাজী'র প্রতি এই কামরার প্রত্যেকের দৃষ্টি সাধারণভাবেই পড়িয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার বিদ্যার এই মাপকাঠিটি

যেন তর্জ্জনী-নির্দ্দেশে তাহার দিকে কামরার আরোহী ও আরোহিণীদের চক্ষুগুলির সপ্রশংস-দৃষ্টি নূতন করিয়া বিশেষভাবে আকর্ষণ করিল।

আত্মপ্রশংসায় অবনীর সুগৌর মুখখানিও আরক্তিম হইয়া উঠিল, কেতাবের পাতায় লিপ্ত দৃষ্টিটুকু গবাক্ষ-পথে বাহিরের প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-দর্শনের উদ্দেশ্যে তুলিতেই, আর একখানি বেঞ্চির অপর কোণে তাহারই সমান্তরালে উপবিষ্টা সৌন্দর্য্যময়ী তরুণী সুধার দীর্ঘায়ত দুইটি চক্ষুর উজ্জ্বল দৃষ্টির সহিত সহসা সংঘাত হইয়া গেল!

রামকমলবাবুর প্রশ্নের উত্তরে দিবাকরবাবু তখন বলিতেছিলেন,—হাঁ, এইটি আমার মেয়ে; দেখতে যতটা বাড়ন্ত, বয়স সে হিসেবে কম; আপনার কত মনে হয় বলুন ত'?

বছর উনিশ হবে আর কি!

না; সতেরো চলছে; ঠিক ষোল বছরে মা-আমার ম্যাট্রিক পাশ করেন কি না, তাই বয়সটা আমার মনে আছে; তারপর একটি বছর কেটেছে বই ত' নয়—

এখনও পড়ছেন?

না,—মশাই; আমার ত' ইচ্ছে ছিল, বি-এ পর্য্যন্ত পড়ে, কিন্তু ওর মতি-গতি আলাদা; পড়ার চেয়ে ছবির দিকে ঝোঁক ওর বেশী। বলে, পড়ে কি করব বাবা, তার চেয়ে ছবি আঁকলে বরং কিছু কাজ হবে।

তা হ'লে বুঝি আর্ট কলেজেই দিয়েছেন?

আমার সেই ইচ্ছাই ছিল, কিন্তু আমার গৃহিণীর তাতে ভারি বিরাগ। কো-এডুকেশনের ইনি ভয়ঙ্কর বিরোধী; বলেন, ছবি আঁকা শেখবার আলাদা ইস্কুল যখন মেয়েদের নেই, তখন ও-রাস্তাও ওর পক্ষে বন্ধ। অগত্যা এক ইটালীয়ান লেডী আর্টিষ্টকে এন্‌গেজ করতে হয়েছে;

প্রত্যহ দু' ঘণ্টা তিনি শেখান, আর তার জন্য দক্ষিণা নেন মাসে দেড় শো !

বলেন কি !—দেড় শো টাকা মাইনে দিয়ে মেয়েকে ছবি আঁকা শেখাচ্ছেন !

দিবাকরবাবু সহযাত্রীর এই অতিবিস্ময়ে মনে মনে প্রসন্ন হইয়া হাসিমুখে কহিলেন,—কিন্তু ওর হাতের আঁকা ছবি যদি একখানা দেখেন আপনি, তখন আপনাকে মানতেই হবে যে, খরচটা বেশী হলেও ঠিক অপব্যয় হয় নি !

দেহের সমস্ত রক্ত-ধারাই বুঝি ধমনী-মুখে ঠিক এই সময় সুধার সুন্দর মুখ-মণ্ডলে ছুটিয়াছিল !

আলাপ ক্রমশঃ নিবিড় হইয়া উঠিতেই উভয় পক্ষের সকল পরিচয়ই সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইল। দিবাকর বসু বুঝিলেন,—তাঁহার সহযাত্রী যত বড় নামজাদা এটর্ণী হউন না কেন, সংসারটি তাঁহার খুব বড় নয় ; তিনটি কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, ছেলেটিকে উচ্চ শিক্ষা দিয়া নিজের পেশায় পোক্ত করিয়া লইতেছেন ; কন্যাদের বিবাহে ও পুত্রের শিক্ষায় যে প্রচুর ব্যয় করিয়াছেন, কৃতবিদ্য পুত্রটির বিবাহসূত্রে তাহার উসুল না হওয়া পর্য্যন্ত সকল খরচই কমাইয়া দিয়াছেন। এই যে চুণারে চলিয়াছেন, তাহাও নিজের ইচ্ছায় বা অতিকষ্টে উপার্জ্জিত অর্থের অপব্যয়ে নহে— তাঁহারই এক মক্কেলের স্বার্থের অনুরোধে তাহারই সর্ব্ববিধ ব্যবস্থায় তাঁহার এই প্রথম প্রবাস-যাত্রা ! মক্কেল সেখানে বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, ভোজের ব্যবস্থাও সে-ই করিবে, গাড়ীর মাশুলও তাহাকে যোগাইতে হইয়াছে ; বরং এই সূত্রে কিছু অর্থও তাঁহার পকেটে উঠিয়াছে, যথা— একখানি পূরা কম্পার্টমেণ্ট 'রিজার্ভ' করিবার ভাড়া মক্কেলের নিকট

হইতে আদায় করিয়া, তিনখানি টিকিটের উপর দিয়াই তিনি এ কার্য্যটুকু সমাধা করিয়াছেন! অকপটে এই ভাবে নিজের অর্থগত মনোবৃত্তি ব্যক্ত করিয়া রামকমলবাবু বিজ্ঞের ভঙ্গীতে যুক্তি দিলেন,—টাকার মত শক্ত না হ'লে টাকাকে ধ'রে রাখতে পারা যায় না, দিবাকরবাবু!

পক্ষান্তরে রামকমলবাবুও এই ভাবে তাঁহার সহযাত্রীর পরিপূর্ণ পরিচয় পাইলেন,—ঘটা করিয়া খরচ করাই এই মানুষটির স্বভাব এবং ইহা তাঁহাকে নেশার মত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। বড় ছেলেটিকে জার্ম্মাণীতে পাঠাইয়া তাহার পেছনে যে পরিমাণে টাকা ঢালিতেছেন, ছেলে দেশে ফিরিয়া সে টাকাগুলি উসুল করিতে পারিবে কি না, তাহাতেও গভীর সন্দেহ! কিশোরবয়স্ক ছেলে দুইটির সম্বন্ধেও যে পরিমাণে ব্যয় তিনি করিতেছেন, কোনও বিত্তবান্ রাজাও বোধ হয় তাঁহার পুত্রদের শিক্ষা ও পরিচর্য্যায় এরূপ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবেন! কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়াছেন, কিন্তু সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই; কন্যার তুষ্টিবিধানে—ছাই ভস্ম ছবি আঁকা শিখাইতে—মাস মাস যে টাকা তিনি অপব্যয় করিতেছেন, তাহাতে একটা বড় সংসার প্রতিপালিত হয়। অথচ, ইহার কি সার্থকতা আছে? চিত্রবিদ্যায় ওস্তাদ হইয়া কন্যা কি করিবে? মেয়েদের এতটা আস্কারা দিয়া লাভ? তাহার পর, এই যে সপরিবার চুণারে চলিয়াছেন, তাহাও রাজার মত আড়ম্বর করিয়া;—কর্ম্মচারীরা পূর্ব্বেই সেখানে গিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবাসভবন উচ্চ হারে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে; দাস, দাসী, পাচক প্রভৃতি দুই দিন পূর্ব্বে সেখানে চলিয়া গিয়াছে, কলিকাতা হইতে প্রত্যহ ফ্রেস্-ফ্রুট-বাস্কেটে নানাবিধ ফল, তরিতরকারি ও মৎস্যাদি সেখানে উপনীত হইবে—এমন সুব্যবস্থাও হইয়াছে!—এই অদ্ভুত সহযাত্রীটির জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিকেই এইরূপ

আড়ম্বর ও সেই সূত্রে বিপুল অপব্যয়ের আভাস এটর্ণীসুলভ নিপুণ দৃষ্টিতে উপলব্ধি করিয়া রামকমলবাবু গম্ভীর ভাবেই বলিয়া ফেলিলেন,—আপনার ব্যয়-বিলাস দেখে আমি কিন্তু খুসী হ'তে পারছি না, দিবাকরবাবু, আমার মনে হয়—এ সব আপনার অপব্যয় !

দিবাকরবাবু সহযাত্রীর কথায় কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া হাসি-মুখেই কহিলেন,—নিজের উপায়ের টাকা খরচ করা কি সত্যই অপব্যয়, রামকমলবাবু ? তা হ'লে সদ্ব্যয় কিসে বলুন ত,—মক্কেলের মাথায় হাত বুলিয়ে পিত্তিরক্ষায় ?

এই কথায় রামকমলবাবুর মুখখানি কালো হইয়া যাইবার কথা, কিন্তু কালিমার পরিবর্ত্তে হাসির ঈষৎ লালিমাই তাহাতে ফুটিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠের স্বর রীতিমত কোমল করিয়াই কহিলেন,—আমি আপনাকে এতক্ষণ পরীক্ষা করছিলুম, দিবাকরবাবু, তাই না ঐ ভাবে খোঁচাটা দিতে হয়েছিল ? তবে কি জানেন, সঞ্চয় করাটা যেমন দোষের নয়, তেমনই—যে উপায় করতে জানে, তার পক্ষে ব্যয় করাটাও অন্যায় হ'তে পারে না। আপনার ঐ দরাজ কপালখানা দেখেই বেশ বুঝা যায় যে, আপনি দিতেই এসেছেন, তাই দশভুজাও আপনাকে দশ হস্তেই দিচ্ছেন !

দিবাকরবাবু এবার বিশেষ প্রসন্নভাবেই কহিলেন,—এতক্ষণে আপনি কথার মত একটা কথা বললেন, রামকমলবাবু ! আপনি ঠিক জানবেন, যেদিন আমি এই দু'খানা হাত গুটোব, সেইদিন দশভুজাও তাঁর দশ হাত নিয়েই অদৃশ্য হবেন।

রামকমলবাবু নির্ব্বিচারে সহযাত্রীর কথায় সায় দিয়া কহিলেন, —ঠিক ! কথায় আছে না, যে খায় চিনি, তাকে যোগান চিন্তামণি !

অতঃপর ট্রেণের কামরার মধ্যেই দুই পরিবারের দুই কর্ত্তার মধ্যে

এমন সম্প্রীতির ধারা বহিয়া চলিল যে, তাহার আবর্ত্তে সমস্ত সঙ্কোচই ধুইয়া মুছিয়া গেল। দিবাকর বাবু সহযাত্রীদের প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও বর্দ্ধমানে তাঁহাদিগকে অন্য কামরার সন্ধানে যাইতে দিলেন না, একান্ত আগ্রহ সহকারে জানাইলেন,—আপনারা আজ আমার ট্রেণের অতিথি, যাবেন কোথায়? আমার দুই ছেলে যাঁদের নিয়ে এসেছেন, তাঁদের সঙ্গেও এই কামরায় ত আগে পরিচয় হোক; তার পর আপনাদের পরিচর্য্যা ত আছেই; আর পাশের কামরা যখন রিজার্ভ করা আছে, তখন কোনও অসুবিধাই কোনও পক্ষের হবার কথা নয়।

অসুবিধা যে কোথায় এবং কোন্ পক্ষের, রামকমলবাবুই এতক্ষণ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছিলেন! ব্যাণ্ডেলের প্লাটফরমে এ-পক্ষ যে সৌজন্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, এখনকার এই প্রস্তাব তাহা অপেক্ষাও মনোরম এবং তাঁহার পক্ষেও একান্ত অপরিহার্য্য। আশা তখন ধীরে ধীরে তাঁহার কর্ণকুহরে মধুর সুরে এমন একটা গুঞ্জনও তুলিতেছিল—সহযাত্রী যখন তাঁহারই পাল্‌টি ঘর, সেক্ষেত্রে কন্যাদের বিবাহ ও পুত্রের শিক্ষার ব্যয় বাবদ খরচ-পত্র সুদ সহ এই অপব্যয়ীর তরফ হইতে উসুল করা কি সম্ভবপর নয়—যখন তাঁহার গলায় ঝুলিতেছে এত বড় অবিবাহিতা কন্যা!

৩

রামকমলবাবুর পসার ও প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহার পুত্র অবনীনাথের বিদ্যা ও চমৎকার রূপ অবলম্বন করিয়া আশা কন্যা-পক্ষের চিত্তেও দোলা দিল; উপলক্ষ হইল, ট্রেণের কামরায় এই দুইটি পরিবারের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি! ছেলের বাপের ব্যয়কুণ্ঠ স্বভাব সম্বন্ধে দ্বিধা যদিও উঠিয়াছিল, কিন্তু স্থায়ী হইল না; বরং অনুকূলে ইহাই সাব্যস্ত হইয়া গেল যে, ছেলের বাপ যে, মেয়ের বাপের মত খরচে নয়, এটা মেয়ের পক্ষে শাপে বর! সুতরাং কথাটা তুলিতে আর আপত্তি রহিল না।

গঙ্গাতীরে উদ্যান-সমন্বিত যে বিশাল বাঙ্গলোয় দিবাকরবাবু সপরিবার বিপুল জাঁক-জমকে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, একদা রামকমলবাবু স্ত্রী ও পুত্রের সহিত তথায় আমন্ত্রিত হইলেন। ট্রেণের কামরায় অতিথি-রূপেই ইঁহারা এ-পক্ষের ভোজের প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাইয়াছিলেন; এখানে আসিয়া আদর, আপ্যায়ন ও ভোজনপর্ব্বের বিপুল আয়োজন দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

আহারাদির পর কন্যাপক্ষ হইতেই প্রস্তাবটি উঠিল এবং কোনওরূপ ভূমিকা না করিয়াই দিবাকরবাবু কহিলেন,—অবশ্য, আমি যা যৌতুক ব'লে দেব, তাতে আপনি ঠকবেন না, রামকমলবাবু!

রামকমলবাবু হাসিয়া কহিলেন,—বিলক্ষণ! আপনার কাছে ঠকবার ভয় আমি করিনি, ভয় করছি, আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতায় পেরে উঠব কি না—

কেন—কেন?

আপনার যে রকম মেজাজ, আর খরচ-পত্রের ব্যাপারে দরাজ হাত, আমার পক্ষ থেকে তার—

কোনও প্রয়োজন নেই ত! আমার মেয়ে; আমি যা করব, আপনাকেও যে ঠিক সেই রকম করতে হবে—এমন কোনও কথা নেই, আপনি কোনও খরচ নাই-বা করলেন।

না, না, সে কথা বলছি না, ছেলের বে' দেব, অথচ কোনও খরচই করব না—

না,—রামকমলবাবু, এ বিয়েতে আপনার কোনও খরচই নেই; মিছিল ক'রে বর আনা, বর-ক'নে পাঠানো—এ সব বাজে খরচও আমার; গায়ে হলুদ ঘটা ক'রে যদিও আপনাকে পাঠাতে হবে, কিন্তু তার খরচ যোগাব আমি; আমার এই একটি মেয়ে, এর বিয়েতে আমি এমন কোনও ত্রুটি হ'তে দেব না, যাতে আপনার মুখ থেকে আপত্তি কিছু ওঠে।

রামকমলবাবু কহিলেন,—তা হ'লে আমার পক্ষ থেকে এ সম্বন্ধে এখন কথা না তুলাই ভাল; বেশ আমি আপনার ওপরই সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত রইলুম।

এই কথাবার্ত্তার পর দুই পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা যেমন নিবিড় হইয়া উঠিল, যে দুইটি তরুণ-তরুণীকে লইয়া এই যোগসূত্র রচনার প্রয়াস, তাহারাও পরস্পর পরিচিত ও মিলিত হইবার অপ্রত্যাশিত অবকাশ পাইল।

প্রথম প্রথম পরস্পরের কথোপকথনে লজ্জা ও সঙ্কোচ অন্তরায় হইয়া উঠিত, কিন্তু ক্রমে ক্রমেই তাহা নিশ্চিহ্ন হইতেছিল। পূর্ব্বে সুধা তন্ময় হইয়াই ছবি আঁকিত, কিন্তু এখন প্রায়ই ক্যাম্বিশে তুলির আঁচড়

টানিতে-টানিতে কান পাতিয়া সে যেন কাহার পদশব্দ শুনিবার প্রতীক্ষা করে!

এ বাড়ীতে আসিলেই এখন অবনীর আদর-অভ্যর্থনার অন্ত থাকে না। কিন্তু সে স্মিতহাস্যে সকলের অভ্যর্থনার উত্তর দিয়া অতিবাঞ্ছিত একজনের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া থাকে।

সুধা তাহার অঙ্কিত চিত্রগুলি গোপন করিতে যতটা প্রয়াস পায়, ততোধিক ক্ষিপ্রতায় অবনী সেগুলি আয়ত্ত করিতে আকুল হইয়া উঠে এবং সর্ব্বদাই দেখা যায়, এই কৌতুকাবহ যুদ্ধে সে-ই জয়যুক্ত হইয়াছে; একদিন ছবিগুলি এক একখানি করিয়া দেখিতে দেখিতে সে বলিল,—বাঃ! চমৎকার এঁকেছ ত! সত্যই তুমি জিনিয়াস্!

সুধা মুখখানি আরক্ত করিয়া উত্তর দিল,—ছাই হয়েছে!

অবনী হাসিয়া কহিল,—আমি যদি এমনি একখানা ছবি আঁকতে পারতুম, তা হ'লে সত্যই মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করতুম।

অবনীর কথায় সুধার চিত্তটি উল্লাসে দুলিয়া উঠিল, মনে মনে সে ভাবিল,—আমার শিল্প-সাধনা আজ সার্থক হয়েছে!

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পরও দুই পরিবারের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি নিবিড়তম হইতেছিল। সপরিবার রামকমলবাবু প্রায় প্রতি সপ্তাহেই দিবাকরবাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইতেন। কখনও কখনও তিনিও দায়ে পড়িয়া প্রতি-নিমন্ত্রণ না করিয়া পারিতেন না। কিন্তু আদর-আপ্যায়ন, বা ভোজ্যের আয়োজন—কোনও বিষয়েই তিনি দিবাকরবাবুর নাগাল পাইতেন না এবং সে সম্বন্ধে কোনও প্রয়াসও করিতেন না। বাঁধা-ধরা সাধারণভাবেই তিনি ভাবী বৈবাহিক-পরিবারের পরিচর্য্যায় অবহিত হইতেন।

বিচক্ষণ রামকমলবাবু নিপুণ দৃষ্টিতে দিবাকরবাবুর হালচাল দেখিয়া তাঁহার এই দপদপা ও অতি বাড়াবাড়ির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিতেন। তিনি ইহাই সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, যেখানে পয়সার উপর মোটেই দরদ নাই, পয়সা সেখানে কথনই স্থায়ী থাকিতে পারে না। এইজন্যই কুম্ভে জল থাকিতে থাকিতে যাহাতে শুভকার্য্যটি সুশৃঙ্খলে সমাধা হইয়া যায়, সে বিষয়ে তিনি সহসা অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া ও-পক্ষকেও এ সম্বন্ধে ব্যগ্র হইতে হইল। অতঃপর স্থির হইল, বৈশাথ মাসের প্রথমেই দিবাকরবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র জার্ম্মাণী হইতে ফিরিবে, সে আসিলেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে।

রামকমলবাবু হিসাব করিয়া দেখিলেন, প্রায় পাঁচ মাসের ধাক্কা; কিন্তু উপায় নাই, এই পাঁচটি মাস তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিতেই হইবে। এথন এই কয়মাস তাঁহার ভাবী বৈবাহিকের আয় ও বোল-বেলাও যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে, সে সম্বন্ধে তিনি সকাল সন্ধ্যা ছুটি বেলাই ইষ্টের নিকট প্রার্থনা করিতেন।

কিন্তু ভবিতব্যের এমনই নিষ্ঠুর পরিহাস যে, আশা যাহা সার্থক করিয়াছিল, অদৃষ্ট তাহা ব্যর্থ করিয়া দিল; ইষ্টের নিকট প্রার্থনাও সিদ্ধ হইল না।

একদা প্রত্যূষে প্রভাতী সংবাদপত্রগুলির পৃষ্ঠায় সকলেই সচকিত হইয়া দেখিলেন,—সেয়ার মার্কেটের সুবিখ্যাত দিবাকর বসু সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন!

রামকমলবাবুর হাত হইতে কাগজথানা পড়িয়া গেল। কি নির্ঘাত সংবাদ! যে আশঙ্কা তিনি করিয়াছিলেন, এত শীঘ্রই তাহা সত্য হইয়া দাঁড়াইল! কিন্তু—

মনে মনে কি ভাবিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ অবনীকে ডাকিলেন। অবনী

আহ্বান পাইয়াই ছুটিয়া আসিল; কাগজখানি তুলিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিলেন,—পড়!

খবরটি পড়িয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিস্ময়ের সুরে অবনী কহিল,—কি সর্ব্বনাশ!

প্রায় এক সপ্তাহ অবনী বাড়ীতেই আছে। জ্বরে পড়িয়াছিল, কোথায়ও বাহির হয় নাই; দুই দিন হইল জ্বর ছাড়িয়াছে, আজ তাহার পথ্য করিবার কথা। সুস্থ থাকিলে, সপ্তাহে অন্ততঃ তিন দিন সে দিবাকরবাবুদের বাড়ীতে আফিসের পাল্টা ঘুরিয়া আসিত, প্রতি শনিবার সেখানে তাহার নৈশ ভোজনের ব্যবস্থাই ছিল। অতি পরিচিতের মতই সে এখন ভাবী শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করে,—সুধার সহিত অবাধ মেলা-মেশায় ও বিশ্রম্ভালাপে কোনও সঙ্কোচই এখন আর নাই! কিন্তু এই অষ্টাহ সে ও-বাড়ীতে যায় নাই এবং সেখানকার কোনও সংবাদও পায় নাই, অকস্মাৎ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় এই সাংঘাতিক সমাচার তাহাকে যেন আড়ষ্ট করিয়া দিল।

রামকমলবাবুও জানিতেন যে, পুত্র এ-কয়দিন ও-বাড়ীতে যায় নাই। তথাপি প্রশ্ন করিলেন,—তুমি কি এ সম্বন্ধে আভাস কিছু পেয়েছ, জান ওদের খবর?

অবনী কহিল,—অসুখ হবার আগের দিন ওখানে গিয়েছিলুম, কিন্তু কিছুই শুনিনি বা সন্দেহ করবার মত কোনও ঘটনাই আমার চোখে পড়েনি—

রামকমলবাবু পার্শ্বের চেয়ারখানা নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—বস, এ সম্বন্ধে বিশেষ পরামর্শ আছে।

অতঃপর মৃদুস্বরে তিনি পুত্রকে এই সর্ব্বস্বান্ত মানুষটির প্রসঙ্গ তুলিয়া প্রয়োজনমত উপদেশ দিতে অবহিত হইলেন।

৪

যে অদৃষ্ট সদয় হইয়া দুঃসাহসী লোককে আমীর করিয়া দেয়, আবার সে-ই বিরূপ হইয়া তাহাকে ফকীরের মত সর্ব্বহারা করে। নিশ্চিত ক্ষতি জানিয়া একদিন দিবাকরবাবু যে ব্যাপারে লাখো টাকা নিয়োগ করিয়াছেন, তাহাই শেষে লাভের পর্য্যায়ে উঠিয়া তাঁহার সিন্ধুকে ঢুকিয়াছে। আবার, অনিবার্য্য লাভ বুঝিয়া যাহাতে যথাসর্ব্বস্ব লাগাইয়াছিলেন, তাহাই নির্ঘাত ক্ষতিকর হইয়া তাঁহাকে একদিনেই নিঃস্ব করিয়া দিল!

বাহিরের সমস্ত সম্পত্তি, গচ্ছিত টাকা, গৃহিণীর অলঙ্কার—এমন কি, গৃহের মূল্যবান্ তৈজসপত্র পর্য্যন্ত নিঃশেষ হইয়া গেল দেনা পরিশোধ করিতে এবং বসতবাটীখানি বাঁচাইতে। সেয়ারের বাজারে যে বিপুল সম্ভ্রম ছিল, তাহা এখন স্বপ্নে পরিণত।

দিবাকরবাবু শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন; এ কয়দিনেই তাঁহার বয়স যেন কত বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে; যে মুখে সর্ব্বক্ষণ হাসি লাগিয়া থাকিত, আজ সেখানে কালিমা পড়িয়াছে। এখন সর্ব্বাপেক্ষা বড় চিন্তা তাঁহার এবং এই পরিবারের সকলকার—সুধার বিবাহ, ভাবী বৈবাহিকের নিকট কি করিয়া মুখ দেখাইবেন, কি বলিবেন?

সুধাও বুঝিয়াছে, তাহাকে লইয়াই এই দুর্দ্দিনেও সর্ব্বস্বান্ত পিতার সব চেয়ে বড় সমস্যা। যাহা লইয়া চিন্তা করিবার কোনও প্রয়োজন কখনও হয় নাই, আজ তাহাই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। সত্যই কি সে আজ এই সংসারের সমস্যা, সে কি ইহার কোনও সমাধান করিতে পারে না!

কয় দিন হইল তাহার ইটালীয়ান শিক্ষয়িত্রীকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে,

সে নিজেও তাহার চিত্রশিক্ষার ঘরটির দরজা রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে ; এখন চিন্তাই তাহার সহচরী, তাহাকেই তুলির মত ধরিয়া নির্ম্মল চিত্তটির উপর কত অপরূপ চিত্রই সে রচনা করে !—আর, সর্ব্বদাই ভাবে,—কি করিয়া এ সমস্যার সমাধান করিবে, সর্ব্বস্বান্ত বাবার এই অবস্থায় তাহার কি কোনও কর্ত্তব্যই নাই ? নিজের মান-মর্য্যাদা পদদলিত করিয়াও কি তাহার পক্ষে বাবার মুখ রক্ষা করা অসম্ভব ?

সন্ধ্যার একটু পরে ধীরে ধীরে অবনী এ বাড়ীতে প্রবেশ করিল। আজ আর বাড়ীর সে শ্রী নাই, উচ্ছ্বসিত উল্লাসের দীপটি কে যেন একই ফুৎকারে নিবাইয়া দিয়াছে। অবনীকে দেখিয়া আজ কেহ ছুটিয়া আসিল না, বিপুল অভ্যর্থনাও হইল না ; সকলেই যেন আজ তাহাকে এড়াইয়া মুখ লুকাইতে ব্যস্ত !

অবনী কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বরাবর সুধার ঘরখানির ভিতর প্রবেশ করিল—যে ঘরে প্রতি সন্ধ্যায় সে ছবির গ্যালবামখানি লইয়া অবনীর প্রতীক্ষায় থাকে।

অবনী দেখিল, আজ আর সুধা অন্যান্য দিনের মত চিত্রের পরিচর্য্যায় অবহিত নহে, একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া ম্লানমুখে গবাক্ষের দিকে চাহিয়া আছে। অবনীর পদশব্দে সে সহসা চমকিত হইয়া ফিরিতেই চোখাচোখি হইল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, দুই চক্ষু তাহার অশ্রুভারে তখন স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, অতি কষ্টে অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া গাঢ়স্বরে শুধু কহিল,—এসেছ !

অবনী কোনও উত্তর না দিয়া নিকটের চেয়ারখানি টানিয়া বসিল। দৃষ্টি তাহার সুধার মুখের দিকে। কিন্তু সে দৃষ্টিতে সমবেদনার কোনও নিদর্শন সুধার চক্ষুতে ধরা পড়িল না।

সুধাই অবনীর দেহের দিকে চাহিয়া ব্যথার সুরে প্রশ্ন করিল,—এমন রোগা দেখছি কেন তোমাকে ?

অবনী তাচ্ছল্যের সুরে উত্তর দিল,—অসুখ করেছিল।

শিহরিয়া উঠিয়া সুধা কহিল,—তাই বুঝি ক'দিন দেখিনি !

অবনী কোনও উত্তর দিলনা, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সুধা পুনরায় কহিল,—আমাদের অবস্থার কথা সব শুনেছ ত ?

রুক্ষস্বরে অবনী কহিল,—শুনতে আর বাকি কে আছে বল! তবে আমাদেরই মুখগুলো ভাল করে পুড়েছে।

কথাগুলি যেন লোহার গুলীর মতই সুধার কোমল বুকখানির উপর নিক্ষিপ্ত হইল। সে কিছুক্ষণ ছল-ছল দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি অবনীর মুখের উপর ফেলিয়া আড়ষ্টভাবেই চাহিয়া রহিল! বুঝিতে পারিল না, তাহাদের এমন ভাগ্যবিপর্য্যয়-প্রসঙ্গে অবনী কি করিয়া এই কথাগুলি বলিল!

কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কথা নাই ; অবনীর মুখখানি ক্রমশঃই কঠিন হইতেছিল। সুধা সহানুভূতির উদ্রেকের অভিপ্রায়ে অতি করুণকণ্ঠে কহিল,—বাবার মুখখানা যদি দেখতে, কখনই তোমার মুখ দিয়ে এ কথা বেরুত না।

অবনী সুধার দিকে চাহিল মাত্র, কোনও কথা কহিল না। সুধা পুনরায় কহিল,—আমার জন্যই আজ বাবার যত ব্যথা, আমি আজ এ-বাড়ীর সবারই দুশ্চিন্তা।

যে কথা এতক্ষণ অবনী বলিবে বলিবে ভাবিতেছিল, যেন তাহারই একটা অনুকূল সূত্র পাইয়া সাগ্রহে প্রশ্ন করিল—কেঁন ?

সুধা স্থিরদৃষ্টিতে ক্ষণকাল অবনীর দিকে চাহিয়া কহিল, তুমি কি বুঝতে পার নি, আমাকে নিয়েই আজ সকলের এত ভাবনা কেন ?

অবনী কহিল—কেন, এ ভাবনার অবসান ত তাঁরা ইচ্ছা করলেই করতে পারেন!

কণ্ঠের স্বরে একটু জোর দিয়া সুধা কহিল,—তাঁদের ইচ্ছার কোনও মূল্য ত আর নেই, বরং এখন তোমরাই ইচ্ছা করলে এ ভাবনার অবসান হ'তে পারে!

অবনী কহিল—কিসে?

সুধা অবনীর মুখের দিকে সলজ্জ দৃষ্টিতে চাহিয়াই চুপ করিয়া রহিল, বলি-বলি করিয়াও কথাটা বলিতে পারিলনা, তাহার বিবর্ণ মুখখানি সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল।

অবনী তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল,—চুপ ক'রে রইলে কেন, বল না?

সুধা এবার কম্পিতকণ্ঠে কহিল,—আমার দুর্ভাগ্য, তাই এ কথা আজ আমাকেই বলতে হ'চ্ছে! আমি কিন্তু ভেবেছিলুম, নিজের মুখে কথাটা প্রকাশ করবার অবসর তুমি আমাকে দেবে না!

বিরক্তির সুরে অবনী কহিল,—আমি ত জ্যোতিষ চর্চ্চা করি না যে, তোমার মনের খবর না শুনেই জানতে পারব!

সুধা কহিল,—মনের খবর মন দিয়েই জানা যায়, এর জন্ত জ্যোতিষের দরকার হয় না। তা হ'লে আমিই বলছি আমার কথা,—জান ত, বাবা সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন; তোমার বাবার কাছে যে যৌতুক দেবার কথা ব'লে-ছিলেন, আজ কোনও মূল্যই তার নেই, এখন তোমরা যদি—

কথাটা সে শেষ করিতে পারিলনা, স্বর অস্বাভাবিক গাঢ় হইয়া সহসা রুদ্ধ হইল। অবনীই এই বলিয়া তাহার উপসংহার করিয়া দিল,—যৌতুকের দাবী ত্যাগ করি, এই ত? কিন্তু সেটা সম্ভবপর নয়; আর এই জন্ত বাবা আমাকে এর নিষ্পত্তি করতে পাঠিয়েছেন!

সুধার মনে হইল, তাহার পদতল হইতে কক্ষতল যেন কাঁপিতে কাঁপিতে সরিয়া যাইতেছে! পড়ি পড়ি অবস্থায় কোনওরূপে আত্মসম্বরণ করিয়া সে পার্শ্বের চেয়ারখানির উপর বসিয়া পড়িল।

অবনী আড়নয়নে তাহার দিকে চাহিয়াছিল, সহসা মনে মনে কি একটা স্থির করিয়া সে কহিল,—খবরের কাগজে ব্যাপারটা জেনেই আমি বাবাকে যে বিবেচনা করতে বলিনি—তা নয়, কিন্তু তিনি শুনে যা বললেন, সেটাও অন্যায় নয়, আর আমিও সেই কথাটাই বলতে এসেছি।

সুধা নিষ্প্রভ দুইটি চক্ষু তুলিয়া উদাস ভাবে অবনীর দিকে চাহিল। অবনী কহিল,—বাবা বললেন, বাড়ীখানা ত বেঁচে গেছে—তবে আর ভাবনা কিসের? ঐটে বাঁধা দিয়ে যৌতুকের টাকাটা তোলা ত অসম্ভব নয়; বাবাকে ধরলে, তিনিই এর যা কিছু ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন; তুমিই বরং কথাটা—

কিন্তু দুইটি নিষ্প্রভ চক্ষুর দৃষ্টি মুহূর্ত্তমধ্যে প্রখর করিয়া—তাহার জ্বালায় অবনীর দুই চক্ষু ঝলসিত করিয়া দিয়া সুধা দৃপ্তকণ্ঠে যে ঝঙ্কার তুলিল, তাহাতে অবনীর মুখের কথাটা আর সমাপ্ত হইতে পারিল না। সুধা কহিল,—কি বললে তুমি?—আমার বাবা, মা, আমার তিনটি ভাই—এদের রাস্তায় নামাবার উপলক্ষ হই আমি—এই পরামর্শই তুমি আমাকে দিতে চাও?

সুধার মুখে এ পর্য্যন্ত অবনী সুধাসম সুমিষ্ট কথাই শুনিয়াছে, কখনও বা তাহাতে অভিমান বা পরিহাসের কিঞ্চিৎ আভাস পাইলেও পরিণামে তাহা পুনরায় মধুময়ই হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু তাহার দীর্ঘায়ত দুইটি সুন্দর চক্ষুর এমন প্রখর দৃষ্টি এবং মুখের মিষ্ট কথায় এমন তীক্ষ্ণতার উচ্ছ্বাস এই প্রথম অনুভব করিল।

তথাপি অবনী কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবেই সুধার এই মর্ম্মস্পর্শী প্রশ্নের উত্তর দিল,—কি করবে বল, অন্য উপায় আর নেই ; বাবার যখন এ সম্বন্ধে ধনুর্ভঙ্গ পণ !

সুধা অবনীর এই উত্তর শুনিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিল, তাহার পর কণ্ঠ বেশ পরিষ্কার করিয়া সে কহিল,—কিন্তু তুমি ত তাঁর ছেলে ; বাবার এই নিষ্ঠুর পণ ইচ্ছা করলেই ত তুমি ভাঙতে পার !

মুখখানা কঠিন করিয়া অবনী কহিল,—না, পারি না ; বাবাকে তুমি চেন না ; এ পর্য্যন্ত তাঁর মুখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কোনও প্রতিবাদ আমি তুলতে সাহস পাই নি।

শ্লেষের সুরে সুধা প্রশ্ন করিল,—তা হ'লে এ পথে এতদূর এগিয়েছিলে কোন্ দুঃসাহসে শুনি ?

অবনী কহিল,—বাবাই এ পথ বাতলে দিয়েছিলেন, তাই।

বাবা যদি তোমাকে বিয়ের পর ত্যাজ্যপুত্র করেন, তা হ'লে তুমি তখন কি করতে পার ?

বাবা আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন কেন ?

যদিই করেন কোনও কারণে—তুমি তখন কি করবে শুনি ?

অবনী মুখে হাসি টানিয়া কহিল,—তা হ'লে তখন নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াব।

কণ্ঠস্বরে রীতিমত জোর দিয়া সুধা কহিল,—না, পারবে না তুমি দাঁড়াতে নিজের পায়ে ভর দিয়ে—কিছুতেই না ; সে শক্তি তোমার নেই ; তা যদি থাকত, তুমি আমার বাবার এই অবস্থা দেখে এমন কথা কখনই মুখে আন্‌তে পারিতে না, সত্যকার দরদ তা হ'লে তোমার বিবেককে জাগিয়ে দিত, তুমি প্রতিবাদ করতে—

সুধার অন্তকার এই তেজোদৃপ্ত মূর্ত্তি অবনীকে মুগ্ধ করিলেও তাহার সঙ্কল্পকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না; বরং কার্য্যোদ্ধারের অভিপ্রায়ে স্বর অতিশয় কোমল করিয়াই সে কহিল,—তুমি শুধু আমার দিকেই চাইছ সুধা, নিজের দিকে একটুও তাকাচ্ছ না; তোমার বাবার যখন লাখ টাকা দামের বাড়ী এখনও রয়েছে, সেটাকে উপলক্ষ ক'রে বিয়ের দাবীটা মেটালে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে! এর পরেও ত এটা উসুল করবার অনেক সুযোগ আসতে পারে। আচ্ছা তুমি না পার, আমিই না হয় নিজেই তোমার বাবাকে কথাটা বুঝিয়ে বল্‌ছি—

দুটি চক্ষুর দৃষ্টি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল করিয়া সুধা তাহার অতিবাঞ্ছিত এই মানুষটির দিকে চাহিয়া রহিল, আজ যেন সে নূতন করিয়া ইহাকে দেখিতেছে, নূতন দৃষ্টিতে যেন এমন কিছু নূতনত্বের সন্ধান পাইয়াছে, যাহা তাহার পক্ষে একান্ত অবাঞ্ছিত, যাহা সে কোনওদিন প্রত্যাশাই করে নাই!

কিন্তু এই দৃষ্টিটুকু বিক্ষেপ করিতে অতি অল্পক্ষণই লাগিল, পরক্ষণেই সে কঠিন হইয়া তীক্ষ্ণ শ্লেষের সুরে কহিল,—আমাকে নেবার জন্ত এতখানি কষ্ট তুমি করবে—শুনেই বাধিত হলুম; কিন্তু তার আর প্রয়োজন হবে না।

অবনী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুধার দিকে চাহিয়া বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করিল,—এ কথার মানে?

সুধা দীপ্তকণ্ঠে উত্তর দিল,—আমি এখনি বাবাকে জানাব—তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধই নেই, এ বিবাহ হবে না।

চমকিত হইয়া অবনী কহিল,—তুমি কি পাগল হ'লে?

সুধা গম্ভীর মুখে কহিল,—না, ভগবান্ আমাকে রক্ষা করেছেন;

নতুবা তোমার যুক্তি মেনে নিয়ে বাবাকে হা-ঘরে করতুম, না হয় বিষের আশ্রয় নিতুম।

অবনী ক্ষণকাল গম্ভীর হইয়া মনে মনে কি ভাবিল, সুধার এমন মূর্ত্তি সে আর কখনও দেখে নাই, এমন তীক্ষ্ণ কথাও কোনোদিন শুনে নাই; গত কয়মাসের কত পুরাতন কথাই তাহার স্মৃতিপথে ভাসিয়া উঠিল; সে তখন স্নিগ্ধদৃষ্টিতে সুধার দিকে চাহিয়া গাঢ়স্বরে প্রশ্ন করিল,—তবে কি সত্য সত্যই তুমি আমাদের সম্বন্ধ ভেঙে দিতে চাও?

অবিচলিতকণ্ঠে সুধা উত্তর দিল,—হাঁ, এতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নেই।

উচ্ছ্বাসের সুরে অবনী পুনরায় প্রশ্ন করিল,—ভুলতে পারবে আমাকে তুমি—পারবে?

দৃঢ়কণ্ঠে সুধা কহিল,—স্বচ্ছন্দে।

সন্দিগ্ধভাবে সুধার মুখের দিকে চাহিয়া আর্ত্তস্বরে অবনী কহিল,—আমাদের এই নিবিড় প্রেম, এত ভালবাসা, ভবিষ্যতের আশা—

কণ্ঠে জোর করিয়া সহজ সুর টানিয়া সুধা কহিল,—এখন সে সব তামাসা মনে হচ্ছে, অবনীবাবু! আমার বাবার এত বড় ভাগ্য-বিপর্য্যয়—আমার ভায়েদের অসহায় অবস্থা—আপনার কাছে কিছু নয়, আমিই শুধু—উঃ! ভাবতেও আমার মাথার ভেতর জ্বালা ধরছে,—এমন এক স্বার্থপরের কণ্ঠলগ্ন হয়ে আমি ভালবাসার স্বপ্ন দেখব! না,—আপনি চ'লে যান অবনীবাবু, কোনো সম্বন্ধ যে আমাদের সঙ্গে আপনার ছিল, তা ভুলে যান।

বেত্রাহতের মত সবেগে চেয়ার হইতে উঠিয়া অবনী সুধার দিকে একবার বিরক্ত-কুটিল-মুখে চাহিল, তাহার পর মুখখানি ঈষৎ বিকৃত

করিয়া কহিল,—বেশ! কিন্তু একটা কথা শুধু জিজ্ঞাসা করব তোমাকে, এই অভাজনের প্রতি তোমার সেই তীব্র ভালবাসাটুকু ভুলতে পারবে?

উচ্ছ্বসিত সুরে সুধা উত্তর দিল,—এই ভোলাটাই আজ থেকে আমার তপস্যা হবে অবনী বাবু, আর এ তপস্যায় আমি সিদ্ধি পাবই; এখন থেকে আপনার সম্বন্ধে আমার এই ধারণা হবে—কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এক কদর্য্য ডাকাত ভদ্রতার মুখোস পরে আমার নারীত্বের ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠন করতে এসেছিল, আমি অন্তর্দৃষ্টিতে তাকে চিনতে পেরে নিজের শক্তিতে নিজেকে রক্ষা করেছি!

কথাগুলি এক নিশ্বাসে শেষ করিয়াই সে আর অবনীর দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া তাহার চিত্রাগারের দিকে ছুটিল; দ্বার রুদ্ধই ছিল, ক্ষিপ্রহস্তে খুলিয়াই ভিতর হইতে সশব্দে সে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

স্তব্ধভাবেই এতক্ষণ অবনী সুধার দিকে চাহিয়াছিল, তাহার যেন ক্রমশঃ নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল! সুধাকে তাহারই চক্ষুর উপর কক্ষান্তরে গিয়া এভাবে দরজা বন্ধ করিতে দেখিয়া সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কক্ষের বাহিরে আসিল। চিত্রাগারের রুদ্ধ দ্বার যেন তাহাকে নির্ম্মম পরিহাসের সহিত জানাইয়া দিল—এ আলয়ে তাহার প্রবেশ চিরদিনের জন্যই রুদ্ধ হইয়া গেল!

৮

বিচক্ষণ রামকমলবাবু মাথা-খেলাইয়া যে প্রস্তাবটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং যাহা বহন করিয়া অবনীনাথ এ বাড়ীতে আশা উৎসাহেই আসিয়াছিল, যদিও সুধার সময়োচিত প্রতিবন্ধকতায় তাহা আলোচনার অবকাশ পাইল না, কিন্তু যে কোনও সূত্রেই হউক, পরদিনই এই অপ্রীতিকর ঘটনাটি পল্লবিত হইয়া শয্যাশায়ী দিবাকরবাবুর কর্ণগোচর হইল। কে যেন তাঁহাকে অকূলে কূল দেখাইয়া দিল,—সত্যই ত, বাড়ী যখন রহিয়াছে এবং ভাবী বৈবাহিক এ সম্বন্ধে তদ্বিরের ভার পর্য্যন্ত লইতে ইচ্ছুক, তখন কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে ভাবনার কি আছে! সর্ব্বস্বান্ত খেয়ালী মানুষটির ভাবপ্রবণ চিত্ত নবভাবের উদ্দীপনায় পুনরায় দুলিয়া উঠিল।

কিন্তু এবার বাধা দিল—যাহার সম্বন্ধে তাঁহার এতটা উদ্বেগ ও ভাবনা, তাঁহার সেই কন্যা নিজে। সে পিতার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে জানাইল,—বাবা, আপনি যা ভাবছেন, তা হবে না; আমি ওখানে বে করব না - কিছুতেই না!

পিতা চমৎকৃত, বাড়ীর সকলেই বিস্ময়ে অবাক্! যে মেয়ের এক মাত্র খেয়াল ছবি আঁকা, সংসারের কোনও দিকেই যাহার দৃষ্টি নাই, বেশী কথা কোনও দিন বলে না, মুখ তুলিয়া কোনও বিষয়েই যে কোনও দিন কোনও প্রতিবাদ পিতামাতার সমক্ষে করে নাই, আজ তাহার মুখে এ কি কঠোর কথা!

পিতা বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করিলেন,—হঠাৎ এ আপত্তি তোমার কেন, মা? অবনীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?

কন্যা কিন্তু গম্ভীরভাবেই জানাইল,—না বাবা, ওসব কিছু নয়,—আপনি বিশ্বাস করুন, এ বিয়ে হবে না!

সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে কন্যার দৃঢ়তামণ্ডিত মুখখানির দিকে চাহিয়া পিতা কহিলেন,—কিন্তু আগে ত তুমি এ সম্বন্ধে কোনও আপত্তিই তোলনি, মা! এখন এ সব কথা বলবার মানে? এ সম্বন্ধ ভেঙে গেলে, শুনে সবাই হাসবে, তা জান?

অতিকষ্টে অশ্রু রুদ্ধ করিয়া গাঢ়স্বরে কন্যা কহিল,—তাই কি বাড়ীখানা পর্য্যন্ত খুইয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়ে আপনি লোকের মুখের ব্যঙ্গ-হাসি বন্ধ করতে চান?

পিতা এতক্ষণে বুঝিলেন, কন্যার ব্যথা কোথায়, কি সূত্রে তাহার চিত্তে এই বৈরাগ্যের সঞ্চার! একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আর্দ্রকণ্ঠে তিনি কন্যাকে প্রবোধ দিতে চাহিলেন,—এর জন্যে তোমার কেন ব্যথা, মা! বাড়ী আমার বাঁধা পড়বে ব'লে তুমি মা, চিরকুমারী থাকবে, তা কি কখনও হয়? আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি—তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।

কন্যা কিন্তু দৃঢ়তার সহিত পিতাকে জানাইয়া দিল,—সমস্ত ভাবনা এখন ত শুধু আপনার ওপর চাপিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না, বাবা! আমাদেরও এখন তার অংশ নেবার প্রয়োজন হয়েছে। আমার সুখের দিকেই আপনার দৃষ্টি, কিন্তু আপনারও বোঝা উচিত বাবা, এ বিবাহে আমি সুখী হ'তে পারব না কিছুতেই।

কেন মা, কেন? এ সংশয়ের কারণ?

আমাদের এত বড় বিপদে যারা এতটুকু দরদ দেখালে না, শুধু

নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির নির্দ্দেশ দিলে, আপনি কি মনে করেন, বাবা, সেখানে গিয়ে আমি সুখী হব!

কন্যার এই কথাটি সকলেরই মর্ম্মস্পর্শ করিল; ক্ষণকাল সকলেই স্তব্ধ হইয়া কথাটা ভাবিলেন। দিবাকরবাবু জোরে একটি নিশ্বাস মাত্র ফেলিয়া নীরব রহিলেন, কমলা দেবী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষুর অশ্রু মুছিলেন।

সুধাই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল, কহিল,—যাদের লক্ষ্য শুধু আমার দিকে আর তোমার অর্থে, যাদের কাছে আমার বাবা, আমার মা, আমার ভাই—কিছু নয়, কেউ নয়,—তাদের ভাল-মন্দ ভাবতে চায় না,—আমি তাদের কখনই ভালবাসতে পারব না, বাবা! সাধ ক'রে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে আমার সর্ব্বনাশ আপনারা করবেন না।

তা হ'লে তুমি কি চাও?

সর্ব্বস্ব নিয়ে ভগবান্ যেটুকু অবশেষ রেখেছেন, সেটুকু নষ্ট যাতে না হয়, আমার ভায়েরা মাথা রাখবার জায়গা পায়—এই আমি চাই, বাবা!

সে দিন আর কোনও কথা উঠিল না, কন্যার কথায় সকল কথাই চাপা পড়িয়া গেল। কিন্তু কন্যা বুঝিল, পিতা-মাতাকে যতই বুঝাইতে সে চেষ্টা করুক, তাহার বিবাহের সমস্যা ঠেকাইয়া রাখিবার সামর্থ্য তাহারও নাই। সে নানা সূত্রেই লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাকে লইয়া নানাবিধ আতঙ্কই ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিতেছে; অবনীর সহিত ঘনিষ্ঠতার কথা প্রচারিত হইয়া যদি কোনও অপবাদ সৃষ্টি করে, পারিপার্শ্বিক নানাবিধ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যদি সে আত্মহত্যা করিয়া বসে, কিম্বা বিবাহ করিব না বলিয়া যদ্যপি এই সংসারে একটা নূতন অশান্তির উৎপত্তি করিয়া ফেলে!

পরিজনদের সকল সন্দেহই সুধার চিত্তে আঘাত দিল, কিন্তু তাহার

নির্ম্মল মনটি ভুলিল না; চিত্র-জগতের অনবদ্য সুষমায় তাহার মনঃপ্রাণ আচ্ছন্ন, সুতরাং কোনও অনাচারই তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিল না, আত্মহত্যারূপ মহাপাপকে আত্মত্রাণের উপায়রূপে গ্রহণ না করিয়া যে পথ সে অবলম্বন করিল, তাহা অপূর্ব্ব!

৬

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল,—কোনও সম্ভ্রান্ত বংশীয় কায়স্থ-পরিবারের সুন্দরী সুশ্রী সুশিক্ষিতা কন্যার জন্য ঘোষ বা মিত্র বংশীয় হৃদয়বান্ উপায়ক্ষম পাত্র প্রয়োজন। বিনা যৌতুকে যিনি সহধর্ম্মিণী গ্রহণে ইচ্ছুক, তিনি নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

নিম্নের ঠিকানায় ছিল দিবাকরবাবুর নূতন বাসার ঠিকানা। কন্যা সুধার একান্ত আগ্রহে প্রাসাদোপম বিশাল অট্টালিকা উচ্চ হারে ভাড়া দিয়া দিবাকরবাবু শ্যামবাজার অঞ্চলে একখানি ছোট খাট দ্বিতল বাড়ী ভাড়া লইয়া সপরিবার অবস্থিতি করিতেছিলেন।

কাগজের বিজ্ঞাপন সকলের দৃষ্টিই আকর্ষণ করিল, কিন্তু কে যে দিবাকরবাবুর অজ্ঞাতে এই বিজ্ঞাপন দিয়াছে, তাহা জানা গেল না।

বিজ্ঞাপন বাহির হইবার তিন দিন পরে এক ভদ্রলোক দিবাকরবাবুর নূতন ভাড়াটিয়া বাসায় আসিয়া উপস্থিত! ছেলেরা তাঁহাকে বাহিরের ছোট ঘরখানিতে বসাইয়া ভিতরে পিতাকে খবর দিল—খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া এক ভদ্রলোক দিদিকে দেখিতে আসিয়াছেন।

সুধা তখন গৃহস্থালীর কাজ সারিয়া ছবি লইয়া বসিয়াছিল; ইদানীং সে জোর করিয়াই সংসারের অধিকাংশ কাজ নিজেই সারিয়া ফেলিত,

মায়ের এ সম্বন্ধে আপত্তি সে কানে তুলিত না, হাসিয়া বলিত,—শ্বশুরবাড়ী যখন যাব, তুমি কি আমার কাজগুলো সব সেরে দিয়ে আসবে? মা অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেন,—মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে ভাবিতেন—সেই দিনই আসুক, যেমন-তেমন ঘরেই মেয়ে আমার পড়ুক, বুকের কাঁটা নেমে যাক!

সেই কাঁটা নামাইতে নূতন এক মানুষ আসিয়াছে! বয়স প্রায় তাহার বত্রিশ, হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, দেহের বর্ণ যদিও ঠিক সুন্দর নয়, বরং কালোই, কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিৎ ঔজ্জ্বল্যের নিদর্শন পাওয়া যায়; পরন্তু মুখমণ্ডলে প্রতিভার ছাপ থাকিলেও কমনীয়তার যথেষ্ট অভাব সহজেই ধরা দেয়। আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আগন্তুকের দেহযষ্টি অসাধারণ দীর্ঘ এবং নাসিকাটি অতিশয় টিকোলো। সাধারণ দৃষ্টিতে যেমন ইঁহাকে সুপুরুষ বলা চলে না, পক্ষান্তরে বিশ্রী বলিয়া একেবারে উপেক্ষা করাও যায় না।

যখন প্রকাশ পাইল, এই মানুষটিই সুধাকে বিবাহ করিবার প্রার্থী হইয়া উপস্থিত, তখন প্রায় সকলেই অবনীর অনুপম চেহারার সহিত তুলনামূলক সমালোচনায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল,—আরে-ছি!

এমন কি বাড়ীর পুরাতন পরিচারিকা পর্য্যন্ত বাহিরে উঁকি দিয়া, আগন্তুককে দেখিয়া আসিয়া সুধাকে কহিল,—মাগো, একটা হুমড়ো মিন্‌ষে! দিদিমণি, তুমি বেয়ো না।

কিন্তু যাহাকে দেখিবার জন্য এই নবাগতের আবির্ভাব, তাহার মুখে কোনও পরিবর্ত্তনই কেহ দেখিল না। সাদাসিধাভাবে বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়াই সে বাহিরের আহ্বান প্রতীক্ষা করিতেছিল। দিবাকরবাবু

অপ্রসন্নভাবেই ভিতরে আসিলেন, কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই বুঝিলেন, দেখা দিতে তাহার মনে আপত্তি নাই, সে প্রস্তুত হইয়াই আছে।

ইদানীং কন্যার প্রকৃতিতে এমন একটা পরিবর্ত্তন তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার কথায় ও মুখে এমন কিছু অসাধারণত্বের আভাস পাইয়াছেন, যাহাতে তাহার মতের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ তুলিতে তাঁহার মনে কুণ্ঠার উদ্রেক হয়। আজও তিনি কন্যার মুখে সঙ্কল্পের এমনই দৃঢ়তা লক্ষ্য করিলেন যে, নবাগত সম্বন্ধে কোনও কথা না তুলিয়াই তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া নিজেই বাহিরের ঘরে চলিলেন।

দেখাশুনা যথাযথভাবেই হইয়া গেল। আগন্তুক যাহা যাহা প্রশ্ন করিলেন, অতিশয় বিনয়ের সহিত সুধা কোমল কণ্ঠেই তাহার উত্তর দিল।

আগন্তুক এইবার বেশ প্রসন্নভাবেই কহিলেন,—দেখুন, কন্যা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে; এখন আমাকে আপনাদের পছন্দ হয়েছে কি না, সেটা আমারও জানা দরকার। কেন না, সুপাত্রের যে গুণগুলি থাকা দরকার, তার যে সবগুলোই আমার নেই, আপনারা তা বোধ করি বুঝতেই পেরেছেন। প্রথমতঃ, আমি রূপবান্ নই, বয়সও আমার বত্রিশ পূর্ণ হয়ে এলো; বিদ্যায়ও যে আমি দিগ্‌গজ, তাও বলতে পারি না, যেহেতু এদিকে আমার দৌড় ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত; তবে আমাদের বংশের প্রতিষ্ঠা আছে, বাসবপুরের ঘোষ-বংশের নাম বোধ হয় আপনারা শুনেছেন—

দিবাকরবাবু বলিলেন,—শুনেছি, আমাদেরই পালটি ঘর, ওঁরা ত বনেদি জমিদার, তা হ'লে কি আপনি—

আজ্ঞে হাঁ, আমিও ঐ বংশেরই এক অভাজন। অভাজন বলছি এই জন্য যে, বংশের আর দশজন সুসন্তানের মত বিদ্যা অর্জ্জন করতে পারি নি। কেন যে পারিনি, তারও একটু ইতিহাস আছে, আর এত বয়স

পর্য্যন্ত বিবাহও যে কেন করিনি, এই সূত্রে সেটাও আপনারা জানতে পারবেন। যে বছর আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার কথা, বাবা হঠাৎ মারা গেলেন; মরবার সময় বাবা আমার মাথায় হাত রেখে ব'লে যান যে, আমার জন্য তিনি বছরে হাজার দেড়েক টাকা আয়ের জমিদারী রেখে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে যে দেনার বোঝা চাপিয়ে যাচ্ছেন, তার পরিমাণ সুদে আসলে প্রায় পঞ্চাশ হাজার! সম্পত্তি বজায় রেখে আমি যেন তাঁকে ঋণমুক্ত করতে পারি—নতুবা তিনি পরলোকেও তৃপ্তি পাবেন না।

সকলেই কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া নবাগতের এই মর্ম্মস্পর্শী উপাখ্যান শুনিতেছিলেন। দিবাকরবাবু এই সময় কহিলেন,—মনে হচ্ছে আমরা যেন গল্প শুনছি, আপনার কথা বলবার কায়দা চমৎকার! আচ্ছা, তার পর?

নবাগত কহিলেন,—তার পরই আমাকে কোমর বেঁধে সংসারে নামতে হ'ল; প্রতিজ্ঞা করলুম, বাবার দেনা শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত বিষয়ের একটি পয়সা আমি নিজের জন্যে খরচ করব না, কোনও রকম বিলাসে যোগ দেব না, বিবাহ করব না।—বাবার মহাজনদের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে আমি মাকে নিয়ে বর্ম্মায় চ'লে যাই, সেখানে একটা কাঠের কারবারে প্রথমে চাকরী নিই, এখন ওখানকার সব চেয়ে বড় কাঠের কারবারের এক রকম আমিই মালিক। আপনারা একটু সন্ধান নিলেই এ, পি, ঘোষ এণ্ড কোম্পানীর কথা জানতে পারবেন।

দিবাকরবাবু কহিলেন,—সেয়ার মার্কেটের সংস্রবে আমি এই কোম্পানীর নাম জানি। তা হ'লে কি আপনিই অনুপম ঘোষ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর?

আজ্ঞে হাঁ, আমারই ঐ নাম। আঠারো বছর বয়সে মাকে নিয়ে বর্ম্মায় গিয়েছিলুম, চোদ্দ বছর পরে সম্প্রতি দেশে ফিরিছি, মাও সঙ্গে এসেছেন দেশে,—বাবার দেনা শোধ হয়ে গিয়েছে, দেশের এষ্টেট এখন দায়-শূণ্য, বিদেশের ব্যবসায়ের আয়ও মন্দ নয়, বছরে আমাকে উপস্থিত হাজার সাতেক টাকা আয়করই দিতে হয়;—এখন যদি আমাকে পছন্দ করেন, আমার সম্বন্ধে দেশে ও বর্ম্মায় তদন্ত করলে সবই জানতে পারবেন।

বাহিরের ঘরে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই বুঝিলেন যে, এই লোকটির সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা ভাবিয়াছিলেন, অর্থ ও প্রতিপত্তির দিক্ দিয়া ইনি তাঁহাদের কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন;—সত্যকার একজন জেদী লোক, মানুষের মত কৃতী মানুষ,—এখন তাঁহার চেহারায় কত অভিনব সৌন্দর্য্যই প্রকাশিত!

দিবাকরবাবু কাশিয়া কণ্ঠটি পরিষ্কার করিয়া কহিলেন,—যৌতুক সম্বন্ধে আপনার কি পরিমাণ দাবী?

এই প্রশ্নে অনুপম যেন সহসা চমকিত হইয়া উঠিলেন;—সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি কহিলেন,—বিজ্ঞাপনে ত যৌতুকের কথা নেই, থাকলে আমি আসতুম না এখানে; আমি এসেছি আপনার কাছে—আপনার কন্যাকে সহধর্ম্মিণীরূপে পাবার জন্য ভিক্ষা চাইতে, এর সঙ্গে যৌতুকের কোনও দাবী-দাওয়া ত নেই!

সকলেই পুনরায় বিস্ময়ানন্দে এই অদ্ভুত মানুষটির দিকে চাহিলেন! সুধা বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়াই যুক্ত হাত দুইখানি ললাটে তুলিয়া নীরবে নমস্কার জানাইয়াছিল, এইবার সে আস্তে আস্তে উঠিয়া শাড়ীর সুদীর্ঘ অঞ্চলটি কণ্ঠের উপর দিয়া ঘুরাইয়া অনুপমের পদতলে নতমস্তকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিল।

অনুপম অকস্মাৎ এইভাবে বিব্রত হইয়া শশব্যস্তে উঠিতে না উঠিতেই সুধা তাহার কাজ শেষ করিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

দিবাকরবাবু স্তব্ধবিস্মিত অনুপমের মুখের দিকে চাহিয়া সহাস্যে কহিলেন,—আমার কোন আপত্তিই নেই, অনুপমবাবু! আমার কন্যা তোমাকে পছন্দ করেছেন!

* * * *

বিবাহ উপলক্ষে সুধার মাতুলালয়ের সকলেই আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মাতুল-কন্যা নির্ম্মলা ছিল সুধারই সমবয়স্কা; অল্প বয়সেই তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আধুনিক নভেলগুলি রীতিমত পড়িয়া নিরাশ প্রেমের তত্ত্বটুকু সে ভালভাবেই উপলব্ধি করিয়াছে, ইহাই তাহার ধারণা। অবনীর সহিত সুধার সংস্রবের কথা তাহার অজ্ঞাত ছিল না, অবনীকে সে দেখিয়া গিয়াছে এবং তাহার সম্বন্ধে এরূপ মত প্রকাশও করিয়াছে যে—সত্যি, দেখবার ও দেখাবার মত বটে!

সেই অবনীর সহিত সুধার বিচ্ছেদ এবং এই বিবাহের বর অনুপমের আলেখ্য দেখিয়া সে নির্ব্বিচারেই সাব্যস্ত করিয়া ফেলিল—হতভাগী সত্যিই জীবন্মৃত হয়েছে!

সুধাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া সে সমবেদনার সুরে প্রশ্ন করিল,—আমার কাছে লুকুসনি, ভাই। অবনীবাবুকে সত্যই কি ভুলতে পেরেছিস্? আমি ত ভেবে পাইনে, তার সেই কামদেবের মত চেহারা ভুলে, এই কাঠখোট্টার মূর্ত্তি মনের ভেতর ধরা কতখানি সম্ভব!

নির্ম্মলা ভাবিয়াছিল, না জানি সুধা কত বড় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আর্ত্তস্বরে তাহার মর্ম্মকথা প্রকাশ করিবে! কিন্তু—সে স্তব্ধ হইয়া দেখিল,

সুধার সুন্দর মুখখানি নির্ম্মল, তাহাতে কি অপূর্ব্ব দীপ্তি! প্রসন্ন মুখে হাসির ঝিলিক তুলিয়া সুধা নির্ম্মলার একখানি হাত ধরিয়া কহিল,—আয় পোড়ারমুখী আমার ঘরে, তোর কথার জবাব দিই।

নির্ম্মলাকে নিজের ছোট ঘরখানির মধ্যে টানিয়া সুধা তাহার হাতে একখানি ছবির য়্যালবাম দিল। তাহাতে পাশাপাশি দুইখানি ছবি অঙ্কিত। নির্ম্মলা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিল, একখানি সুন্দর মুখে কি কদর্য্যতার কালিমা লিপ্ত; সুন্দর মুখ যে এত বিশ্রী হইতে পারে, তাহা বুঝি সে এই প্রথম এই চিত্রে দেখিল! কিন্তু এ মুখ কাহার? যেন কতকটা পরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে না? যেন এ মুখ সে দেখিয়াছে,—কিন্তু কোথায়? কিছুক্ষণ নিবিষ্টভাবে ছবিখানির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেই সে শিহরিয়া উঠিল; কি সর্ব্বনাশ,—এ যে অবনীবাবুর মুখ!

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুধার মুখের দিকে চাহিয়া রূঢ়কণ্ঠে নির্ম্মলা কহিল,—করেছিস্ কি, পোড়ারমুখী! শিবকে একেবারে বাঁদর ক'রে এঁকেছিস্!

নির্ম্মলা সহজকণ্ঠেই উত্তর দিল,—শিবের মূর্ত্তি ধ'রেই সে একদিন সত্যই দেখা দিয়েছিল, কিন্তু মুখোস খুলতেই বাঁদরের মূর্ত্তি বেরিয়ে পড়েছে!—এখন তার কথা মনে হ'লেই এই কদর্য্য মূর্ত্তি আমার চোখের ওপর ভেসে ওঠে,—এই আমার, সাধনা।

আর এ মূর্ত্তিটা কার লো!—বাঃ! কি সুন্দর চেহারা! কি টানা চোখ, কি টিকোলো নাক, কি চমৎকার মুখ!—কার ছবি, ভাই?—এ যে আসল অবনীবাবুর চেয়েও ঢের বেশী সুন্দর! এ কে?

নির্ম্মলা সকৌতুকে সুধার দিকে চাহিতেই দেখিল, সেও তন্ময় হইয়া

এই মূর্ত্তিটির দিকে চাহিয়া আছে,—প্রেমের জ্যোতিতে তাহার দুই চক্ষু যেন জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে !

নির্ম্মলা আবার চাহিল ছবির দিকে—নিবিষ্টভাবেই কিছুক্ষণ বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল ; এতক্ষণে সে বুঝিল, এ ছবি কাহার ! বিস্ময়-পুলকে সুধার মুখের দিকে চাহিয়া গাঢ়স্বরে কহিল,—এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি ভাই, কি ক'রে তুই অবনীকে উপেক্ষা ক'রে অনুপমকে তোর হৃদয়-মন্দিরের সিংহাসনে বসাতে পেরেছিস্ ! তোর চিত্র-শিক্ষা সত্যিই সার্থক হয়েছে,—তাই নারীর নারীত্বকে নর্দ্দমার দিকে নামিয়ে না দিয়ে নিষ্ঠার মন্দিরে এমন ক'রে তুলতে পেরেছিস্,—তুই ধন্য, সত্যই ধন্য !

সুধা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল,—এ আমার চিত্তের সাধনা !
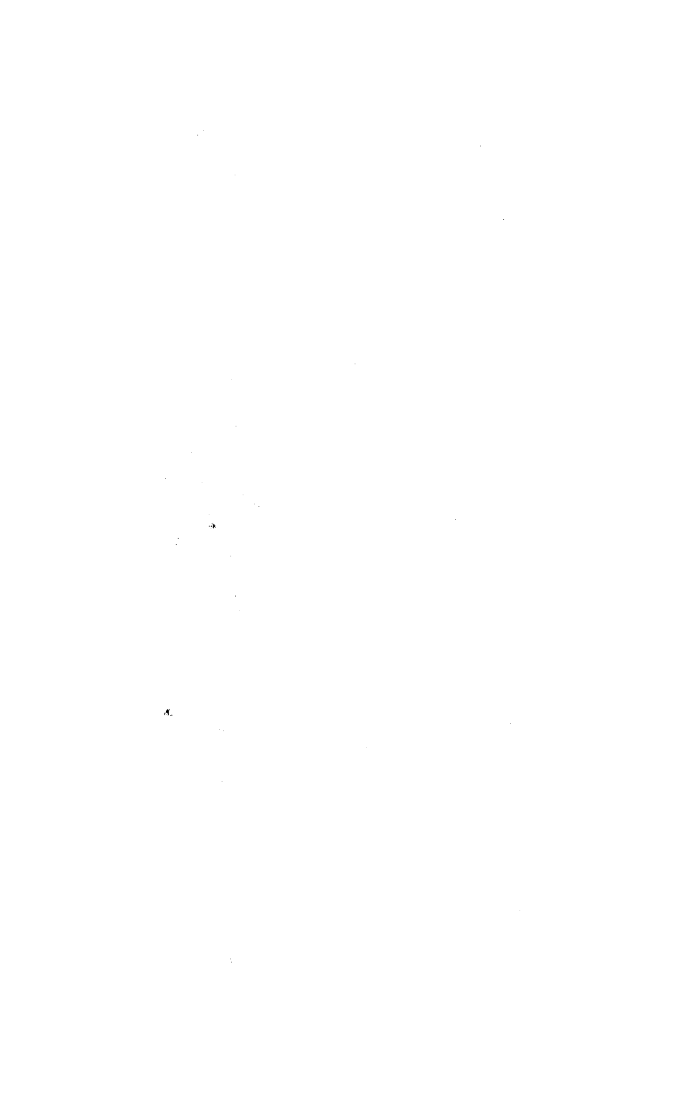
অদৃষ্টের ইতিহাস

দ্বিতীয় অধ্যায়

তিতিক্ষা

রাজনগর এষ্টেটের সদর সেরেস্তার কায সারিয়া নবীন জমিদার নির্ম্মলেন্দু পালিত বাহিরের সুসজ্জিত বৈঠকখানায় সবেমাত্র আসীন হইয়াছেন, এমন সময় সেরেস্তার ডাক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আমলা নুটবিহারী হালদার সসঙ্কোচে সেই কক্ষে ঢুকিয়া হুজুরের উদ্দেশে মাথাটি আবক্ষ নত করিয়া দিল, তাহার হাতে ছিল বাদামী রঙের খামে ভরা একখানা চিঠি, আষ্টে পৃষ্ঠে তাহার ডাকঘরের মোহরের কালো ছাপ। ডাকের চিঠিপত্র এই আমলাই বুঝিয়া লয় এবং সেরেস্তার গদীতে হুজুর যখন উপস্থিত থাকেন, সে সমস্তই বুঝাইয়া দেয়। আজও যথাসময় নিজরোজের ডাক বুঝাইয়া দিয়াছিল। সুতরাং অসময়ে পুনরায় তাহাকে এভাবে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নির্ম্মলেন্দু বাবু ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন,—কি ব্যাপার ?

তিনি ভাবিয়াছিলেন, চিঠিখানা দাখিল করিতে তখন ভুল করিয়াছিল, এখন তাই ছুটিয়া আসিয়াছে। কর্ম্মচারির এরূপ ত্রুটিতে তাঁহার দৃষ্টি ও ভঙ্গী তীক্ষ্ণ হইবারই কথা। কিন্তু নুটবিহারী অতি বিনীতভাবে নিবেদন করিল,—আজ্ঞে, চিঠিখানা এইমাত্র ডাকপিওন নিয়ে এল, এখানা বেয়ারিং হয়ে এসেছে ; নেওয়া হবে কি ?

রাজনগর এষ্টেটের বার্ষিক মুনফা নানা সূত্রে যদিও অর্দ্ধ লক্ষের নিম্নে কখনও নামিত না, তথাপি হুজুরের মঞ্জুরী ব্যতীত একটি পাই-পয়সাও বাজে খরচ করিবার অধিকার সেরেস্তার কোনও বিভাগের কর্ম্মচারীদের ছিল না। কাযেই মাশুল দিয়া চিঠিখানা রাখিবার দায়িত্বটুকু এড়াইবার প্রয়াস, নুটবিহারীর পক্ষেও স্বাভাবিক। কিন্তু নির্ম্মলেন্দু বাবু বিরক্তভাবে

রুক্ষকণ্ঠে কহিলেন,—বেয়ারিং চিঠি মাশুল দিয়ে কোনো দিন নেওয়া হয়েছে যে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ।

ফুটবিহারী তথাপি দমিল না, আমতা আমতা করিয়া কহিল,—আজ্ঞে, চিঠিখানায় আমলবাজার পোষ্ট আফিসের ছাপ রয়েছে, সেই জন্যেই—

আমলবাজারের নামটি শুনিবামাত্রেই হুজুরের মুখের উগ্র ভাবটুকু তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। নির্ম্মলেন্দু বাবু এবার হাতখানা ফুটবিহারীর দিকে বাড়াইয়া দিয়া কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ কণ্ঠেই কহিলেন,—দেখি।

চিঠিখানা লইয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিলেন, গোটা গোটা বাঙ্গালা ও ইংরেজী অক্ষরে শিরোনামা লেখা

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু পালিত
জমিদার, রাজনগর এষ্টেট
টালিগঞ্জ, কলিকাতা।

অতঃপর তিনি ফুটবিহারীর দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই কহিলেন,—আচ্ছা, ডাক-খাতে খরচ লিখিয়ে দু' আনা দিয়ে দাও।

ফুটবিহারী পুনরায় মাথাটি নত করিয়া হুজুরের সম্মান দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। হুজুর তখন লেফাফাখানা কতকটা নিষ্ঠার সহিত সন্তর্পণে খুলিয়া পাঠ সুরু করিয়া দিয়াছেন।

চিঠি পড়িতে পড়িতে নির্ম্মলেন্দুর মুখ ও চক্ষুর উপর উত্তেজনার চিহ্ন পড়িল; পরক্ষণেই চিঠিখানা দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া রূঢ়স্বরে তিনি [illegible] তুলিলেন,—বটে! আমার সঙ্গে চালাকী, জোচ্চুরির আর জায়গা পান নি, দেখে নেব আমি, দেখে নেব।

সতীর্থ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু যামিনীপ্রকাশ এবং রাসবিহারী নির্ম্মলেন্দুর

বিশেষ নিমন্ত্রণে আজ অপরাহ্ণে পরামর্শের জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—ব্যাপারখানা কি?

নির্ম্মলেন্দু হাতের চিঠিখানা যামিনীপ্রকাশের হাতে দিয়া কহিলেন,—পড়ে দেখ।

যামিনীপ্রকাশ পড়িলেন, রাসবিহারীও ব্যগ্রভাবে চিঠিখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

খামের ভিতরে চিঠির আকারে যে গোলাপী রঙের কাগজটুকু ছিল, তাহাতে কালো কালিতে শিরোনামার অনুরূপ পরিষ্কার অক্ষরে বাঙ্গালায় এইরূপ কয়টি ছত্র লেখা ছিল,—

মাননীয় মহাশয়,

গত রবিবার সন্ধ্যায় আলমবাজারে বটুকনাথ বসুর ভাগিনেয়ী কুমারী সীতা দাসীকে আপনি সদলবলে দেখিতে আসেন এবং কন্যা যে আপনার বিশেষ পছন্দ হইয়াছে, ইহাই সকলের ধারণা। কিন্তু আসল বিষয়টিতে যে একটু গলদ রহিয়াছে, সেটুকু যাহাতে কাটাইয়া আপনি কন্যাটিকে গ্রহণ করিতে পারেন, সেই জন্যই উভয় পক্ষের হিতৈষী স্বরূপ এই চিঠিখানা লিখিতেছি। যে মেয়েটিকে আপনারা দেখিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম সুনন্দা, সীতা নহে এবং বটুক বাবু নিজের ভাগিনেয়ী বলিয়া তাহার পরিচয় দিলেও বটুক বাবুর সহিত মেয়েটির কোনও সম্বন্ধ নাই; যেহেতু সে তাঁহার প্রতিবেশী অবনী ঘোষের কন্যা। বটুক বাবুর ভাগিনেয়ী সীতা সুশ্রী নয় বলিয়াই সম্ভবতঃ সেদিন এই অপ্রীতকর ব্যবস্থা হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, আপনি আর একদিন সদলবলে ঐ পাড়াতেই অবনী ঘোষের কন্যা সুনন্দাকে দেখিতে আসিলেই বুঝিতে পারিবেন, চিঠিখানি অমূলক নহে।

কিন্তু পত্র প্রেরকের এইমাত্র অনুরোধ, এই সূত্রে বেচারী বটুক বাবুর উপর এই প্রসঙ্গ লইয়া কোনোরূপ চাপ না পড়ে। লেখাই বাহুল্য যে, সুনন্দার পিতা সানন্দেই আপনার ন্যায় বিখ্যাত জমিদারকে কন্যাদান করিয়া ধন্য হইবেন। ইতি

কোনও সত্যনিষ্ঠ "হিতৈষী"

যামিনীপ্রকাশ অতঃপর মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—তা হ'লে হোপলেস্ নয়!

নির্ম্মলেন্দু বাবু কহিলেন,—কিন্তু আমি ভাবছি, ঐ বটুক বোস লোকটা কি রকম সেমলেস্ ক্রীচার!

রাসবিহারী গম্ভীরভাবে বলিলেন,—সে কথা একশো বার!

যামিনীপ্রকাশ তখন পরামর্শ দিলেন,—কিন্তু এ রকম ব্যাপার এই নতুন নয়, হামেসাই হচ্ছে; এখন এই নিয়ে সোরগোল তোলাও ঠিক নয়, বরং হঠাৎ আসল জায়গাটায় ধাওয়া করা উচিত।

নির্ম্মলেন্দু বাবু গম্ভীরভাবেই কহিলেন,—কিন্তু তারা যদি আমোল না দেয়?

যামিনী বলিলেন,—মেয়ের বিয়ের সমস্যা যে রকম আমাদের দেশে দাঁড়িয়েছে, তাতে তোমার মত যোগ্য পাত্রকে মেয়ে দেখাতে কেউ অরাজি হবে ব'লে মনে হয় না।

রাসবিহারী বলিলেন, কিন্তু, হঠাৎ যাওয়া চাই। আগে থেকে খবর দেওয়া হবে না।

নির্ম্মলেন্দু বাবু গম্ভীরমুখেই বলিলেন,—তা হ'লে কাল রবিবার ঠিক তিনটেয় আমরা বেরুব, এই স্থির রইল। তোমাদেরও সঙ্গে যেতে হবে।

২

যে আলোচনা মুলতুবীই ছিল এবং সেরেস্তার পর সবন্ধু নির্ম্মলেন্দুর যাহাতে নিবিড়ভাবে যোগ দিবার কথা, তাহার বিষয়বস্তু পূর্ব্বোক্ত চিঠিখানায় বর্ণিত কন্যাটি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। বস্তুতঃ কন্যাটিকে দেখিয়া নির্ম্মলেন্দু বাবু মুগ্ধই হইয়াছিলেন এবং ইহার মাত্রা এতটা ছাপাইয়া গিয়াছিল যে, রীতিমত রাশভারি হইয়াও মুখের কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের আবরণটুকু শেষ পর্য্যন্ত যথাযথভাবে রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই; তাঁহার ক্ষৌরিত মুখমণ্ডল সহসা হাস্যোদ্ভাষিত হইয়া উঠে ও ওষ্ঠপ্রান্তে প্রসন্নতার ঝিলিকটুকু হাসির আকারে মুখের বাণী টানিয়া আনে—বাঃ!

এই একটি বাক্যেই কন্যাপক্ষ বুঝিয়াছিলেন, কন্যার প্রখর রূপের তাপে পাত্রের চক্ষু ঝলসিত হইয়াছে। রূপ দেখার পর, গুণ যাচাই করিবার কথা উঠিতেই কন্যা অসঙ্কোচে ও অতিশয় তৎপরতা সহকারে সে সম্বন্ধে যে পরীক্ষা দিল, অর্থাৎ স্বহস্তে হার্ম্মোনিয়াম বাজাইয়া রবীন্দ্রনাথের অতি আধুনিক কয়েকখানি গান বাছিয়া বাছিয়া গাহিয়া, গীতাঞ্জলির কতিপয় কবিতা আবৃত্তি করিয়া, এবং পার্ব্বতী নৃত্যে দেহযষ্টির নানারূপ লীলায়িত ভঙ্গিমার পরিচয় দিয়া যখন বিদায় লইল, তখন তিনি এমনই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার অজ্ঞাতেই যেন গম্ভীর মুখখানা সহসা প্রসন্ন হইয়া মনের কথা বাহির করিয়া দিল,—নাইস্!

কন্যাপক্ষ তখন আশান্বিত হইয়া প্রশ্ন তুলিতে গেলেন,—তা হ'লে—

প্রশ্নটি শেষ করিবার অবসর না দিয়াই নির্ম্মলেন্দু বাবু কহিলেন,—দেখা ত হ'ল, পরের কথা বিবেচনা ক'রে আপনাকে জানাবো।

কন্যাকর্ত্তার পুনরায় প্রশ্ন,—তা হ'লে কবে দেখা করব ?

নির্ম্মলেন্দু বাবু কহিলেন,—আপনাকে আর কষ্ট ক'রে যেতে হবে না, আসছে সপ্তাহের মধ্যেই আমার লোক আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে আমার যা অভিমত জানাবে।

ফিরিবার সময় পথেই যদিও নির্ম্মলেন্দু বাবু তাঁহার অভিমত অন্তরঙ্গ-দের নিকট অকপটেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং পরদিনই টালিগঞ্জের সেরেস্তার সকল কর্ম্মচারীই জানিয়া ফেলিয়াছিল যে, আনন্দবাজারে তাহাদের হুজুরের দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত বিবাহের ফুলটি ফুটনোন্মুখ হইয়াছে, তথাপি জমিদারী কায়দা-কানুন অক্ষুণ্ণ রাখিতে চতুর্থ দিনে সেরেস্তার ছুটির পর বৈঠখানায় এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য সে দিনের সহচরযুগল আহূত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে হইতেই একরূপ স্থির হইয়াছিল যে, আলোচনার পর সেই দিনই কন্যাপক্ষকে জানান হইবে—কন্যা পছন্দ হইয়াছে, তবে চৌরঙ্গীতে একখানা বড় বাড়ী লইয়া বিবাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে, অবশ্য বিবাহের যাহা কিছু ব্যয় পাত্রপক্ষই বহন করিবেন।

কিন্তু সেদিন আর এ সকলের কিছুই প্রয়োজন হইল না. বেনামা বেয়ারিং পত্রখানা সমস্তই ওলটপালট করিয়া দিল। পত্রখানা নাম না থাকিলেও, যে লিখিয়াছিল, তাহার প্রতি ছত্রই যে অতি সত্য ও অব্যর্থ, তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র ছিল না।

৩

যাহারা অন্যের মাথায় কাঁটাল ভাঙিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধ করিতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় না, সুখ ও সুবিধাটুকু আদায় করিয়া লইতে যাহারা অসঙ্কোচে মিথ্যার পথে তাসের প্রাসাদ তুলিয়া কথায় কথায় লক্ষিতদের বিভ্রান্ত করিয়া দেয়, নিজের স্ত্রী ও সন্তান ভিন্ন 'বসুধৈব' অন্য সকলকেই স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে যাহাদের চিত্ত শিহরিয়া উঠে না,—এই শ্রেণীর দুঃসাহসী সুবিধাবাদীদের শীর্ষে উঠিয়াছিলেন, আলমবাজারের বটুকনাথ বসু।

'সপ্তদশী তরুণী সীতা ইঁহারই ভাগিনেয়ী এবং অতি শৈশবে যখন এই অভাগিনী বন্যারে আকস্মিকভাবে পিতামাতাকে হারাইয়া অনাথিনী হয়, তখন বটুকবাবুই তাহাকে আশ্রয় দিয়া এ পর্য্যন্ত প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, এই তথ্যই এ অঞ্চলের সকলেই জানিতেন এবং বটুকবাবুও যখন তখন তাঁহার এই কর্ত্তব্যপালনের আখ্যানটুকু অতিরঞ্জিত করিয়া প্রতিবাসীদের শুনাইয়া দিতেন। কিন্তু তাঁহার এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অন্তরালে অর্থসংক্রান্ত যে গোপনীয় রহস্যটি প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহার সন্ধান রাখিতেন বা সে সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, পরিচিত সমাজে এমন কাহারও অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইত না। এই পরিবারটির আত্মীয়, অনাত্মীয় বা প্রতিবাসিদের মধ্যে কেহই জানিবার অবকাশ পান নাই যে, সীতার পিতার নিকট কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বটুক বসু কি পরিমাণে উপকৃত এবং মাত্র একমাসের ব্যবধানে এই অভাগিনীর পিতামাতার মৃত্যু স্বার্থের দিক্ দিয়া তাঁহার কতখানি সুবিধা ঘটাইয়াছিল!

সীতার পিতা উপেন্দ্রনাথ বন্যারে কয়লার কারবার করিতেন।

ইহাতেই তিনি প্রচুর প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। ব্যবসায়গত অভিজ্ঞতা ও সাধুতার মূলধন লইয়া তিনি অল্প দিনের মধ্যেই লক্ষ্মীর করুণাটুকুও আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন। যখন উপেন্দ্রনাথের কারবারে জোয়ারের টান চলিয়াছে, সেই সময় সহসা বক্সারে বটুক বসুর আগমন হয়। উদ্দেশ্য, একটা ইনসিওরেন্সের প্রতিষ্ঠান খুলিয়া তিনি ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিতে চান, কিন্তু তাঁহার ত অর্থ নাই, উপেন্দ্রনাথ যদি এ ক্ষেত্রে 'গৌরীসেন' হন! এমন উচ্ছ্বসিত ভাষায় বটুকবাবু তাঁহার প্রয়োজন ও ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠানটির বিবরণ ব্যক্ত করিলেন যে, সরলস্বভাব সত্যনিষ্ঠ উপেন্দ্রনাথ তাঁহাতে মূলধন লগ্নী করিবার আশ্বাস না দিয়া পারিলেন না। স্থির হইয়া গেল, সপ্তাহ-খানেকের মধ্যেই উপেন্দ্রনাথ তাঁহাকে হাজার দশেক টাকা দিয়া প্রতিষ্ঠানটির পেট্রণ ও পার্টনার হইবেন। কিন্তু সপ্তাহখানেক পরেই সহসা সমস্ত ওলটপালট হইয়া গেল। যে দিন উপেন্দ্রনাথ বটুকবাবুকে পুরা টাকাটাই বুঝাইয়া দিলেন, তাহার কয়দিন পরেই তি[illegible] সংক্রামক ব্যাধির কবলে পড়িয়া শয্যাশায়ী হইলেন। বক্সারে সে[illegible]ময় প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছিল; বাঙালীদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথই [illegible]ম আক্রান্ত হওয়ায় প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজে আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। সকল চেষ্টা, যথোপযুক্ত চিকিৎসা ও পত্নী সুশীলার প্রাণপণ শুশ্রূষা ব্যর্থ করিয়া তৃতীয় দিনে উপেন্দ্রনাথ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার চিতার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে না হইতেই সাধ্বী পত্নী সুশীলাও এই কাল ব্যাধির কবলে পড়িলেন, তিনিও পরিত্রাণ পাইলেন না, অষ্টম দিনে মহাশ্মশানের যে স্থানে স্বামীর চিতা প্রজ্বলিত হইয়াছিল, সদ্যস্বামিহারা সাধ্বীর নশ্বর দেহও সেই স্থানে ভস্মীভূত হইল। এক পক্ষের মধ্যেই চলিয়া গেল এই সুখী দম্পতির প্রবাস-জীবনের সকল প্রতিষ্ঠা ও কর্ম্মক্ষেত্রের সফলতা,

চলিয়া গেল অনন্তের পথে এই আদর্শ দম্পতির নির্ম্মল আত্মা; পড়িয়া রহিল ইহলোকে তাঁহাদের উপার্জ্জিত অর্থ, চিরপ্রিয় প্রতিষ্ঠান, একমাত্র আদরিণী কন্যা সপ্তমবর্ষীয়া সীতা।

মহাব্যাধি ক্রমশঃই করাল হইয়া মহামারী সুরু করিয়া দিয়াছে; আবালবৃদ্ধবনিতা সহর ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে ব্যস্ত। বটুকনাথের মনের ভিতর হাসি ও আতঙ্ক তখন যুগপৎ ছুটাছুটি করিতেছিল, এমন মাহেন্দ্রযোগের ইঙ্গিতটুকুই তাঁহার মত স্বভাবসিদ্ধ সুবিধাবাদীর পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং সহরব্যাপী এই চাঞ্চল্যের সুযোগে তিনি কর্ম্মচারীদের ছুটী দিলেন, গুদামগুলিতে তালা পড়িল; সঙ্গে সঙ্গেই তৎপরতার সহিত বাসায় রক্ষিত কারবারের অর্থ, অলঙ্কার ও মূল্যবান্ জিনিস-পত্রগুলির সহিত শোকাতুরা ভাগিনেয়ী সীতাকে লইয়া বক্সার ত্যাগ করিলেন। মাস খানেক পরে প্লেগের প্রাদুর্ভাব কমিয়াছে শুনিয়া তিনি পুনরায় মৃত ভগিনীপতির কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু কারবার চালাইতে নহে, তাহার অবশিষ্ট রসটুকু শোষণ করিয়া লইতে। উপেন্দ্রনাথ ব্যবসায়ক্ষেত্রে ছিলেন অতিশয় সাঁচ্চা, বাজারে তাঁহার পাওনা প্রচুর থাকিলেও দেনার নামগন্ধও ছিল না। বুদ্ধিমান্ বটুকনাথ তাড়াতাড়ি কাজ গুছাইতে মূলা তোলার নীতি অবলম্বন করিলেন। অর্থাৎ আধা কড়িতে গুদামের মজুত মাল বিক্রয় করিয়া ও খাতকদের সহিত অনুরূপ রফা করিয়া টাকাটা হাতাইয়া ফেলিলেন। উপেন্দ্রনাথের বাসার যাবতীয় আসবাব-পত্রেরও সেই অবস্থা হইল। বটুকবাবুর স্ত্রী মনোরমা ভিন্ন এ সব কাহিনী তৃতীয় প্রাণী কেহই জানিবার সুযোগ পাইল না।

কিন্তু সস্ত্রীক বটুকনাথ অতি সন্তর্পণে তাঁহার এই ভাগ্যোদয়ের গোপন কাহিনী বরাবর চাপিয়া রাখিলেও, প্রায় দশ বৎসর পরে একদিন

আকস্মিকভাবে তাঁহার স্বহস্তে লেখা বঙ্কারের অর্থপ্রাপ্তির হিসাবের খাতাখানি বাতিল কাগজপত্রের ভিতর দিয়া সীতার হাতে আসিয়া পড়ে এবং সেইসূত্রে আশৈশব মাতুলালয়ে প্রতিপালিতা, চির-উপেক্ষিতা অনাদৃতা তরুণী সহজেই উপলব্ধি করিতে পারে যে, দীর্ঘ দশবৎসর কাল যে মাতুলের গলগ্রহ হইয়া আছে ও তাহার বিবাহ প্রসঙ্গে যে অর্থ-সমস্যা এ সংসারে অশান্তির ছায়া ফেলিয়াছে, তাহার ভিত্তি কোথায় ? প্রকাণ্ড মিথ্যা আশ্রয় করিয়া কত বড় অন্যায় ও কত হৃদয়হীন আচরণ তাহার মূলদেশ স্ফীত করিয়া তুলিয়াছে !

এই দীর্ঘ দশটি বৎসর এই সংসারে কিরূপ কষ্ট ও নির্যাতনের ভিতর দিয়া তাহাকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছে দিনযাত্রার এমন একটি দিনের সহিত তাহার পরিচয় নাই, মামা ও মামীর প্রসন্নতার সহিত যাহা অতীত হইয়াছে ; তাঁহাদের তীক্ষ্ণ কণ্ঠের তিরস্কার তীরের ফলার মত তাহার কোমল বুকটিতে বিঁধে নাই ! এ বাড়ীতে আসিয়া অবধি কোনও কার্য্যেই ত সে অবহেলা করে নাই ;—প্রায় প্রতি বৎসরই মামী যে সকল সন্তান প্রসব করিয়াছেন, তাহাদিগকে কোলে পীঠে লইয়া 'মানুষ' করিতে হইয়াছে—তাহাকেই ; ঝিয়ের অবর্ত্তমানে অথবা ঝি থাকিলেও উচ্ছিষ্ট বাসন মাজিবার অংশ বরাবরই সে গ্রহণ করিয়াছে ; ইহা ভিন্ন সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম, এমন কি রান্নাবান্নার ভার পর্য্যন্ত তাহাকে লইতে হইয়াছে। কিন্তু তথাপি সে এই অবিচারী অভিভাবকের মুখে প্রশংসার গুঞ্জন কোনও দিন শুনে নাই। এখনও বঙ্কারের শৈশব-স্মৃতি স্বপ্নের মত তাহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া তুলে, সঙ্গে সঙ্গে মনে ভাসিয়া উঠে ছায়ার মত দুইখানি স্নেহমাখা মুখ, আর কত রকমের অবর্ণনীয় সুখ যেন সে ক্ষণিকের জন্য উপলব্ধি করে !

পড়াশুনায় দিকে তাহার কত অনুরাগ, কিন্তু মামা মামী সে সম্বন্ধে কোনও উৎসাহই তাহাকে দেন নাই। নিজের চেষ্টায় ও অসাধারণ প্রতিভার সহায়তায় সে যেটুকু শিক্ষা আয়ত্ত করিয়াছে, তাহার পরিচয় কোনও দিন কাহাকেও দেয় নাই। মামার ছেলে-মেয়েরা গৃহশিক্ষকের নিকট যখন পড়াশুনা করিত, সেই সময়টুকুই কেবল সে মামীর শত গঞ্জনা সহ্য করিয়াও সেদিকে চিত্তনিবেশ করিত। সহৃদয় প্রবীণ শিক্ষক মহাশয় বালিকার অসামান্য মেধার নিদর্শন পাইয়া বিস্মিত হইতেন, এই ছাত্রীটির সম্বন্ধে প্রাপ্তির কোনও সম্ভাবনা না থাকা সত্বেও তিনি বিশেষ যত্নের সহিত তাহাকে শিক্ষা দিতেন।

সীতার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মামা মামীর দুশ্চিন্তাও বাড়িতেছিল, কি করিয়া এই ধেড়ে মেয়েকে পার করিবেন। একে ত গায়ের রঙটুকু তাহার ফর্‌সা নহে, মেয়ে মহলে যে রঙ 'উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ' বলিয়া পরিচিত, তাহাও নহে, বরং মেয়েটিকে কালো বলাই চলে। যদিও মাথার চুল অতিশয় বাড়ন্ত, জানু অতিক্রম করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং দুই চক্ষু খুবই ডাগর, দৃষ্টি অতি স্নিগ্ধ, মুখখানিতে একটা অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি এ মেয়েকে ত সুন্দর বলা চলে না। তাঁহার হাতে যে সব বড়ঘরের মক্কেল আছেন, তাঁহারা সকলেই চান, মেয়ের গায়ের রঙটুকু হইবে যেন ঠিক দুধে-আলতায় গোলা, তবে সেই মেয়ে তাঁহাদের মনে ধরিবে এবং তাহাতে টাকার দিক্ দিয়াও যথেষ্ট সাশ্রয় হইবে। গায়ের এই রঙটুকুর মালিন্যেই সীতাকে কালো মেয়ের পর্য্যায়ে পড়িতে হইয়াছে, কাজেই, এ ক্ষেত্রে কোন বড় ঘরে যে তাহার বিবাহ হইবে না এবং যেমন তেমন ঘরে এই বাপ-মা-হারা মেয়েটিকে দিতে হইলেও যে প্রচুর পণের প্রয়োজন, তাহা কোথা হইতে আসিবে! ইদানীং সীতাকে

কথায় কথায় খোঁটা দিবার ইহাই প্রধান উপলক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সীতার গায়ের রঙ ময়লা, পাত্রের অভিভাবকেরা তাহাকে দেখিতে আসিয়া মোটা টাকা দাবী করে, এগুলি যেন সীতারই গুরুতর অপরাধ! এ সংসারে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কেহ কোনও অপরাধ করিলে তাহার লাঞ্ছনার অন্ত থাকে না। সীতা এ পর্য্যন্ত মুখটি বুজিয়া সমস্তই সহ্য করিয়াছে, সময় সময় সে নির্জ্জনে বসিয়া ইহাও ভাবিতে চেষ্টা পাইয়াছে যে, তাহার মামীর পর পর তিনটি মেয়েই বয়সে তাহার চেয়ে ছোট হইলেও তাহাদের বিবাহ ত আটকায় নাই, তাহারা যে খুব সুশ্রী ও সুন্দরী, এ কথা কেহই স্বীকার করিবে না, কিন্তু তথাপি তাহাদিগকে কোন খোঁটাই ত শুনিতে হয় নাই! তবে এ বৈষম্য কেন?

পরক্ষণেই এ প্রশ্নের সমাধান সে নিজেই করিয়া ফেলিত; তখন স্বর্গগত পিতামাতার উদ্দেশে অভিমান তাহার নির্ম্মল বুকখানির ভিতর পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিত, আর্ত্তকণ্ঠে সে প্রশ্ন তুলিতে চাহিত,—এ ভাবে সে ইহাদের গলগ্রহ হইল কেন? তাঁহাদের সে ঐশ্বর্য্য কোথায় গেল

শুদ্ধচিত্ত কুমারীর এ প্রশ্নের উত্তর ভবিতব্যই দিলেন। তাঁহার অমোঘ বিধানে মামার ঘরের স্তূপীকৃত পুরাতন কাগজপত্র ... সে দিন বাতিল হইয়া উঠানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। মামী মনোরমা হিসাবী গৃহিণী ছিলেন। তাঁহার সংসারে কোনও জিনিসেরই অপচয় হইবার জো ছিল না; বাতিল কাগজের স্তূপ উঠানে পড়িতেই সেগুলি গুছাইয়া ছোট ছোট তাড়া বাঁধিবার ভার সীতার উপরেই পড়িল, যেহেতু উনানের কয়লায় আঁচ দিবার সময় কাগজগুলি কাজে লাগিবে। সীতার এ সম্বন্ধে একটা অভ্যাস ছিল, সীতার মামী সেটাকে দোষ বলিয়াই গণ্য করিতেন। কিন্তু সে দোষ বা অভ্যাসটি পল্লীগ্রামের লেখা-পড়া জানা মেয়েদের মধ্যেও

অন্নবিস্তর দেখা যায়। সেটি আর কিছু নয়, ছাপা কাগজ হাতের কাছে আসিলেই একান্ত আগ্রহে তাহা পড়িবার চেষ্টা। পাঁচফোড়নের মোড়ক বা চিনির ঠোঙ্গায় যদি বাঙালা হরফ ছাপা থাকে, রন্ধনশালার মা-লক্ষ্মীরা তাহাদেরও অমর্য্যাদা করেন না। সীতাও বাতিল কাগজগুলি গুছাইতে বসিয়া একখানা ছেঁড়া কেতাবের ভিতর যে ক্ষুদ্র খাতাখানি পাইল, তাহার লেখাগুলি পড়িতেই তাহার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল এবং পিতা-মাতার সম্বন্ধে যে অভিমান মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, তাহারও অবসান হইয়া গেল।

সেইদিনই অপরাহ্নে সীতা মামার বসিবার ঘরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল,—আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম, মামা!

আফিস হইতে ফিরিয়া জলযোগ সারিয়া মামা তখন খবরের কাগজে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। সীতার কথায় বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিলেন, ভাগিনেয়ীর এতটা সাহস ইতঃপূর্ব্বে তিনি কোনও দিনই দেখেন নাই।

মামার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই প্রশ্নের আভাস পাইয়া সীতা কহিল,—আমি ভালো ক'রে লেখা পড়া শিখতে চাই, মামা!

মুখে একটু তীক্ষ্ণ হাসির ঝিলিক তুলিয়া বিদ্রূপের সুরে মামা কহিলেন,—বটে! তা হঠাৎ এ খেয়ালটা তোর মাথায় কে চাপিয়ে দিলে শুনি?

সীতা স্নিগ্ধকণ্ঠে উত্তর দিল,—আপনি ত জানেন মামা, পরের কথা শুনে নাচবার অভ্যাস আমার কোনো দিন নেই। নিজের ভার নিজে যাতে নিতে পারি, সেই জন্যই আমার পড়াশুনার ইচ্ছা হয়েছে।

কণ্ঠের স্বর রুক্ষ করিয়া মামা কহিলেন,—সে ত হবারই কথা, সংসারে কেউ যখন তোর ভার নিতে চাইছে না—

দৃঢ়স্বরে সীতা কহিল,—আমি তার জন্য কিছুমাত্র বিচলিত নই, মামা। আমার বিয়ের জন্য দুশ্চিন্তা আপনাকে আর বহন করতে হবে না। আমি স্থির করেছি, এ বৎসর প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেব।

কথাটা শুনিয়াই মামা স্তব্ধবিস্ময়ে ভাগিনেয়ীর মুখের দিকে চাহিলেন। আজ এই নিরীহপ্রকৃতি কিশোরীটির মুখের উপর দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া বুঝিলেন, মূকের মুখই শুধু খুলে নাই, তাহার উপর দৃঢ়তার এমন একটা দীপ্তি পড়িয়াছে, যাহা সত্যই অপূর্ব্ব।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মামা পুনরায় শ্লেষের সুরে কহিলেন,—আমি ত আর পাগল হই নি! তা ছাড়া, এটা ব্রহ্মজ্ঞানীর বাড়ী নয়। থাকতো তোর বাবা, তা হ'লে এ সব সাধ শোভা পেত।

আগুনে এবার আহুতি পড়িল। মুখখানা সহসা দৃপ্ত করিয়া সীতা কহিল,—আমার বাবা যদি আজ থাকতেন, তা হ'লে এ সব আলোচনা কি আমাকেই করতে হ'ত, মামা? আর, কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপনিও যদি সচেতন থাকতেন, এ প্রসঙ্গ আপনার কাছে তোলবার কি আজ প্রয়োজন হ'ত?

সমস্ত অন্তরটি মথিত করিয়া ক্রোধ ও অসন্তোষ মামার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর সপ্তমে উঠিল,—কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার মুখের ওপর এই কথা! আমাকে তুমি কর্ত্তব্য শেখাতে চাও!

চীৎকার শুনিয়া বাড়ীর সকলেই কর্ত্তার ঘরে ছুটিয়া আসিলেন। মামী মনোরমা অপাঙ্গে উভয়ের দিকেই চাহিয়া জানিতে চাহিলেন,—ব্যাপার কি! এমন ক'রে চেঁচামেচি করছ কেন?

বটুকবাবুর মুখখানা তখন ভৈরবের মতই ভীতিপ্রদ হইয়াছে; সহধর্ম্মিণীকে দেখিয়া দুই চক্ষু পাকাইয়া কহিলেন,—শোনো তোমার ভাগনীর কথা, উনি সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে লেখাপড়া নিয়ে মাতবেন। কথাটা আমার ভাল লাগছে না বলায় আমার মুখের ওপর ব'লে বসল—কোনো কর্ত্তব্যই আমি ওঁর সম্বন্ধে করি নি! একেই বলে—দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পোষা।

সীতার মুখ আজ খুলিয়াছিল, মামার শেষের এই কঠিন কথাটার উত্তর দিতেও সে অবহেলা করিল না। কণ্ঠের স্বরে উত্তেজনার সংস্রব সন্তর্পণে ত্যাগ করিয়া বেশ সহজ সুরেই কহিল,—কিন্তু আপনি যে ভুলে যাচ্ছেন মামা, সাপের দুর্ম্মূল্য মণিটি আত্মসাৎ ক'রে তার ছানার মুখে ছিটে ফোঁটা দুধ দিলে বিষ তার লুকিয়ে থাকে না, একদিন না একদিন ওঠেই।

যতই ঢাকিবার চেষ্টা করুন, কথাটা উপলব্ধি করিতে বটুকবাবুর বিলম্ব হয় নাই। ক্ষণকাল তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। মনোরমাও সীতার মুখে এই ধরণের কথা শুনিয়া প্রথমটা হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া হাত মুখ ঘুরাইয়া কহিলেন,—শোনো মেয়ের কথা! ও বাবা, পেটে পেটে এত! সাধে কি সবাই বলে—জন, জামাই, ভাগনা—এই তিন নয় আপনা! ভাগনে-ভাগনী এরা কখনো আপনার হয়! ঝ্যাঁটা মারো—ঝ্যাঁটা মারো—ঝেঁটিয়ে বিদেয় ক'রে দাও।

এরূপ তিরস্কার সীতার অদৃষ্টে এই নূতন নহে, কিন্তু ইহার যথোপযুক্ত উত্তর দেওয়া তাহার পক্ষে এই প্রথম। স্বামীর বিকৃত মুখখানার দিকে চাহিয়া সীতা আজ নির্ভয়ে কহিল,—বক্সার থেকে একদিন আমার বাবার

যথাসর্ব্বস্ব যখন ঝেঁটিয়ে আনতে পেরেছেন, মামীমা, এখন আমাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে ত আপনাদের বাধবে না।

মামা মামী উভয়েই যেন বিদ্যুতের একটা আকস্মিক ঝাঁকুনি খাইয়া ক্ষণকাল আড়ষ্ট হইয়া পড়িলেন। পরক্ষণে উভয়ের চোখে চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টির যে সংযোগ হইয়া গেল, তাহা সীতার তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না।

অতঃপর মনোরমা রণমূর্ত্তি ধরিয়া মারমুখী হইয়া উঠিলেন, কিন্তু বটুক বাবু হাত তুলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত হইতে বলিয়া ভাগিনেয়ীকে প্রশ্ন করিলেন, —বেশ, বেশ! শুনে সুখী হলুম, মা! হাঁ, এখন স্পষ্ট করেই বল, সেটুকুও শুনি, তোমার বাবার কি ধন-দৌলত ছিল—যে সব আমরা লুট ক'রে এনেছি?

সীতা গাঢ়স্বরে কহিল,—তা আমি বলব না, আর আমি ত সে সব কথা গোড়াতে তুলিনি, মামা! আমি পড়ার কথাই পেড়েছিলুম। এখন আপনারাই বুঝুন, আমার বাবা কি সত্যই নিঃস্ব ছিলেন? আমি এই দশ দশটা বছর অমনি অমনিই আপনাদের গলগ্রহ হয়ে রয়েছি? যদি নিজেরা বুঝতে না চান, ভগবানের হাতে বোঝাবার ভার দিন।

কথাগুলি এক নিশ্বাসে শেষ করিয়াই সে ছায়ার মত সে ঘর হইতে সরিয়া গেল।

যে মেয়েটা এ বাড়ীর দাসীর সামিল হইয়া সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিতে অভ্যস্ত ছিল, আজ তাহার এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন অতি বিচিত্র। বটুকনাথ ও তাঁহার অতি মুখরা গৃহিণীকে পর্য্যন্ত চমৎকৃত করিয়া দিল।

বটুকবাবু তাঁহার জীবনযাত্রায় কোনও দিনই সোজা পথ ধরিয়া চলিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। বাঁকা পথেই তিনি সীতাকে এ বাড়ীতে নিয়া-

ছিলেন এবং তাহাকে পাত্রস্থ করিতেও যে পথটি হঠাৎ অবলম্বন করেন, তাহাও ছিল তেমনই দুর্গম।

রাজনগর এষ্টেটের অবিবাহিত জমিদারের জন্য সুরূপা পাত্রীর সন্ধান চলিয়াছে জানিতে পারিয়া সেই সূত্রে তিনি যে দুঃসাহসের পরিচয় দেন, এই গল্পের প্রথমেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

যাঁহার সহায়তায় তিনি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহস পান, তাঁহার নাম অবনী ঘোষ, সম্প্রতি এই গ্রামে আসিয়া বটুকবাবুর প্রতিবাসী হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বাসা পাতিয়া বহু প্রতিষ্ঠানকে বিব্রত করিয়াছেন, অনেককে পথে বসাইয়াছেন; দেনায় তাঁহার চুল পর্য্যন্ত বিকাইয়া আছে, কত পাওনাদার যে আদালতের পরোয়ানা লইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে কোনও প্রকারে কাবু করিতে পারে নাই। এমন মহাপুরুষের সহিত বটুকবাবুর মিলন হইবারই কথা; ইঁহার সঙ্গীন অবস্থার কথা শুনিয়াই তিনি বিচলিত হইয়া উঠেন এবং তাঁহারই সহায়তায় অবনীবাবু সপরিবার আলমবাজারে আসিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। সুনন্দা ইঁহারই কন্যা; অবনী বাবুর বৃহৎ পরিবার, দশ বারোটি পুত্র-কন্যা; সুনন্দাই কন্যাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা। তাহার রূপের যেমন একটা খরতর প্রভা ছিল, কলিকাতার প্রগতিপরায়ণ বেপরোয়া তরুণী সমাজের সংস্পর্শে ও আদর্শে অতি আধুনিকার চক্ষু-চমৎকারা [illegible]া-সজ্জার কৌশলগুলিও আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। প্রথম দর্শনেই এই মেয়েটির আশ্চর্য্য রকমের চালচলন ও নানা বিষয়ে পটুতা তরুণ সমাজকে মুগ্ধ করিয়া দিত।

বটুকবাবুর নূতন সহযোগী বন্ধু অবনীবাবুর সহিত এইভাবে একটা

রফা করিয়াছিলেন যে, জমিদার-পক্ষ সীতাকে দেখিতে আসিলে তিনি অবনীবাবুর কন্যা সুনন্দাকেই সীতার বদলে দেখাইয়া দিবেন এবং এই দেখাশুনার খবর প্রতিবাসীদের অজানাই রহিবে। বিবাহ হইয়া গেলে বটুকবাবু মোটা অঙ্কের একখানা চেক অবনীবাবুকে দিবেন।

কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া ও টালিগঞ্জে পাত্রপক্ষকে খবর দিয়া একটু সকাল সকালই যে দিন বটুকবাবু বাড়ী ফিরিলেন, সেই দিনই সীতা সহসা তাঁহার কক্ষে আসিয়া একটা নূতন বিপ্লবের আভাস দিল।

কিন্তু বটুকবাবুর সঙ্কল্প ইহাতে টলিলনা, বরং জেদ আরও বাড়িল। গৃহিণী মনোরমা মুখখানা ভার করিয়া কহিলেন,—এতে তোমার লাভ?

বটুকবাবু কহিলেন,—লাভ আমার দুই তরফেই। মেয়ে যদি ও-ঘর করতে পায়, তা হ'লে ও-এষ্টেটে ঢুকতে কে আমায় রোখে! আর, যদি ওরা বিয়ের পর আসল ব্যাপারটা জেনে ওকে ত্যাগ করে,—সেইটিই খুব সম্ভব, তা হ'লেও আমার লাভ আছে; খোরপোষ ব'লে অন্ততঃ তিনশো টাকা মাসোহারা বরাদ্দ না ক'রে বাবুরা পার পাবেন না। আগাপাছা না ভেবেই কি এ কাজে হাত দিয়েছি?

মনোরমা মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিলেন,—কিন্তু মেয়ের কথা ত শুনলে! কানে মন্তর ঢুকেছে; তুমি কি ভেবেছ, ও তোমার সো হয়ে চল্‌বে?

বটুক বাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া উত্তর দিলেন,—সে তখন দেখা যাবে। কেউটে সাপের মুখে চুমো খেয়ে বরাবর কাজ আদায় ক'রে এসেছি, এ তো একটা মেয়ে, যাদের সম্বন্ধে বলা চলে—দশ হাত কাপড় পরেও ন্যাংটো!

ইহার দুই দিন পরে জমিদার নির্ম্মলেন্দুবাবু বন্ধুদের লইয়া পাত্রী দেখিতে আসেন। বটুকবাবু কথাটা গোপন রাখিবার জন্যখানি চেষ্টা

করেন, ততোধিক আগ্রহে সীতা সকল তথ্যই সংগ্রহ করিয়া লয়। বটুক-বাবুর বিশেষ ব্যবস্থায় সুনন্দা এ বাড়ীতে আসিয়া সুলজ্জিতা হইল ও বৈঠকখানায় সীতার ভূমিকা অভিনয় করিয়া বিদায় লইল। সীতাকে কেহই কোনও কথা কহিলনা। কিন্তু যে মেয়েটিকে অবহেলায় অতিক্রম করিয়া শুভসংযোগের সূচনা হইল, পরদিন তাহারই হাতের একখানি পত্র ব্যবস্থাপকদের সমস্ত ভুল ভাঙিয়া দিল।

৪

নির্ম্মলেন্দুবাবু বয়সে তরুণ হইলেও পাকা বিষয়ী লোক। অল্প বয়স হইতে সেরেস্তায় পিতার পার্শ্বে বসিয়া লোক চরাইবার ও লোকচরিত্র অধ্যয়ন করিবার শিক্ষা পাইয়াছেন। তাঁহার বিশাল জমিদারীর মধ্যে কোথাও কিছুমাত্র বিশৃঙ্খলা যেমন ছিল না, বিপুল আয় ও প্রচুর অর্থ উদ্বৃত্ত হওয়া সত্ত্বেও অপব্যয়ের কোনও নিদর্শন পাওয়া যাইত না। বিষয়ী পিতা পুত্রের শিক্ষার জন্য একজন বিজ্ঞ চরিত্রবান্ শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনাদর্শে নির্ম্মলেন্দু আত্ম-চরিত্রকে সুগঠিত করিয়াছিলেন। পিতৃমাতৃহীন সংসারে তিনি ছিলেন নিজেই নিজের অভিভাবক। সাতাশ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম উপলব্ধি করিলেন, সহধর্ম্মিণীর সাহচর্য্য লাভ সত্যই প্রয়োজন হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত বন্ধুরা বহু চেষ্টা করিয়াও এ সম্বন্ধে তাঁহাকে সম্মত করিতে পারেন নাই। যখন সকলেই জানিতে পারিল, তিনি বিবাহ করিতে আর অনিচ্ছুক নহেন, তখন তাঁহার উপযুক্ত পাত্রী সংগ্রহের জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু নির্ম্মলেন্দুবাবু দৃঢ়তার সহিত নির্দ্দেশ দিলেন যে, কোনও ধনীর কন্যা তাঁহার সংসারে

বধূর মর্য্যাদা লইয়া প্রবেশ করিবে না, কোনও সদ্বংশজাত নিষ্ঠাবান্ গরীবের কন্যাকেই তিনি গ্রহণ করিতে চান। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও কন্যাই নির্ম্মলেন্দুবাবুর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই, তাঁহাদের নানা ত্রুটিই তাঁহার চক্ষুতে ধরা পড়িয়া যায়। সম্প্রতি আলমবাজারের কন্যাটিই তাঁহাকে সহসা মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়া দেয়। এরূপ সপ্রতিভ প্রকৃতির চালাক-চতুর কন্যার সহিত তাঁহার এই প্রথম পরিচয় ঘটে। লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়াও যে লোক এ পর্য্যন্ত কোনওরূপ বিলাস-পঙ্কে নামিবার অবসর পান নাই; থিয়েটার, সিনেমা, রেসকোর্স, কার্ণিভ্যাল প্রভৃতি ধনি-সন্তানদের একান্ত বাঞ্ছিত রঙ্গস্থলগুলিতে যাঁহাকে কেহ কোনও দিন পদার্পণ করিতে দেখে নাই, সুনন্দার ন্যায় অতি আধুনিকা মেয়েকে প্রথম দেখিয়া ও তাহার অতিরিক্ত সপ্রতিভতার পরিচয় পাইয়া তিনি যে সহসা মুগ্ধ হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই ছিল না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে বেনামা পত্রখানি তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িল, তখনই তাঁহার বিমুগ্ধ চিত্তের উপর সংশয়ের একটা দাগ পড়িয়া গেল। লোকচরিত্র অধ্যয়নে তাঁহার সহজাত অভিজ্ঞতা এবার অবসর পাইয়া সচেতন হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল বুঝিতেও বিলম্ব হইল না। এ পত্র লিখিল কে? লেখা স্ত্রীলোকের হাতের, তাহাতে সংশয় ছিল না; কিন্তু যেই লিখুক, তাহাকে প্রশংসা করিবার অনেক কিছুই আছে। কিন্তু যে মেয়েটিকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন, সত্যই সে যদি গীতা না হইয়া সুনন্দা হয় এবং নিজের অদৃষ্টের পরিবর্ত্তন করিতে এই পত্র লিখিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কি প্রশংসা পাইতে পারে? এ-কার্য্য কি তাহার পক্ষে সমীচীন হইয়াছে?

নির্ম্মলেন্দুবাবুর মনে যখন সংশয়ের এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে, সেই সময় আর একখানি পত্র আসিয়া তাহাতে উপযুক্ত ইন্ধন যোগাইয়া দিল।

পরদিন সেরেস্তায় বসিতেই ডাকবাবু সকালের ডাকের যে সকল চিঠি-পত্র নির্ম্মলেন্দুবাবুর সম্মুখে দাখিল করিল, তন্মধ্যে একখানা চিঠি সর্ব্বপ্রথমেই নির্ম্মলেন্দুবাবুর মনোযোগ আকর্ষণ করিল। গোলাপী রঙের খাম, তাহার এক প্রান্তে একটা গোলাপফুল মনোগ্রাম করা; ভিতরে অনুরূপ কাগজে বাঁকা বাঁকা অক্ষরে যে কয় ছত্র লেখা ছিল, তাহা এইরূপ :—

My Dear Sir,

আমার চিঠি খানা পড়ে', আপনি নিশ্চয়ই আকাশ থেকে পড়বেন। কেন, তাই লিখছি। আমি যদিও নামে কুমারী সুনন্দা এবং আমার বাবা অবনী ঘোষ, তবুও পাকেচক্রে আমাকেই সেদিন সীতা হয়ে আপনাকে দেখা দিতে হয়েছিল। বটুক বোস ভারি ধড়িবাজ লোক, তাঁর ভাগ্নী সীতা কুশ্রী বলে, আমাকে গোড়ার দিকে দেখিয়ে তারপর আপনার চোখে ধূলো দেবেন মতলব করেছেন। মাপ করবেন, আমি এ যুগের মেয়ে; আমার রূপগুণের সুযোগ নিয়ে আমার চেয়ে অনেক নীচু আর একটা মেয়ে উঁচুদরের ঘরবর পাবে, আর আমি তাকিয়ে দেখবো, এ কখনো হ'তে পারে না। তাই রহস্যটা প্রকাশ ক'রে দিলুম। চিঠিখানা যেন প্রকাশ না পায়, আর—এর পরের কাজকর্ম্ম এমন ভাবে করা চাই, যেন ও-পক্ষ টের না পায়। আমাকে 'ইলোপ' ক'রে কলকেতায় তুলেও বিয়ের পর্ব্ব সারতে পারেন। আজ এই পর্য্যন্ত।

দর্শনধন্যা

শ্রীসুনন্দা ঘোষ

চিঠিখানা পড়িয়া নির্ম্মলেন্দুবাবুর দুই চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ তিনি স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন; তাঁহার মনে হইতে লাগিল, সেদিন যে মেয়েটিকে দেখিয়া তিনি সহসা মুগ্ধ হইয়াছিলেন, আজ তাহারই হাতের ঐ

বাঁকা বাঁকা অক্ষরগুলির ভিতর দিয়া তাহার উদ্দাম রূপের আর একটা দিক্ যেন সহসা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আর যে মেয়েটি এ পর্য্যন্ত অন্তরালে রহিয়াছে, আগেকার চিঠিখানাই যেন তাহার অগোচরে তাহার মূর্ত্তিখানাও তাঁহার মনশ্চক্ষুর উপর স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে।

৮

সাজিয়া গুজিয়া সুনন্দা সিনেমা দেখিতে যাইবার জন্য সদর দরজার বাহিরে পা দিয়াছে, এমন সময় নির্ম্মলেন্দুবাবুর অতিকায় মোটরকার সেখানে আসিয়া থামিল। চোখোচোখি হইতেই মুচ্‌কি হাসিয়া সুনন্দা ব্যস্তভাবে বাড়ীর ভিতরে ফিরিতেছিল, কিন্তু নির্ম্মলেন্দুবাবু মোটর হইতেই হাতখানা বাড়াইয়া কহিলেন,—একটু দাঁড়াবেন, কথা আছে।

দুই চক্ষুতে কৌতূহল ভরিয়া সুনন্দা ফিরিয়া দাঁড়াইল, মুখের হাসিটুকু তখনও অদৃশ্য হয় নাই। ছোট রাস্তা, বৃহৎ গাড়ী বাড়ীর দেউড়ী ঘেঁসিয়াই দাঁড়াইয়াছিল। গাড়ী হইতে না নামিয়াই হাতের চিঠিখানা সুনন্দার দিকে প্রসারিত করিয়া তিনি কহিলেন,—এ চিঠিখানা কার লেখা বলতে পারেন? লেখাটা হয় ত আপনার পক্ষে চেনা সম্ভব হ'তে পারে।

অকুণ্ঠিতভাবে চিঠিখানা নির্ম্মলেন্দুবাবুর হাত হইতে লইয়া সুনন্দা রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল। লেখাটা যে কাহার, তাহা বুঝিতে সুনন্দার বিলম্ব হইল না। পাড়াগাঁয়ের যে মেয়েটা মামার গলগ্রহ হইয়া দাসীবৃত্তি করিতেছে, সকল বিষয়েই যে তাহার অনেক নীচে নামিয়া আছে, তাহার হাতের মুক্তার মত সুন্দর লেখাগুলির প্রশংসা বরাবরই তাহাকে করিতে হইয়াছে, লেখার দিক্ দিয়া সীতার এই উৎকর্ষ সুনন্দার মনে ঈর্ষার

সঙ্কারও যে করে নাই এমন নহে। কিন্তু সীতার হাতের লেখা চিঠিখানা তাহারই স্বার্থসিদ্ধির পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে দেখিয়া সুনন্দার চিত্ত প্রসন্নতায় ভরিয়া গেল এবং পড়া শেষ করিয়াই সেখানি নির্ম্মলেন্দুবাবুকে ফিরাইয়া দিয়া মৃদুকণ্ঠে সে কহিল,—হাতের লেখাটা সীতার, আমি চিনি।

অবিচলিতকণ্ঠে নির্ম্মলেন্দুবাবু কহিলেন,—ধন্যবাদ, এই কথাটাই জানতে এসেছিলাম।

সুনন্দা সবিস্ময়ে দেখিল, নির্ম্মলেন্দুবাবুর ইঙ্গিতে সোফার মোটরে ষ্টার্ট দিয়াছে। শুষ্ককণ্ঠে সে কহিল,—এসেই চললেন যে! বসবেন না?

মোটর তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। নির্ম্মলেন্দুবাবু উপেক্ষার সুরে কহিলেন,—না, কাজ আছে।

বদ্ধদৃষ্টিতে সুনন্দা গতিশীল মোটরখানির দিকে চাহিয়াছিল, নিষ্পলক-নয়নে সে দেখিল, ছোট রাস্তাটা অতিক্রম করিয়া গাড়ীখানা মোড়ের পার্শ্বে সীতার মামার বাড়ীর সম্মুখে থামিয়াছে। স্তব্ধ বিস্ময়ে সে ভাবিল, তাহার চাল কি ব্যর্থ হইয়াছে?

বটুকবাবু কয়দিন ধরিয়াই সাগ্রহে জমিদার বাড়ীর লোকের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, আজ স্বয়ং জমিদারকে বন্ধুযুগলসহ উপস্থিত দেখিয়া বিস্ময়ানন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন, সসম্ভ্রমে কহিলেন,—কি সৌভাগ্য, আসুন, আসুন, ওরে, চা করতে বল্, পাণ আন্—

নির্ম্মলেন্দুবাবু গম্ভীরমুখে কহিলেন,—থাক, ওসব লৌকিকতার দরকার নেই, বটুকবাবু। বিশেষ প্রয়োজনে আপনার ভাগনীটিকে আর একবার আমরা দেখতে চাই।

বটুকবাবুর মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া শুষ্ককণ্ঠে তিনি কহিলেন,—বেশ ত, বসুন, এখনি ব্যবস্থা করছি।

ব্যবস্থা করিতে পরক্ষণেই তিনি বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। নবনির্ম্মিত দ্বিতল বাড়ী, বৈঠকখানা-ঘরটি কেতাদুরস্তভাবে সাজানো। ফরাসের মধ্যস্থলে নির্ম্মলেন্দুবাবু বসিয়াছিলেন। পার্শ্বে বন্ধুযুগল। বাহিরের ঘরখানির পাশের দরজাটির সহিত অন্তঃপুরের যে সংযোগ রহিয়াছে দ্বারের উপর প্রসারিত পরদাখানি সে পরিচয় দিতেছিল।

ইতিমধ্যে সুনন্দাও পিছনের দরজা দিয়া সীতাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল; এখনকার কৌতূহল তাহার সিনেমা দেখার আগ্রহকে প্রবল হইতে দেয় নাই। সুনন্দাকে দেখিয়াই বটুকবাবু সহর্ষে কহিয়া উঠিলেন,—এই যে মেঘ না চাইতেই জল, তোমাকে ডাকতেই লোক পাঠাচ্ছিলুম মা! ওঁরা আবার দেখতে এসেছেন।

সীতা তখন একখানা আরসীর সম্মুখে বসিয়া চুল বাঁধিতেছিল। হাতের কাজটুকু শেষ না হইলেও অতঃপর সে চিরুণী ও ফিতা কাঁটাগুলি তুলিয়া লইয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল। তাহার গতির দিকে চাহিয়া বটুকবাবু ভ্রূকুটি করিলেন।

সুনন্দা সাজিয়া আসিয়াছিল, নূতন করিয়া সাজাইবার আর প্রয়োজন হইল না; অনতিবিলম্বেই বটুকবাবুর সহিত সে বৈঠকখানায় অভ্যাগতদের সম্মুখে দেখা দিল।

কর্ত্তব্য নির্ণয় সম্বন্ধে এ পক্ষ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কোনওরূপ বিস্ময় বা চাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া গেল না।

সুনন্দার মুখের হাসি ও দুই চক্ষুর দৃষ্টি যেন অবস্থাটা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতেছিল। নির্ম্মলেন্দুবাবু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বটুকবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বেশ সহজকণ্ঠেই কহিলেন,—আমি যখন আপনার ভাগনীকে দেখতে এসেছি, বটুকবাবু, তখন পরিহাসের পাত্র নই!

বটুকবাবুর বুকের ভিতর কথাগুলি যেন হাতুড়ির ঘা দিল। শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন,—এ কথা কেন বলছেন, তা ত বুঝতে পারছি না।

কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণ করিয়া নির্ম্মলেন্দুবাবু কহিলেন,—আমি আপনার ভাগনী কুমারী সীতারাণীকে দেখতে এসেছি, অবনী ঘোষের মেয়ে সুনন্দাসুন্দরীকে নয়।

পরক্ষণেই তিনি সুনন্দার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—আপনি যেতে পারেন, আপনাকে উপস্থিত কোনো প্রয়োজন নেই।

সুনন্দাকে অগত্যা ধীরে ধীরে দ্বারের পরদা ঠেলিয়া ভিতরে যাইতে হইল। বটুকবাবুর মাথায় তখন সারা দেহের রক্তের চাপ উঠিয়াছে; নির্ম্মলেন্দুবাবু যে তাঁহার শঠতা ধরিয়া ফেলিয়াছেন ও সে সম্বন্ধে বুঝাপড়া করিতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার কথা ও ভঙ্গী তাহা প্রমাণ করিতেছিল। কিন্তু বটুকবাবুও এ পর্য্যন্ত স্বার্থের সাগরে অগাধ জলের মাছের মতই বিচরণ করিয়াছেন, কেহই তাঁহাকে ধরিতে পারে নাই, তাঁহার চারিধারে এই প্রথম আজ জালের বন্ধন পড়িয়াছে, এ বন্ধন হইতে মুক্তির উপায়ই তিনি তখন মনে মনে স্থির করিতেছিলেন।

বটুকবাবুকে নিরুত্তর দেখিয়া নির্ম্মলেন্দুবাবু কহিলেন,—আপনার ভাগনীকে আনুন, আমরা দেখব।

বটুকবাবু কহিলেন,—তাকে এনে কোনো ফল নেই, আপনার পছন্দ হবে না।

নির্ম্মলেন্দুবাবুর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বটুকবাবুর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—আপনার এ কথা থেকে আমরা কি বুঝব?

বটুকবাবু অম্লানবদনে উত্তর দিলেন,—মেয়ে আপনাদের পছন্দ হয়েছে জানলে, বোঝাপড়ার কথাটা আমি আপনার বাড়ীতে গিয়েই তুলতুম।

সবিস্ময়ে নির্ম্মলেন্দুবাবু বটুকবাবুর মুখের দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিলেন। বন্ধুযুগলের দৃষ্টিতেও প্রশ্ন ব্যক্ত হইতেছিল।

বটুকবাবু কহিলেন,—তা হ'লে আসল কথাটা বলি শুনুন, যদিও দেখাশুনার ব্যাপারে আমার ভাগনীর কথাই উঠেছিল, কিন্তু গোড়া থেকেই আমার বন্ধু আর প্রতিবাসী অবনীবাবুর মেয়ে সুনন্দাকে দেখানোই ছিল আমার আসল উদ্দেশ্য। অবনীবাবু ছাপোষা মানুষ, অবস্থাও ভাল নয়, বড়ঘরের নাম শুনেই তিনি ভয়ে পেছুলেন; কিন্তু আমি ভেবে রেখেছিলুম—তাঁর মেয়ে সুনন্দার যা রূপ, তাতে বড়ঘরে যাবার মত যোগ্যতা তার যথেষ্ট আছে। সেই জন্যই দেখাশুনার কাজটা চালাতে একটি বাঁকা রাস্তা ধরতে হয়েছিল।

বটুকবাবুর এই কৈফিয়ৎ শুনিয়া নির্ম্মলেন্দুবাবু বন্ধুদের দিকে একবার চাহিলেন, তাঁহাদের মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, কথাটা কেহই বিশ্বাস করেন নাই। সহসা তিনি এ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বটুকবাবুর মুখের দিকে চাহিলেন, সে দৃষ্টি যেন অন্তর্ভেদী!

চোখাচোখি হইতেই বটুকবাবু অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুকণ্ঠে কহিলেন,—যদি আপনি বলেন, এখনি অবনীবাবুকে আনিয়ে প্রমাণ দিতে পারি যে, আমি যা বলেছি হুবহু সত্যি, আর যদি মেয়ে পছন্দ হ'য়ে থাকে, কথাবার্ত্তাও পাকা হ'তে পারে।

নির্ম্মলেন্দুবাবু কহিলেন, তাঁকে আনবার এখন দরকার নেই, আর কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে যা বললেন, সে সব পরে হবে। উপস্থিত আমরা আপনার ভাগনীটিকে একবার দেখতে চাই।

বটুকবাবু শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন,—কি করবেন তাকে দেখে? যদি তার কিছুমাত্র রূপগুণ থাকতো, তা হ'লে—

কথাটা এ পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি যেন সহসা সচেতন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সতর্কতার সহিত এইখানেই কথার গতি ভাঙিয়া দিলেন।

নির্ম্মলেন্দুবাবু বটুকবাবুর দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া প্রশ্ন তুলিলেন,—মেয়ের রূপগুণের যাচাই আপনারা কি ভাবে করেন, শুনি?

বটুকবাবু কহিলেন,—আর কি বলুন না, দেখতে শুনতে ভালো, গায়ের রং হবে ফর্সা, কথাবার্ত্তায় চমৎকার, গান-বাজনায় ওস্তাদ, দেখে শুনেই অমনি মুখ দিয়ে বাক্ সরবে—বাঃ!

নির্ম্মলেন্দুবাবুর ভ্রূযুগল শেষের কথায় কুঞ্চিত হইতে দেখা গেল; সঙ্গে সঙ্গে মুখে প্রসন্নতা আনিয়া তিনি কহিলেন,—দেখুন, আপনি যে সব রূপগুণের কথা বললেন, তাদের একটা মোহও আছে; সে মোহটুকু কেটে গেলে মুগ্ধ যদি মুখ তুলে বলে—ছ্যা, আপনি কি বিস্মিত হবেন?

বটুকবাবু দুই চক্ষু তুলিয়া নির্ম্মলেন্দুবাবুর মুখের দিকে চাহিলেন মাত্র। তাঁহার মুখ দিয়া এ-সম্বন্ধে একটি কথাও বাহির হইল না।

নির্ম্মলেন্দুবাবু পুনরায় কহিলেন,—আপনার কথায় বোঝা যাচ্ছে, আপনার ভাগনীর সে সব কিছুই নেই, আচ্ছা, তাঁর পিতৃবংশের প্রতিষ্ঠা—

বটুকবাবু এবার মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিলেন,—তা যদি থাকবে, আমাকে তার ভার গ্রহণ করতে হবে কেন বলুন ত?

নির্ম্মলেন্দুবাবু কহিলেন,—আমার মতে, বটুকবাবু, মেয়েদের সবচেয়ে উঁচু রকমের সদ্‌গুন—স্বার্থত্যাগ আর সত্যনিষ্ঠা। এই গুণ দুটি যদি থাকে আর কোনো গুণেরই অভাব হয় না।

বটুকবাবু কহিলেন,—তা হবে, কিন্তু এ যুগে সে রকম মেয়ে ক'টি পাওয়া যায়! হ'তে পারে সুনন্দা একটু বাচাল, কিন্তু তার মন পরিষ্কার, কোনো গলদ সেখানে নেই।

যে জাল চারিদিকে নিবিড় বন্ধন ফেলিয়াছিল, তাহা হইতে মুক্তি পাইতে বটুকবাবু সুনন্দাকেই মুখ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, এ ক্ষেত্রে সীতার সম্বন্ধে কোনওরূপ সুখ্যাতি করিলে যদি তাহাতে জালের বন্ধন আরও দৃঢ় হইয়া উঠে, তজ্জন্য সীতার বিরুদ্ধে মিথ্যাভাষণেও তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। জগতের স্বার্থপর সুবিধাবাদীদের প্রকৃতিই এইরূপ।

বাহিরের কথাবার্ত্তার রেশ ভিতরে অন্তঃপুরিকারা উৎকর্ণ হইয়াই শুনিতেছিলেন। যদিও সীতা প্রথম হইতে সঙ্কল্প করিয়াছিল, মামা অনুরোধ করিলেও সে বাহিরের ঘরে দেখা দিতে যাইবে না, কিন্তু পুনঃ পুনঃই যখন তাহার সম্বন্ধে মাতুলের মুখ দিয়া বিষোদ্গার হইতেছিল এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী সুনন্দার সমক্ষেই মামী তাহাতে সায় দিয়া টিপ্পনী কাটিতেছিলেন, বিশেষতঃ যখন তাহার পিতৃবংশের প্রসঙ্গ উঠিতে মামা অম্লানবদনে এত বড় নির্ঘাত মিথ্যা বলিলেন, তখন তাহার নির্ম্মল মনটির ভিতর বিষের বাতি জ্বলিয়া উঠিল। তাহার পিতার অর্থে যে মামার এই প্রতিষ্ঠা, তাঁহার সম্বন্ধে এই মিথ্যাচার সীতার সত্যই অসহ্য হইল। কয়েক-দিন হইতেই যে সাহস ও দৃঢ়তা তাহার কোমল প্রকৃতির উপর একটি উজ্জ্বল আবরণ পরাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে নারীসুলভ সকল সঙ্কোচ ও দুর্ব্বলতা কোথায় ঠিকরাইয়া পড়িল, পিতার সুনাম রক্ষা করিতে সে সকল প্রকারে প্রস্তুত হইয়া উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সুযোগ আসিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। বটুকবাবু ব্যস্তভাবে ভিতরে আসিয়া জানাইলেন,—ওগো, তোমার ভাগনীকে ওঁরা না দেখে ছাড়বেন না, কোথায় সে, ডাকো।

সীতাকে ডাকিতে হইল না, পাশের ঘরখানির ভিতরেই সে ছিল, মামার কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল।

সুনন্দাও এতক্ষণ দালানে মনোরমার পাশে বসিয়াছিল। তাহার দৃষ্টিই প্রথমে সীতার উপর পড়িল, মুখখানা মুচকাইয়া চক্ষু দুইটি ঘুরাইয়া, চাঁপার কলির মত হাতের আঙুলটি তুলিয়া সে কহিল,—ঐ যে সীতা! ডাকতে হবে না, নিজেই এসেছে ছুটে!

পিতৃবংশের মর্য্যাদারক্ষার সঙ্কল্পে সীতার পুরন্ত মুখখানা তখন যেন জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে, আয়ত দুইটি চক্ষুর প্রখর দৃষ্টিও স্বাভাবিক নহে। সুনন্দা মেয়েটির সহিত কোনও দিনই সীতার মনের মিল হয় নাই; সীতাকে শুনাইয়া শুনাইয়া সুনন্দা যে সকল বড় বড় কথা কহিত, তাহাতে সীতার অঙ্গ জ্বলিয়া যাইত; সে যেমন মিথ্যা ভাষণকে ঘৃণা করিত, তাহার সমক্ষে কেহ মিথ্যা গর্ব্ব করিলেও সহ্য করিতে পারিত না। হয়, সাহস করিয়া প্রতিবাদ তুলিত, না হয়, সে স্থান হইতে উঠিয়া যাইত। সুনন্দা শহরের বড় বড় ব্যাপারে তাহার ঘনিষ্ঠতার সম্বন্ধে যে সকল কথা কহিয়া সীতাকে চমৎকৃত করিয়া দিতে চাহিত, সীতা সেগুলি বিশ্বাস করিত না। ইদানীং এই ধরণের কথা সুনন্দা পাড়িলেই, সীতা নিরুত্তরে উঠিয়া যাইত। কালো মেয়েটার এই তেজ দেখিয়া সুনন্দা মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিত,—পাড়াগেঁয়ে জঙ্গলী, এ সব কথার অর্থ কি বুঝবে। সেই মেয়েটিকেই মামা যে দিন সাজাইয়া গুজাইয়া তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া পাত্রপক্ষকে দেখাইয়া দিলেন, সেদিন সুনন্দার মুখের অর্থপূর্ণ হাসিটুকু অপেক্ষা মামার মিথ্যাচার সীতার বুকে বেশী তীক্ষ্ণ হইয়াই বিঁধিয়াছিল।

আজ বুঝি অন্তর্যামী তাহার অন্তরের ব্যথা অনুভব করিয়া সুনন্দার রূপের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন! সীতা কুশ্রী জানিয়াও পাত্রপক্ষ

তাহাকে দেখিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছেন ও সে আজ সুনন্দার চক্ষুর উপরেই তাহার অদৃষ্টের পরীক্ষা দিতে চলিয়াছে। এ পরীক্ষার কি পরিণাম, কে জানে!

একটি সাদা সেমিজ ও মিলের একখানা ফরসা শাড়ী পরিয়া সীতা দালানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মামী তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—ও খানা ছেড়ে আমার বেনারসীখানা পর, গাছকতক চুড়ি আর হারছড়াটা—

সীতা বাধা দিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল,—ও সবের দরকার নেই, মামীমা। যা পরেছি, এই ভাল।

বটুকবাবু ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিলেন,—বেশ, এখন চলো।

সুনন্দা মুচ্‌কি হাসিয়া কহিল,—সত্যিই ত, কাপড় গয়নার কি দরকার! যে রূপ, তাতেই রাজপুত্তুর মূর্চ্ছা যাবেন!

দেখা দিতে আসিয়া বাঙালার সমাজ-শাসিত পল্লীর অনূঢ়া কন্যারা যে সব শিষ্টাচারের পরিচয় দিয়া থাকে, সীতা সেগুলি পালন করিয়া মুখখানি নত করিয়া দাঁড়াইল।

নির্ম্মলেন্দুবাবু সোজা হইয়া বসিয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন,—আপনি বসুন। বন্ধুযুগল ব্যস্তভাবে সরিয়া সীতার বসিবার জায়গা করিয়া দিলেন।

একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সীতার মুখের দিকে চাহিয়াও নির্ম্মলেন্দুবাবু এই অদ্ভুত মেয়েটিকে চক্ষু দুইটি তুলিতে দেখিলেন না। অতঃপর তিনি মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিলেন,—আপনার কি নাম?

উত্তর হইল,—শ্রীমতী সীতারাণী দাসী।

আপনার বাবার নামটি বলবেন?

সীতা এবার হাত দুইখানি জোড় করিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিয়া কহিল,—ঈশ্বর উপেন্দ্রনাথ ঘোষ।

পুনরায় প্রশ্ন,—আপনি বুঝি বরাবরই মামার বাড়ীতে আছেন ?

সীতা উত্তর দিল ;—দশ বছর আছি ; আমার বয়স যখন সাত বছর, প্লেগে বাবা মা দু'জনেই মারা পড়েন।

তখন কোথায় থাকতেন ?

বক্সারে। আমার বাবার সেখানে খুব বড় কারবার ছিল।

নির্ম্মলেন্দুবাবু বটুকবাবুর দিকে চাহিতেই তিনি অতিশয় ব্যগ্রভাবে কহিলেন,—আর বলেন কেন সে দুঃখের কথা! খবর পেয়েই সেখানে ছুটে গেলুম, কারবার ছিল নামেই, কেউ কিছু উপুড়হস্ত করলে না, উল্টে দেনাপত্তর। শুধু মেয়েটাকে এখানে নিয়ে এলুম, সেই থেকেই পুষছি।

নির্ম্মলেন্দুবাবু সীতার মুখের দিকে চাহিতেই দেখিলেন, তাহার মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাতে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার আভা পড়িয়াছে। পরক্ষণেই ঘরের সকলকেই চমৎকৃত করিয়া সীতা কহিল,—মাপ করবেন মামা, বাবার নিন্দা আপনি করবেন না। আমার বাবা যে নিঃস্ব ছিলেন না, মরবার আগেও তিনি যে আপনাকে অনেক টাকা দিয়ে গেছেন, আর তাঁর কারবারের যথাসর্ব্বস্ব যে আপনি নিয়ে এসেছেন, তার প্রমাণ আপনার হাতের এই হিসেবের খাতা।

কাপড়ের ভিতর হইতে বাদামী কাগজে লেখা ছোট খাতাখানি বাহির করিয়া সীতা নির্ম্মলেন্দুবাবুর সম্মুখে ফেলিয়া দিল।

নির্ম্মলেন্দুবাবু ঝুঁকিয়া পড়িয়া খাতাখানি তুলিয়া তাহার পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইয়া চলিলেন। সকলের দৃষ্টি তাঁহার মুখের দিকে। বটুকবাবু খাতাখানি দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন যে, সেখানি তাঁহার মৃত্যুবাণ! তাঁহার ধারণা ছিল, খাতাখানা তিনি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন ; কিন্তু

আজ সহসা তাঁহার ভাগিনেয়ীর হাত দিয়া পূর্ব্বপরিচিতের পুনরাবির্ভাব দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

নির্ম্মলেন্দুবাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বটুকবাবুর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—বোধ হয় এঁর কথাটা সত্যই, বটুকবাবু! যে ভাবে হিসেবটা লেখা রয়েছে, তা মিথ্যে হবার কথা নয়। দেখা যাচ্ছে, বঙ্কার থেকে আপনি প্রায় আশী হাজার টাকা পেয়েছেন; তবে যদি বলেন, লেখাটা আপনার হাতের নয়, সে কথা আলাদা, তার বিচারব্যবস্থাও আলাদা।

বটুকবাবু অতি কষ্টে শুষ্ককণ্ঠে রসের সঞ্চার করিয়া কহিলেন,—আমাকে দেখছি আকাশ থেকে ফেললেন! না দেখলে কিছুই বলতে পারছি না।

নির্ম্মলেন্দুবাবু তাঁহার কথায় কান না দিয়া সীতাকে প্রশ্ন করিলেন,—আপনার বাবার এই টাকাগুলো বোধ হয় আপনি উদ্ধার করতে চান?

দৃঢ়তার সহিত সীতা কহিল,—না; ও টাকার ওপর আমার কোনো দাবীই নেই, আমার এই মাত্র দাবী—আমি হাঘরে নিঃস্বের মেয়ে নই। ও খাতাখানা আপনি মামাকে ফিরিয়ে দিন।

নির্ম্মলেন্দুবাবু কহিলেন,—এইখানে আমারও মেয়ে দেখা শেষ হয়ে গেল, বটুকবাবু! আপনার এই তেজস্বিনী ভাগ্নীই রাজনগর এষ্টেটের কুললক্ষ্মী হবেন।

অদৃষ্টের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

জিদ

১

তেরো বছরের নাতি নির্ম্মলকে লইয়া রায় বাহাদুর নিত্যানন্দ চ্যাটার্জ্জী ক্রমশঃই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিলেন। দীর্ঘকাল জজিয়তী করিয়া যিনি বহু বজ্জাতকে জব্দ করিয়া দিয়াছেন, কত নামজাদা ডাকাতকে পুলিপোলাং পাঠাইয়াছেন, স্বদেশী আন্দোলনের সময় কত ছেলেকে অকাতরে জেলে ঠেলিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে জজিয়তী হইতে ছুটী পাইলেও নিজের চাল-চলন ও আদব-কায়দায় জজের দপ্‌দপা বজায় রাখিতে যিনি অতিমাত্রায় সচেতন, তাঁহাকে সবারই তো যমের মত ভয় করিবার কথা! কাজেই জজ সাহেবের ঘরে চাকরবাকরদের ডাক পড়িলে তাহাদের প্রত্যেকেরই বুক টিপ টিপ করিত। বাড়ীর ভিতর জজ সাহেবের সাড়া আসিলে আর রক্ষা নাই; জজের গৃহিণী হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মীয়া পরিজন পাচিকা পরিচারিকা প্রত্যেকেই ভয়ে কাঠ! নাতিনাতিনীরা পর্য্যন্ত তাহাদের এই জজ-দাদুটিকে জুজুর মত ভয় করিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু হইলে কি হয়, বাড়ীশুদ্ধ সকলে জজ সাহেবের সম্বন্ধে এরূপ ভয়াতুর হইলেও, নির্ম্মল নামে নাতিটি ছিল একেবারে নির্ভীক। জজ-দাদুর চাল-চলন, আদব-কায়দা, দপ্‌দপা কিছুই সে গ্রাহ্য করিত

চাহিতনা। এমন কি, এ বাড়ীর সম্বন্ধে যে সব আইন-কানুন জজ সাহেব বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই বেখাপ্পা ও অন্যায় হইলেও, বাড়ীর কাহারও তাহাতে টুঁ শব্দটি করিবার সাহস দেখা যাইতনা, কিন্তু নির্ম্মলের নজরে এরূপ কিছু পড়িলে, সে যাহা ভাল বলিয়া ভাবে, তাহার দিকে ঝুঁকিতে সে দাদুর হুকুমেরও পরোয়া করিতনা।

জজ সাহেবের কড়া হুকুম, তাঁহার বাড়ীতে কেহ ভিক্ষা পাইবেনা। কিন্তু নির্ম্মল যদি দেখিত, কোন ভিখারী ভিক্ষা না পাইয়া ফিরিয়া যাইতেছে, সে তখনই তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া ভিক্ষা দিবেই। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত। দাস-দাসীরা তাহাকে সতর্ক করিয়া দিত, জজ সাহেব টের পাইলে অনর্থ হইবে।

নির্ম্মল নির্ভয়ে উত্তর দিত, হয় তো আমারই ফাঁসী হবে, তোদের তো আর ভাবনা নেই।

কিন্তু ভাবনা তাহাদেরও ছিল বৈকি। যদি জজ সাহেব জানিতে পারিয়া তাহাদেরও কৈফিয়ৎ চাহিয়া বসেন—কেন তাহারা বলে নাই ?

একদিন হাতে-নাতেই নির্ম্মলকে ধরা পড়িতে হইল। ব্রজবাসিনী এক প্রৌঢ়া ভিখারিণী দুইটি শিশু পুত্রের সহিত সুকণ্ঠ মিলাইয়া গানের সহিত ভিক্ষা মাগিতেছিল। নির্ম্মল তাহার ঝুলিতে কিছু চাল ও একটি পয়সা দিতেই দেউড়ীর ভিতরের দিকের দোতালার গাড়ী-বারান্দা হইতে বজ্রকণ্ঠের আহ্বান আসিল—দ্বারওয়ান!

নির্ম্মল পিছনে দৃষ্টি ফিরাইতেই দেখিতে পাইল, গাড়ীবারান্দার উপর দাঁড়াইয়া তাহার দাদু, দুই চক্ষুর দৃষ্টি তাহার দিকে, যেন তাহা জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে ; শোণের মত সাদা ও মোটা গোঁফ-যোড়াটি যেন রাগে ফুলিয়া উঠিয়াছে।

দেউড়ীর দরোয়ান সসম্ভ্রমে সেলাম জানাইতেই জজ সাহেব তীক্ষ্ণকণ্ঠে হুকুম দিলেন,—ভিখমাঙ্গী লেড়কা ছুটোর মাথা ঠোকাঠুকি ক'রে দিয়ে ধাড়ী মাগীটার ঝুলিটা রাস্তায় ওপর ছিঁড়ে ফেলে দে। তারপর খোকাবাবুর কাণ পাকড়ে আমার সামনে হাজির কর্।

জজ সাহেবের হুকুম এবং যাহার উপর এ হুকুম হইল, সে আবার জঙ্গী গুর্খা। সুতরাং হুকুম তামিল করিতে তাহার ব্যস্ত হইবারই কথা; কিন্তু শিশু দুইটির দিকে সে অগ্রসর হইতেই নির্ম্মল তাহাকে বাধা দিয়া কহিল,—খবরদার!

সুতরাং দরোয়ানজীকে থতমত অবস্থায় পরবর্ত্তী হুকুমের জন্ত হুজুরের দিকে তাকাইতে হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মলের ইসারায় ভিখারিণী তাহার শিশু দুটিকে কোলে তুলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

নির্ম্মল যে এমন বেপরোয়া হইয়া তাঁহারই সম্মুখে এরূপ রোখ দেখাইবে, তাহা জজ সাহেব ভাবিতে পারেন নাই। ক্ষণকাল তাঁহাকেও স্তব্ধভাবে নির্ব্বাক্ থাকিতে হইল, তাহার পর যে স্বর তাঁহার কণ্ঠ হইতে অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে বাহির হইল, তাহাতে নির্ম্মলকেই আহ্বান করিতেছেন বুঝিতে পারা গেল।

নির্ম্মল নির্ভীকভাবেই বরাবর উপরে গিয়া জজ-দাদুর সম্মুখে দাঁড়াইল। কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া জজ সাহেব প্রশ্ন করিলেন,—কাউকে ভিক্ষা দেওয়া হবেনা, আমার এই হুকুম, তুমি জানতে?

ঘাড়টি আস্তে আস্তে নাড়িয়া নির্ম্মল জানাইল,—হাঁ।

স্বর এবার দৃঢ় করিয়া জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—তা হ'লে কেন দিলে?

নির্ম্মল নির্ভয়ে উত্তর দিল,—আমার বাবা দিতে বলতেন, তাই।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জজ সাহেব জানিতে চাহিলেন,—কি বলতো তোমার বাবা ?

নির্ম্মল কহিল,—বাবা বলতেন ভিখিরীকে কখনো ফেরাবেনা, ওদের ভেতরেই ভগবান্ থাকেন।

জজ সাহেব কহিলেন,—তোমার বাবা একটা মস্ত আহাম্মুখ ছিল, তাই তোমাকে এই শিক্ষা দিয়ে গেছে ; আমি চাইনা, তুমিও বাপের ধারায় তৈরী হও।

নির্ম্মলের স্বাস্থ্যপুষ্ট সুন্দর মুখখানা উত্তেজনায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে তৎক্ষণাৎ জজ সাহেবের মুখের উপর উত্তর দিল,—আমার বাবা মানুষের মতন মানুষ ছিলেন, দাদু! আমি যেন বাবার মতন হ'তে পারি, এর বেশী কিছু চাইনা।

জজ সাহেব এবার বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কহিলেন,—তোমার আচরণ থেকেই সেটা অনুভব করতে পারছি। কিন্তু এই সঙ্গে এ কথাটাও তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, তোমার বাবা তো দান-খয়রাতের জন্য কোনো ঐশ্বর্য্য রেখে যায় নি, তবে পরের ধনে এ ভাবে পোদ্দারী করা হ'লো কোন্ অধিকারে ?

নির্ম্মল এই জটিল প্রশ্নের উত্তরে অম্লানবদনে কহিল,—যে জিনিস আমার নিজের পেটে দেবার অধিকার আছে, তা অন্যের হাতে দেবারও অধিকার আছে। যে চালগুলো এইমাত্র আমি খয়রাত করেছি, তার বেশী বোধ হয় আমি খাইনা। বেশ, এখনি ঠাকুরকে ব'লে দিচ্ছি, আজ যেন আমার জন্যে চাল আর না নেয়।

দাদুকে আর কিছু বলিবার অবসর না দিয়া বা দাদুর পরবর্ত্তী কথ

শুনিবার প্রতীক্ষা না করিয়াই নির্ম্মল হন্ হন্ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

জজ সাহেব কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, নির্ম্মলকে ডাকিয়া ফিরাইতে তাঁহার আর প্রবৃত্তিও হইলনা। তাহার কথাগুলি গুলীর আওয়াজের মত তাঁহার কাণে অতি কঠোরভাবেই বাজিতে লাগিল, এই অবস্থায় বিশুষ্ক মুখখানার ভিতর দিয়া শুধু দুটি কথা অস্পষ্ট বাহির হইল,—ছোট সয়তান!

২

নির্ম্মলের বাবা নিরঞ্জন নিতান্ত দায়ে পড়িয়া এলাহাবাদের এক স্বজাতীয়া দরিদ্র বিধবার অরক্ষণীয়া কন্যাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে ছেলেটির সহিত কন্যার বিবাহ হইবার কথা, সম্প্রদানের পূর্ব্বে বিধবা পণের টাকা দাখিল করিতে না পারায়, ছেলের বাবা ছেলেকে সভা হইতে তুলিয়া লইয়া যান। নিরঞ্জনের তখন ছাত্র-জীবন, এম, এ, পড়েন। কতিপয় সহপাঠী এ বিপদে তাঁহাকেই ধরিয়া বসেন; বিধবার অবস্থা, কন্যার পরিণাম এবং পয়সার জন্য তাঁহারই এক স্বজাতির এই বর্ব্বরতা তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলে; নিজের ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া তিনি কন্যাটির পাণিগ্রহণ করেন। নিরঞ্জনের পিতা তখন গোরক্ষপুরের দায়রা জজ। পরদিনই নিরঞ্জন তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া লিখিলেন এবং তাঁহার মার্জ্জনা ও আশিষপূর্ণ আদেশ ভিক্ষা করিলেন।

তৃতীয় দিনে পিতার নিকট হইতে তারে আদেশ আসিল,—বাধ্য হইয়া যাহা করিয়াছ, ঐখানেই তাহা শেষ করিতে চাই। এখানে একা চলিয়া

আইস ; ওখানে আর থাকিবেনা বা উহাদের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিবেনা ইহাই আমার ইচ্ছা।

নিরঞ্জনের মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। বাবা যে এরূপ আদেশ দিবেন, তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। ছেলে অবশ্য এ কথা ভালো রকমেই জানিতেন যে, তাঁহার প্রকৃতি খুবই কঠোর। কিন্তু এক নিরপরাধী বালিকার প্রতিও যে তিনি কঠিন হইয়া এমন অবিচার করিবেন, ইহা তিনি ভাবেন নাই। মত পরিবর্ত্তনের জন্য পুনরায় তিনি কাতর প্রার্থনা করিলেন, বহু মিনতি করিয়া দীর্ঘ পত্র লিখিলেন ; কিন্তু তাহার উত্তর লইয়া যে তার আসিল, তাহাতে শুধু একটি কথা লেখা ছিল,—না।

বাপের প্রকৃতির কিছু-না কিছু ছেলের প্রকৃতিতেও সংক্রামিত হইয়া থাকে। যে বাবার এমন দুর্জ্জয় জেদ, নিরঞ্জন তো তাঁহারই ছেলে! সুতরাং তিনিও ইহার পর এই ভাবে বাবাকে তাঁহার শেষের মিনতি জানাইয়া দিলেন,—যদি নিজের ভুল কোনো দিন বুঝিতে পারেন, তখন আমাকে আহ্বান করিবেন। আপনার স্নেহের আহ্বান না আসিলে আমি, আমার স্ত্রী কিংবা যদি আমাদের কোনো সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে—তাহাদের কেহ, কোনোদিনই আপনার দ্বারস্থ হইবেনা।

জজ সাহেব তাঁহার রোজনামচার কেতাবে ছেলের ... স্পর্দ্ধার কথাগুলি অবিকল টুকিয়া রাখিলেন এবং তাহার নীচেই নিজের মন্তব্য এই ভাবে লিখিলেন,—ভুল, ভুল! অভাবের তাড়নায় বিনা আহ্বানেই তোমাকে ছুটিয়া আসিতে হইবে!

নিরঞ্জন জজ সাহেবের ছোট ছেলে। সত্যরঞ্জন, জ্ঞানরঞ্জন ও মনোরঞ্জন নামে তাঁহার আরও তিনটি ছেলে এই সময় কাশীতে থাকিতেন ও

সেখানকার সরকারী সেরেস্তায় চাকরী করিতেন। পরন্তু পিতার বিশেষ আগ্রহ এবং চেষ্টা সত্ত্বেও এই তিন পুত্রের কেহই গ্রাজুয়েট হইতে পারেন নাই; অগত্যা পিতার বিশেষ সুপারিস তাঁহাদিগকে সরকারী আফিসের সেরেস্তায় স্থায়িভাবেই বসাইয়া দেয়। ছোট ছেলে নিরঞ্জন গ্রাজুয়েট হওয়ায় জজ সাহেবের মনের ভিতর আশার যে কিশলয়টি মুঞ্জরিয়া উঠিতেছিল, এই ঘটনার পর তাহা ক্রমশঃই শুকাইয়া গেল।

কিন্তু অবশেষে ভুল একদিন ভাঙিল, কিন্তু বহু বিলম্বে, প্রায় বারো বৎসর পরে। জজ সাহেব তখন মোটা পেনসান ও সেই সঙ্গে রায় বাহাদুর খেতাব পাইয়া গিকাবালের এই নূতন বাড়ীতে আসিয়া বসিয়াছেন। ছেলেরাও বাঙ্গালীটোলার বাসাবাড়ী ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাদের পরিবারবর্গের সমাগমে বাড়ী যেন গিস্ গিস্ করিতেছে। নাতি-নাতিনীদের এতই প্রাচুর্য্য যে, সকলের নাম সকল সময় জজ-দাদু মনে রাখিতে পারেন না, অথবা রাখিবার চেষ্টাও করেননা। এই সময় সহসা তাঁহার মনে বিশেষ ভাবেই ছোট ছেলের কথা জাগিয়া উঠিল! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল, তাহার শেষের কয়টি কথা,—যে কথাগুলি তিনি সে সময় তাঁহার রোজনামচায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তখনই পুরাতন খাতাখানি খুঁজিয়া বাহির করিলেন, কম্পিত হস্তে পাতা উল্টাইয়া সেই দিনের পুত্রসংক্রান্ত লেখাগুলির উপর দুইটি ছল ছল চক্ষুর ক্ষীণদৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়াই ধরিলেন। ছেলে যাহা লিখিয়াছিল এবং সে সম্বন্ধে যে মন্তব্য তাঁহার লেখনী দিয়া নিঃসৃত হইয়াছিল, পর পর দুইটি লেখার বিষয়বস্তু তাঁহার বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টির উপর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যেন বিদ্রূপের ভঙ্গীতে প্রশ্ন করিল, ভুল কার? •

সত্যই তো, নিজের অনুমান সম্বন্ধে এত বড় ভুল তো আর কখনও

তাঁহার হয় নাই! মাসে দেড়শো টাকা যে ছেলেকে তিনি নিয়মিত ভাবে পাঠাইতেন, তাহার অভাব তো তাহাকে বিচলিত করে নাই; কোনও প্রার্থনা লইয়া তাহার কোন পত্রই তো তাঁহার কাছে আসে নাই! কিন্তু আজ সে কোথায়? হয় ভো তাঁহার আর তিন ছেলের মত নিরঞ্জনেরও অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে এত দিনে হইয়াছে, তাহাদের লইয়া সেও সংসার পাতিয়াছে; কিন্তু কি করিয়া তাহা চলিতেছে,—কে জানে?

সারা দিন ধরিয়া এই চিন্তাই জজ সাহেবকে অভিভূত করিয়া রাখিল। যখন জজিয়তী করিতেন, বড় বড় মামলার চিন্তা যেমন নিজের পাকা মাথাটির মধ্যে একাই রাখিয়া রায় লিখিতেন, এখনও বৈষয়িক ব্যাপারে কোনও চিন্তার অংশ কাহাকেও দিতেন না, নিজেই ভাবিয়া যাহা ভালো বুঝেন, তাহাই পাকা বলিয়া সাব্যস্ত হয়।

শেষরাত্রিতে নিদ্রা ভাঙিবার একটু আগেই নিরঞ্জনকে স্বপ্নে দেখিলেন। বারো বৎসরের মধ্যে কোনও রাত্রেই যে ত্যাজ্যপুত্রটি স্বপ্ন-সূত্রেও কাছে আসে নাই, আজ আশ্চর্য্য ভাবেই তাহাকে দেখা গেল, তাঁহার পালঙ্কের পাশটিতে সে যেন হাসিমুখেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ধড়মড় করিয়া জজ সাহেব শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। দুই চক্ষু রগড়াইয়া গবাক্ষপথে বাহিরের দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, অদূরবর্ত্তী গীর্জ্জার সু-উচ্চ চূড়াটিকে পরিবেষ্টন করিয়া উষার অস্পষ্ট আলো ধীরে ধীরে ধরণীর বুকে পড়িতেছে।

এই দিন অপরাহ্নের 'লীডারে' বড় বড় হরপযুক্ত শিরোনামায় বাঙ্গালী শিক্ষকের আদর্শ জীবনের অবসান প্রসঙ্গে যে সংবাদটি বাহির হইয়াছিল, তাহাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ হইতেই জজ সাহেবের সুদৃঢ় ও সুপুষ্ট মুখখানা মৃতের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। সংবাদটির মর্ম্ম এইরূপ,—

"সীতাপুরের শান্তিস্নিগ্ধ তপোবনে আদর্শ বিদ্যাপীঠের ভার লইয়া বাঙ্গালী মনীষী নিরঞ্জন চ্যাটার্জ্জী তাহাকে আদর্শ বিদ্যালয়েই পরিণত করিয়াছিলেন। বাহিরের কোনো প্রলোভন নির্ম্মল শিক্ষাব্রতধারী এই নির্লোভ মানুষটিকে বিচলিত করিতে পারে নাই। দরিদ্রের ন্যায় অতি সাধারণভাবেই ধনীর পুত্র হইয়াও তিনি অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি যে পদস্থ রাজকর্ম্মচারী রায় বাহাদুর নিত্যানন্দ চ্যাটার্জ্জীর পুত্র, মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার এ পরিচয় কেহই অবগত ছিল না। এই আদর্শ শিক্ষকের অভাবে আদর্শ বিদ্যাপীঠের একটি স্তম্ভ খসিয়া গেল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। মিঃ চ্যাটার্জ্জী তাহার স্ত্রী ও একটি মাত্র পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। পুত্রের বয়স বারো বৎসর মাত্র, সে আদর্শ বিদ্যাপীঠের এক প্রতিভাবান্ ছাত্র।"

জজ সাহেবের হাত হইতে খবরের কাগজখানা খসিয়া পড়িয়া গেল। ইজি-চেয়ারখানার উপর তিনি এতক্ষণ সোজা হইয়াই বসিয়াছিলেন, কাগজখানার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহখানাও চেয়ারের পীঠে অবসন্ন হইয়া হেলিয়া পড়িল, মুখ দিয়া শুধু একটি ব্যথাভরা স্বর অস্ফুটভাবে বাহির হইল,—নিরু রে!

জজ সাহেব কাহাকেও কিছু জানাইলেন না। ট্রেণের অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ সোফারকে তিনি মোটর বাহির করিতে বলিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টার ভিতরেই জজ সাহেবকে লইয়া মোটর লক্ষ্ণৌএর পথে ছুটিল।

লক্ষ্ণৌ হইতে নৈমিষারণ্যের পথে সীতাপুর শহর। শহরের মধ্যে অপেক্ষাকৃত জনবিরল অংশে একখানি ছোট বাড়ী, বাহিরে ফুলের বাগান, একটা কুয়া, বাগানটির দুই ধারে কাঠের বেড়া, মধ্যস্থলে বাঁশের জাফরী দেওয়া ফটক। ইহাই আদর্শ বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ নিরঞ্জন চ্যাটার্জ্জীর

আবাসভবন। ভিতরে ছোট একটু উঠান, তাহারই একধারে শান-বাঁধানো কূয়া, তিনখানি ছোট ছোট ঘর; ঘরগুলির দেওয়াল মাটীর, মাথার খোলার ছাউনি।

সদ্যোবিধবা মানদা ম্লানমুখে নির্ম্মলের পাতে হবিষ্যান্ন সবেমাত্র ঢালিয়া দিয়াছেন, এমন সময় বাহিরের দিকের ভেজানো দরজা ঠেলিয়া জজ সাহেব অবাধে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এ ভাবে এক অপরিচিত বর্ষীয়ান্ পুরুষকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অতি বিস্ময়ে মাতাপুত্রের বাক্‌শক্তি যেন লুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু জজ সাহেবের দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িতেই তিনি বিনা ভূমিকায় কহিলেন, —আমি নিরঞ্জনের বাবা! তোমাদের নিতে এসেছি। আমার সঙ্গে যেতে আপত্তি আছে?

ছেলে তখন গণ্ডূষ করিয়া সবে মাত্র ভোজনে বসিয়াছে এবং এখনও সে ব্রহ্মচারী; এ সময় তাহাকে কথা কহিতে নাই। কাযেই মা মানদাকেই উত্তর দিতে হইল এবং জজ সাহেবের প্রশ্নের অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরই আসিল, —শেষ সময়েও তিনি জানিয়ে গেছেন, নিজের ভুল বুঝে যদি আপনি নিয়ে যেতে চান, আমরা যেন যাই।

জজ সাহেব কহিলেন,—ভুল বুঝেই তোমাদের নিতে এসেছি।

৩

বিধবা বধূ ও পিতৃহারা পৌত্রকে বাড়ীতে আনিয়া জজ সাহেব অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন; ভাবিলেন, পুত্রের সম্বন্ধে যে ভুল তিনি করিয়াছিলেন, তাহার অসহায় স্ত্রী-পুত্রের প্রতি এই অনুকম্পায় তাহার আমূল সংশোধন হইবে।

কিন্তু জজ সাহেবের এই অপ্রত্যাশিত অনুকম্পা মা ও ছেলের শোক-মথিত চিত্তকে কি বিগলিত করিতে পারিয়াছিল? স্বামীর প্রতি শ্বশুরের নির্মম ব্যবহারের কথা মানদা কি ভুলিতে পারিয়াছিলেন?

নির্মল তাহার বাপের প্রকৃতি পাইয়াছিল, ভবিষ্যতের কোনও ভাবনাই তাহাকে অভিভূত করিতে পারিত না। এ বাড়ীর আদব-কায়দা ও নানারূপ আড়ম্বর তাহাকে যেন বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। নানা বিষয়ে তাহার দাদুর ব্যয়বাহুল্যের ঘটা ও নাম বাজাইবার জন্য নানারূপ চেষ্টা দেখিয়া সে ভাবিত, কেমন করিয়া এই লোক এতদিন নিজের ছেলের কোন উদ্দেশ না লইয়া স্থির হইয়া ছিলেন! তাহার বাবা তো তাহাকে একটি দিনের জন্যও চোখের আড়ালে রাখিতে পারিতেন না!

আর-একটি বিষয়ে ছেলেটির মন ক্রমশঃই বিষাইয়া উঠিতেছিল। সে এখানে আসিয়াই লক্ষ্য করিয়াছিল, গরীব-দুঃখীদের প্রতি তাহার দাদুর কিছুমাত্র মায়া মমতা নাই! ভিখারী এ বাড়ীতে ভিক্ষা পায় না, বিপদে পড়িয়া কোন দুঃস্থ সাহায্যপ্রার্থী হইয়া আসিলে, তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকে না; ভোজের সময় কেহ অনাহূত ভাবে বাড়ীতে ঢুকিলে, তাহাকে কুকুরের মত তাড়াইয়া দেওয়া হয়! অথচ, কত রকমে কত

বাজে খরচ প্রত্যহ এ বাড়ীতে হইয়া থাকে! নির্ম্মলের চোখে এ সব বড়ই বিসদৃশ ঠেকিত, সময় সময় সে জজ-দাদুর মুখের উপরেই প্রতিবাদ তুলিত, কিন্তু প্রথম প্রথম তিনি হাসিয়া কহিতেন,—জঙ্গল থেকে নতুন এসেছো, দাদু, তাই চুল্-বুল্ করছো। দিন কতক পরে আপনিই টিট্ হয়ে যাবে।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই জজ সাহেব অন্যান্য নাতি-নাতিনীদের ডাকিয়া কহিতেন,—তোরা একে চোখে চোখে রাখবি, সহবৎ শেখাবি। দেখছিস তো বুনো ঘোড়া, এখনো দুরস্ত হয় নি!

নির্ম্মল তখন অবাক্ হইয়া এই মানী ও মেজাজী মানুষটির দিকে চাহিয়া থাকিত, তাঁহার কথাগুলি উপলব্ধি করিবার চেষ্টা পাইত। কিন্তু অধিক দিন এই সকল কথা তাহার নিকট আর দুর্ব্বোধ্য বলিয়া বোধ হইত না। নানাসূত্রে নির্ম্মলের বুদ্ধি ও বিচারশক্তি তাহার বয়সকে অনেক তফাতে ফেলিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল। সেই অনুপাতে দেহের শক্তি ও দুঃসাহস ইহাদের সহিত অতঃপর যেন পাল্লা দিয়া চলিতেছিল।

নির্ম্মল অল্পদিনেই বুঝিয়া লইল, সে এক স্বতন্ত্র জগতে আসিয়া পড়িয়াছে। এখানে সুখ ও সুবিধা যেমন প্রচুর, সেই সঙ্গে দরদের অভাব ও দরিদ্রের প্রতি অবহেলারও অন্ত নাই। ছেলে বেলা হইতে সে তাহার বাবার নিকট চরিত্রগঠন সম্বন্ধে যে সকল শিক্ষা পাইয়াছিল, সেই ভাবেই নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে, কিন্তু এখানে তাহাদের কোনও সার্থকতাই নাই।

নির্ম্মলের কোমল মনটি আরও নিবিড় ভাবে ব্যথিত করিয়াছে, এ বাড়ীর বালক-বালিকাদের ব্যবহার। ইহারা যে জজ সাহেবের নাতি-নাতনী, মনে করিলে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, জজ-দাদুর দৌলতে ইহাদের সাত খুন মাপ, এই ধারণাগুলি তাহাদের মনে এমনই দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল

যে, তাহারা বাহিরের কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না। ইহাদের চাল-চলন, আচরণ ও কথাবার্ত্তায় এমনই একটা অহঙ্কার স্পষ্টভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িত যে, সঙ্গে থাকিত বলিয়া নির্ম্মল নিজেই যেন লজ্জায় মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চাহিত। অথচ সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না, সহপাঠীরা ইহাদের এরূপ অবহেলা ও স্পর্দ্ধা কেন সহ্য করে? কি জন্য এই অহঙ্কারী নবাব-পুত্রদের সহিত ভাব রাখিতে লালায়িত হয়? সমবয়স্ক সহপাঠী প্রতিবেশী বালক-বালিকাদের প্রতি যাহারা এমন অভদ্র ব্যবহার করিতে পারে, তাহারা যে আতুর ভিখারীদিগকে রাস্তার কুকুরের মত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিবে, তাহাতে আর কথা কি! নির্ম্মল ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না, ইহাদের মতি-গতি এমন হইল কেন!

একান্ত অসহ্য হইলেই নির্ম্মল ইহাদের অনুচিত আচরণে প্রতিবাদ করিত। কিন্তু বৃথা; উত্তরে ইহারা বিদ্রূপভঙ্গীতে কত কথাই নির্ম্মলকে শুনাইয়া দিত। জজ সাহেবের আর এক নাতি, বয়সে নির্ম্মলের অপেক্ষা কিছু বড়ই হইবে, নাম তাহার বারীণ, সেই ছিল এদলের চাঁই, নির্ম্মলের উপর তাহার ভারি আক্রোশ; যেহেতু, জঙ্গলী দেশ হইতে এই ছেলেটা আসিয়া এবং বয়সে তাহার অপেক্ষা ছোট হইয়াও তাহারই শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছে এবং প্রত্যেক 'সাবজেক্টেই' সে ক্লাসের 'ফাষ্ট বয়' হইয়া বসিয়াছে! একদিন কি একটা কথা লইয়া নির্ম্মল প্রতিবাদ তুলিতেই বারীণ শ্লেষের ভঙ্গীতে তাহাকে শুনাইয়া দিল,—তোমার গায়ে এখনো জঙ্গলের গন্ধ আছে, আগে ওটা যাক, তার পর 'য়্যাডভাইস' দিয়ো 'প্র্যাটিসে', আমরা তখন না হয় 'ক্ল্যাপ' দিয়ে বলবো—হিয়ার, হিয়ার!

এই ফাজিল ছেলেটির মুখে এই ধরণের কথা শুনিয়া নির্ম্মল তাহার মুখখানি ম্লান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—জঙ্গলে থাকা কি সত্যই এত দোষের?

বারীণ মুখে দুষ্টামীর হাসি আনিয়া উত্তর দিল,—বিলক্ষণ! দোষের হবে কেন, ভারি গৌরবের! 'কিং কঙ্গের' ছবি দেখ নি? জঙ্গল থেকে সহরে এসে কত খাতির পাচ্ছেন! আমরাও তাঁকে পয়সা খরচ ক'রে দেখতে যাই! তোমার সঙ্গে তাঁর আলাপ নেই?

নির্ম্মল জানিতে চাহিল,—'কিং কঙ্গ' কে, ভাই?

ছেলেরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; বারীণ এ স্থলে দলপতি, সুতরাং মুখের হাসি চাপিয়া গম্ভীর ভাবেই কহিল,—জান না? সে কি হে! তোমারই কমরেড! আচ্ছা দাঁড়াও, তার ছবিটা তোমাকে দেখাচ্ছি, তা হলেই বুঝতে পারবে। ব্যাগের ভেতরেই থাকা সম্ভব।

সিনেমা দেখা ও তাহার ছবিওয়ালা প্রোগ্রামগুলি বইয়ের ব্যাগটির ভিতর গুছাইয়া রাখা বারীণের ভারি সখ। 'কিং কঙ্গ' নামক শিক্ষিত জন্তু বিশেষের ছবিটি নির্ম্মলের মুখের উপর ধরিয়া বারীণ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের ভঙ্গীতে কহিল,—দেখ দেখি, চেনা-শোনা আছে কি না?

নির্ম্মলের মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বারীণের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া সে আস্তে আস্তে কহিল,—শহরে থাকলে বুঝি এই রকম সভ্যতাই শিখতে হয়!

বারীণের মুখখানা সেই মুহূর্ত্তে তাহার হাতের ছবির গরিলা নামক জন্তুটির মুখের মতই কালো হইয়া গেল। নিরুত্তরেই সে ছবিখানা ব্যাগের ভিতর তাড়াতাড়ি পুরিয়া ডালাটি বন্ধ করিয়া দিল। নির্ম্মল তাহার স্বভাবসিদ্ধ সুমিষ্ট ও সহজ গলায় সোজা কথায় যে আঘাত তাহাকে দিল, মুখখানা কদর্য্য ও কঠিন করিয়াও তাহার উত্তর সে যোগাইতে পারিল না।

কয়েক দিন পরে সহসা আর এক অপ্রীতকর ঘটনা উপস্থিত হইল। বাড়ীর মোটরে জজ সাহেবের নাতিরা স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল। অনেকগুলি ছেলে, ঠাসাঠাসি করিয়া প্রত্যেকেই ভিতরে বসে এবং সে সময় হুড়াহুড়িও বেশ বাধে। নির্ম্মল কিন্তু ইহাদিগকে এড়াইয়া বাহিরে সোফারের পাশটিতেই তাহার স্থান করিয়া লয়। ভিতরে বসিয়া ছেলেরা তাহার দিকে চাহিয়া হাসে, পরস্পর বলাবলি করে,—ঠিক জায়গাটিতেই বাবু সাহেব বসেছেন! নির্ম্মল এখন আর ইহাদের কথায় কাণ দেয় না, ভ্রূক্ষেপ করে না।

এদিনও গাড়ীর ভিতরে এক পাল ছেলে ঠাসাঠাসি করিয়া বসিয়াছিল, বাহিরে সোফারের পাশেই নির্ম্মল। গাড়ীখানা একটা গলির কাছাকাছি সবেগে আসিতেই একখানা এক্কা সেই গলিটির ভিতর দিয়া এমনই বেপরোয়াভাবে বড় রাস্তার উপর আসিয়া পড়িল যে, জজ সাহেবের গাড়ীর সোফার অতিশয় তৎপরতার সহিত গাড়ীর গতি সংযত না করিলে এক্কা-খানা চুরমার হইয়া যাইত। এক্কা বাঁচিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার ধাক্কায় পথচারী একটি ছেলে দূরে ছিটকাইয়া পড়িল। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই এক্কা-ওয়ালা ঘোড়ার পীঠে ঘন ঘন চাবুক লাগাইল, দেখিতে দেখিতে এক্কাখানা নক্ষত্র বেগে ছুটিল। জজ সাহেবের গাড়ীর সোফারও তাহার গাড়ী ছুটাইতে ব্যস্ত হইল, কিন্তু বাধা দিল নির্ম্মল। তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—করছেন কি, চলুন ওকে তুলি; বাড়ী নিয়ে যেতে হবে।

গাড়ীর ভিতর হইতে ছেলেরা কলরব করিয়া উঠিল,—গাড়ী চালাও, ওর কথা শুনো না,—আমাদের গাড়ী তো ওকে ফেলেনি।

নির্ম্মল পাগলের মত গাড়ী হইতে নামিয়া ছেলেটির দিকে ছুটিল; বলিষ্ঠ দুই হাতে তাহাকে তুলিয়া নিরাপদ স্থানে বসাইল। ইতিমধ্যে কতিপয় পথিক ও ছাত্র সেখানে আসিয়া পড়িল। ছেলেটির হাতে ও পায়ে চোট লাগিয়াছিল, তবে আঘাত গুরুতর হয় নাই। কিন্তু সে এই দুর্ঘটনায় এমনই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইতেছিল না; তখনও সে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

জজ সাহেবের গাড়ীখানা কিছুদূর গিয়া হঠাৎ থামিয়া গিয়াছিল। সোফার পশ্চাতে তাকাইয়া ছেলেটির কাণ্ড দেখিতেছিল, লজ্জা বুঝি তাহার সুদৃঢ় হাত দুইখানিকে আড়ষ্ট করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর গতিও রুদ্ধ হইল। ভিতর হইতে জজ সাহেবের নাতিরা অবাক্ হইয়া দেখিল, সিটের তলা হইতে ছোট একটি বালতি ও একখানা তোয়ালে বাহির করিয়া তাহাদের সোফার অদূরবর্ত্তী একটা জলের কল লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছে।

জলপূর্ণ বালতী লইয়া সোফারকে সেখানে আসিতে দেখিয়াই নির্ম্মল উৎসাহিত হইয়া কহিল,—জল এনেছেন! বাঃ! দিন, আমি এর হাত-পাগুলো ধুয়ে দিই, কাদা লেগেছে।

সোফার কহিল,—আমিই দিচ্ছি।

ছেলেটির দেহের যে যে অংশ ছড়িয়া গিয়াছিল ও রাস্তার ধূলা-কাদা লাগিয়াছিল, বালতীর জলে তোয়ালে ভিজাইয়া তাহা ধুইয়া দিতেই যন্ত্রণায় এতক্ষণে সে কাঁদিয়া ফেলিল। নির্ম্মল সান্ত্বনা দিল,—ধূলো-কাদাগুলো ধুয়ে গেলে আর জ্বালা করবে না, এ কষ্টটুকু সহ্য কর, ভাই! এর পর

ঐ-কটা জায়গায় একটু ক'রে টিংচার আইয়োডিন লাগিয়ে দিলে ব্যথা একেবারে মরে যাবে।

সোফার জানাইল,—টিংচার আইয়োডিন তাহার গাড়ীতে আছে।

নির্ম্মল ব্যগ্র-উল্লাসে কহিল,—আছে? তা হ'লে আনুন না শীগগির—

সোফার কহিল,—তার চেয়ে একেই কোলে ক'রে গাড়ীতে নিয়ে যাই না কেন?

নির্ম্মল একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল,—আপনি তা হ'লে একে বাড়ীতে পৌছে দেবেন?

সোফার কহিল,—নিশ্চয়।

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে আহত ছেলেটিকে পাঁজা কোলা করিয়া তুলিয়া গাড়ীর দিকে চলিল। ছেলেটির হাত হইতে বিক্ষিপ্ত বই খাতা ও তাহার পায়ের দুই পাটি জীর্ণপ্রায় চটি জুতা রাস্তা হইতে নির্ম্মল একটি একটি করিয়া কুড়াইয়া যথা স্থানে রাখিয়াছিল। এইগুলি এবং সোফারের পরিত্যক্ত বালতি ও তোয়ালেখানি গুছাইয়া লইয়া সে তাহার পিছু পিছু চলিল।

যে ছেলেগুলি এখানে সমবেত হইয়াছিল এবং কেহ কেহ সময়োচিত সাহায্যও করিয়াছিল, তাহাদের ভিতর হইতে এক জন কহিল,—কি রকম ভালো ছেলে ছাখ্ ভাই, একটুও ছ্যামাক নেই মনে?

আর একটি ছেলে কহিল,—কিন্তু গাড়ীর ভেতরে ওঁরা ব'সে ব'সে মুখ বাড়িয়ে দেখছেন—যেন সব নবাব-পুত্তুর! একটিবার নেমেও এলেন না কেউ?

অপর একটি ছেলে কহিল,—নবাব-পুত্তুর না হোক, জজ সাহেবের নাতি তো!

প্রতিবাদের ভঙ্গীতে প্রথম ছেলেটি কহিল,—এ ছেলেটিও তো তাই, কিন্তু কেমন মিশুক, কেমন লক্ষ্মী, অথচ ফাষ্ট বয় !

পশ্চাৎ হইতে একটি ছেলে কহিয়া উঠিল,—নতুন এসেছে, তাই এমন ভালো ; তার পর দেখবি, এই বেড়ালই হবে বনবেড়াল, তখন আর 'স্পীকটি নট্ !'

বারীণ দুই চক্ষু পাকাইয়া সোফারকে প্রশ্ন করিল,—তোমার এত মাথা ব্যথা কেন ?

নির্ম্মল উত্তর দিল,—মাথা থাকলেই মাথা ব্যথা করে, এতে 'কেন' ব'লে কিছু নেই !

বারীণ সরোষে কহিল,—ফাজলামি করতে হবে না তোমাকে, থামো।

বারীণের ছোট ভাই মহীন কহিল,—আমি ঐ ছেলেটাকে জানি দাদা, আমাদের ক্লাশে পড়ে, ওর নাম মতি ; ছোটলোকের ছেলে, ওর বাবা তাঁত বোনে—

মতি তখনও সোফারের কোলে ; মহীনের কথায় তাহার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখখানা আরও নিষ্প্রভ ও বিবর্ণ হইয়া গেল। আর্ত্তকণ্ঠে সে কহিল,—আমাকে আপনি নামিয়ে দিন, আমি এখন বেশ যেতে পারবো।

সোফার বুঝিয়াছিল, কেন সে হঠাৎ এ কথা কহিল। কিন্তু নিজের দুইখানি সবল হাতের ভিতর ছেলেটিকে সে আরও দৃঢ়ভাবে ধরিয়া সান্ত্বনার সুরে কহিল,—তা কি হয়, তোমাকে কি এ অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারি ?

বারীণ রুক্ষকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—তা হ'লে আমাদের গাড়ীতে তুমি ওকে তুলবে না কি ?

সোফার কহিল,—তা ছাড়া উপায় কি!

বারীণ গলার সুর আরও চড়াইয়া কহিল,—এই ছোটলোকের ছেলেটা আমাদের সঙ্গে ব'সে যাবে?

নির্ম্মল তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিল,—তোমাদের সঙ্গে বসবে কেন? আর ওখানে জায়গাই বা কই! তার চেয়ে আমার কোলে বসেই যাবে'খন; তোমাদের কারুর কিচ্ছু কষ্ট হবে না।

মহীন নির্ম্মলের দিকে ছোট আঙুলটি হেলাইয়া কহিল,—দেখছিস্ দাদা, ঐ ছেলেটার ছেঁড়া জুতো দু'খানা পর্য্যন্ত নির্ম্মল-দা বয়ে বেড়াচ্ছে, যেন ওর চাকর!

বারীণ ঘৃণার সুরে কহিল,—সেম, সেম! ওকে আমরা আর ছোঁবো না।

কথাটা নির্ম্মলের কাণে গিয়াছিল, কিন্তু সে তখন যথাস্থানে তাহার হাতের জিনিসগুলি রাখিয়া সোফারের সহায়তায় মতিকে বসাইতেছিল। বারীণের কথা অগ্রাহ্য করিয়া সে সোফারকে কহিল,—টিংচার আইয়োডিনের শিশিটা বার ক'রে দিয়ে তবে ষ্টার্ট দেবেন।

আহত স্থানে এই তীব্র ঔষধটির সংযোগ হইতেই মতির কণ্ঠ হইতে পুনরায় আর্ত্তস্বর বাহির হইল। এই সুযোগে বারীণ তাহার পূর্ব্বের কয়টি কথার পুনরুক্তি করিল,—তোকে আমরা কিন্তু আর ছোঁব না, নির্ম্মল!

নির্ম্মল এবার উত্তর না দিয়া পারিল না, একটু হাসিয়া কহিল,—আর গাড়ীখানা? আমরা যখন এতে উঠিছি, এটাকেও তোমাদের বয়কট করা উচিত!

বারীণ উদ্ধতভাবে কহিল,—আজই দাদুকে ব'লে এর বিহিত করবো আমরা, বলবো তোকে নিয়ে আমরা আর কক্খনো গাড়ীতো উঠবো না।

নির্ম্মল স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল,—তার আগে আমিই বলছি বারীণ-দা, কাল থেকে আমিই আর গাড়ীতে উঠবো না।

বারীণের রাগ ইহাতেও কমিল না, কণ্ঠের স্বরে ঔদ্ধত্য বজায় রাখিয়া সে কহিল,—দাদু যে বলেছিলো, বুনো ঘোড়া—এখনো দুরস্ত হয় নি, এ কথা মিছে নয়। আমি আজ বাড়ীতে গিয়েই দাদুকে বলবো—হুঁসিয়ার দাদু, তোমার বুনো ঘোড়াকে আগে ভাল ক'রে ব্রেক করাও—

নির্ম্মল নম্রভাবেই উত্তর দিল,—কথা কাটাকাটির কি দরকার, ভাই? আমি যখন নিজেই হচ্ছি ব্রেক ডাউন এবং ব্রেক আউট! এক হাতে তালি তো বাজবে না।

গাড়ীর শব্দে আর কাহারও কোনও কথা কেহ শুনিতে পাইল না।

৩

সন্ধ্যার পরে জজ সাহেবের খাস কামরায় এদিনের রাস্তার এই ব্যাপারটির শুনানী চলিয়াছিল। মামলা তুলিয়াছে বারীণ নিজে, আসামী হইয়াছে নির্ম্মল ও গাড়ীর সোফার; গাড়ীর ভিতরে বাড়ীর যে সব ছেলে ছিল—তাহারা সকলেই সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত; অনুপস্থিত শুধু নির্ম্মল। অভিযোগে ইহাও প্রকাশ,—ছেলেটিকে লইয়া সেই যে নির্ম্মল তাঁতীদের নোংরা বাড়ীর ভিতর ঢুকিল, অনেক ডাকাডাকিতেও আর বাহির হইয়া আসিল না; সেখান হইতেই জানাইয়া দিল যে, তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না, সে হাঁটিয়া যাইবে।

সোফার সসম্ভ্রমে জানাইল,—রাস্তার একটি ছেলের জন্যে নির্ম্মল বাবুর প্রাণে যে দরদ দেখেছি, তাতে কেউ স্থির থাকতে পারে না, আমিও পারি

নি, হুজুর! এঁরা যে কি ক'রে শেষ পর্য্যন্ত গাড়ীর ভেতর বসেছিলেন, তা ভেবে পাইনে। আর সেখান থেকে তিনি যে ফিরলেন না, বোধ হচ্ছে ইচ্ছে করেই—গাড়ীতে আর উঠবেন না বলেই।

জজ সাহেবের স্থূল ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। ঠিক এই সময় নির্ম্মল আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া কহিল,—আমাকে ডাকছিলেন?

নির্ম্মলকে বাড়ীতে ঢুকিতে দেখিয়াই জজ সাহেবের চাপরাসী তাহাকে জানাইয়াছিল—হুজুর তাহাকে তলব করিয়াছেন।

জজ সাহেব নির্ম্মলের মুখের দিকে প্রখর দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—কোথায় এতক্ষণ ছিলে?

নির্ম্মল মৃদুস্বরে কহিল,—আপনি কি তা শোনেন নি?

জোরকণ্ঠে জজ সাহেব কহিলেন,—আমি যা জিজ্ঞাসা করছি, তার উত্তর দাও—কোথায় ছিলে?

নির্ম্মল নির্ভীকভাবে উত্তর দিল,—রামাপুরায়, আমাদের স্কুলের একটি ছেলের বাড়ীতে।

ভ্রূকুটি করিয়া জজ সাহেব কহিলেন,—সাহস এবং বীরত্ব পথেই তো বিলক্ষণ দেখিয়েছিলে, সেখানে এতক্ষণ থাকবার কি প্রয়োজন ছিল?

নির্ম্মল পরিষ্কার কণ্ঠে উত্তর দিল,—ওদের বাড়ীখানার ভেতর ঢুকতেই আমার মনে হ'ল, যেন সীতাপুরের বাড়ীতেই গিয়েছি। আমাকে দেখে আর ছেলেটির মুখে সব শুনে ওদের বাড়ীশুদ্ধ সবাই আমাকে ঘিরে বসলো! আমি তখুনি ফিরতে পারলুম না। তা ছাড়া আমি আগেই ভেবেছিলুম, হেঁটেই ফিরবো। তাই আসতে দেরী হয়ে গেল।

জজ সাহেব বিস্মিত চাহিলেন,—হেঁটে আসবার ইচ্ছাটুকু হবার কারণ?

নির্ম্মল অসঙ্কোচেই জানাইয়া দিল,—হাঁটাই এখন থেকে অভ্যাস করবো, তাই। আমার বাবাকে বরাবর হেঁটেই স্কুলে যেতে দেখেছি, গাড়ী চড়তে কোনো দিন তাঁকে তো দেখিনি; গাড়ীতে ওঠা আমার কি উচিত?

সকলেই দেখিল, হঠাৎ জজ সাহেব মনে মনে কি যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। মুখে ক্লেশের চিহ্ন প্রকাশ পাইল, বুকের ভিতর হইতে কিসের একটা প্রবাহ যেন উদ্দাম গতিতে উপরে উঠিতেছিল, তাহারই আবর্ত্ত তাঁহার দুই চক্ষুর অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিকে দেখিতে দেখিতে বাষ্পাচ্ছন্ন করিয়া দিল। এই অবস্থায় দক্ষিণ হাতখানি দ্বারের দিকে হেলাইয়া অর্দ্ধস্ফুটকণ্ঠে কহিলেন,—যাও, সকলে যাও।

এইখানেই মামলার নিষ্পত্তি হইল বুঝিয়া সকলেই বাহিরে চলিল। নির্ম্মল সহসা ফিরিয়া জজ সাহেবের একেবারে কাছে গিয়া সমবেদনার সুরে কহিল,—বুকে কি ব্যথা লাগলো, দাদু? বুকটা ডলে দেব?

এমন ক্ষতও থাকে, পাখার বাতাস যাহাতে শান্তি না দিয়া আরও দাহ উপস্থিত করে। নির্ম্মলের এই মিনতির স্বরও বুঝি জজ সাহেবের ব্যথায় নূতন আঘাত দিল; তাই অসহিষ্ণুভাবে তিনি কহিয়া উঠিলেন,—না—না—না, কিছু দরকার নেই; যাও।

পরদিনই জজ সাহেব খবর লইয়া জানিলেন, নির্ম্মল গাড়ীতে উঠে নাই, হাঁটিয়া স্কুলে গিয়াছে এবং হাঁটিয়াই ফিরিয়াছে। ইহার পর অনেকক্ষণ তিনি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন; নির্ম্মলকে ডাকিলেন না বা এ সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনাই কাহারও সহিত করিলেন না।

কয়েক সপ্তাহ এইভাবেই কাটিল। নির্ম্মলকে তিনি ডাকেন না এবং সেও আসে না। কিন্তু তথাপি নির্ম্মলের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগই তাঁহার

সেরেস্তায় নিত্য আসিত, সম্ভবতঃ জজ সাহেব সেগুলি মুলতুবী রাখিতেছিলেন।

ইতিমধ্যে একদিন জজ সাহেবের এক বন্ধুর সহিত হঠাৎ ক্লাবে সাক্ষাৎ। তিনি শিক্ষাবিভাগের এক পদস্থ কর্ম্মচারি; বেনারসের কয়েকটি স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া ডাক-বাঙ্গলোয় উঠিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর সিকরোলের বিশিষ্ট ক্লাবে খেলা-ধূলোয় যোগ দিতে আসিয়াছিলেন।

কথায় কথায় আগন্তুক কহিলেন,—তোমার নাতিদের দেখলুম হে! সবাই বেশ ইনটেলিজেণ্ট, পড়াশুনাতেও ভালো।

জজ সাহেবের মুখখানা যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, হাসিয়া কহিলেন,—কি ক'রে তুমি জানলে যে, তারা আমার নাতি?

পরিদর্শক মহাশয় কহিলেন,—আরে, নাম জিজ্ঞাসা করতে তারাই যে জানিয়ে দিলে—আমার নাম অমুক, আমি জজ সাহেবের নাতি! আমি তো অবাক! শেষে হেড মাষ্টার অবশ্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন জজ সাহেবটি কে!, কিন্তু তোমার নাতিরা বেশ তালিম পেয়েছে তো, এক সুরেই সবাই জানিয়ে দিলে, তারা বড় কেউ কেটা নয়। কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন! সে হাসি উল্লাসের কিম্বা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের, তাহা জজ সাহেব সহসা স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু একটু পরেই হাসির বেগটুকু সহসা সম্বরণ করিয়া গম্ভীর মুখে তিনি পুনরায় কলিলেন,—হাঁ, ভাল কথা, তোমার আর এক নাতি কিন্তু ওদের মত ভাঙে নি, ছেলেটির নাম আমার মনে পড়ছে না, আচ্ছা রোসো—

জজ সাহেব বন্ধুর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—নির্ম্মল বোধ হয়?

এক মুখ হাসিয়া, বন্ধু কহিয়া উঠিলেন,—হাঁ, হাঁ, নির্ম্মলই বটে! ওয়াণ্ডারফুল বয়, যাকে বলে 'বরন্ জিনিয়াস!' স্কুলে স্কুলে ছোটা, আর

ছেলেদের 'মেরিট' নিয়ে ঘাঁটা ত আমার পেশা, কিন্তু এ ধরণের ছেলে আমার সারা জীবনে আর নজরে পড়েছে কি না সন্দেহ !

জজ সাহেব একটু অধৈর্য্যভাবে প্রশ্ন করিলেন—সে বোধ হয় কিছু বলেছে তোমাকে আমার সম্বন্ধে ?

পরিদর্শক মহাশয় উত্তর দিলেন,—কিছু না ! আরে, সে যে তোমার নাতি, তা জানতেই দেয় নি ; তোমারই আর এক নাতি তার পরিচয় দিলে, তাতেই জানলুম, সে নিরঞ্জনের ছেলে, তুমি তাকে সীতাপুর থেকে এনেছ। আহা, দুর্ভাগ্য নিরঞ্জন ? তার কথা মনে হলেই আমার কষ্ট হয়। যাই হোক, তার ছেলেটির ওপর বিশেষ লক্ষ্য তুমি রেখো।

জজ সাহেব বিমর্ষ মুখে কহিলেন,—লক্ষ্য রাখবো বলেই তো এনেছিলুম কিন্তু এখন দেখছি, লক্ষ্যের বাইরে ও-ছোকরা ছুটেছে।

পরিদর্শক মহাশয় ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন ? কেন ? এ কথার মানে ?

জজ সাহেব কহিলেন,—আর কেন, বাপের রোগ ওকেও ধরেছে ; এর মধ্যেই আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি।

জজ সাহেবের দুর্ব্বলতা কোথায়, তাঁহার বন্ধু তাহা ভালভাবেই জানিতেন। পাছে প্রসঙ্গটা অপ্রীতিকর হইয়া উঠে, সেই আশঙ্কায় তিনি আর এ সম্বন্ধে কোন কথা তুলিলেন না।

কিন্তু অন্যান্য নাতিরা তাঁহার নামেই তাহাদের পরিচয় দিতে উন্মুখ, আর একান্ত অনুগ্রহভাজন হইয়া যে নাতিটি তাঁহারই আশ্রয়ে রহিয়াছে এবং তিনি ভিন্ন যাহার আর কোনও গতি নাই, সেই-ই তাঁহার পরিচয়ে বর্ত্তাইতে চাহে না, বন্ধুর এই নির্দ্দেশ তাঁহার চিত্তে একটা নূতন অস্বস্তির সূত্রপাত করিয়া দিল কি ?

প্রতি বৎসর জজ সাহেবের জন্মদিনে ভোজের বিশেষ আয়োজন হইয়া থাকে ; এ বৎসরও হইয়াছে। সহরের বহু গণ্য-মান্য পদস্থ ব্যক্তি আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। সুসজ্জিত সুবিশাল হল-ঘরটি ভরিয়া গিয়াছে ; হলের বাহিরে দরদালানেও জনসমাগম হইয়াছে। জজ সাহেবের পুত্রপরিজনগণ আমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত। ইহার ভিতরেও কর্ত্তৃপক্ষের কড়া হুকুম ছিল, বাজে লোকে যেন ঢুকিবার সুযোগ না পায়। কিন্তু সকল লোককে চিনিয়া রাখা তো আর সহজ কথা নয়! ভালো কাপড় চোপড় পরিয়া কোন কোন পেটুক যদি পেটের দায়ে বিনা আহ্বানে ভোজের সারিতে বসিয়া পড়ে, কে তাহাদিগকে ধরিবে! হয় তো এখানকার ভোজে এদিন এমন অনেক অনাহূতই ছিল এবং তাহারা দিব্যই খাইয়া গেল ; কিন্তু ধরা পড়িল, দুটি ছোট ছোট ছেলে! তাহারা দুই ভাই, খুবই গরীব ; জজ সাহেবের নামডাক ও আহার্য্যের আয়োজন ও আড়ম্বরের কথা শুনিয়া বাঙ্গালীটোলা হইতে সিকরোলে আসিয়াছিল পেট ভরিয়া রাজভোগ খাইবার লোভে। কিন্তু বেচারীদের মলিন বেশভূষা ও অপ্রতিভ ভাব-ভঙ্গী তাহাদের আশায় অন্তরায় হইল। এ সব বিষয়ে বারীণের দৃষ্টি ছিল অতিশয় তীক্ষ্ণ ; ছেলে দুইটি তাহার জেরায় বিব্রত হইয়া স্বীকার করিয়া ফেলিল,—আমাদের নেমন্তন্ন তো হয়নি, জজবাবুর নাম শুনেই খাবো বলে এসেছি, আমরা বড় গরীব।

বারীণ একেই তো জজের নাতি, তাহাতে আবার ভীড়ের ভিতর হইতে নিজের চোখে দেখিয়া এক যোড়া অপরাধীকে ধরিয়া বাহির

করিয়াছে; আর কি রক্ষা আছে! সে তাহাদের চাবকাইবে, কিম্বা পুলিশের হাতে দিবে, ইহাই নির্ণয় করিতে যখন ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় নির্ম্মল ছুটিয়া আসিয়া ছেলেদুটিকে আড়াল করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। নির্ম্মলকে দেখিয়া বুঝা গেল যে, ভিতরে ভোজ্য পরিবেষণে সে যোগ দিয়াছিল, সেখান হইতেই ছুটিয়া আসিয়াছে। নির্ম্মলকে দেখিবামাত্র বারীণ যেন জলিয়া উঠিল, সবলে তাহাকে একটা ধাক্কা দিয়া সে কহিল,—সরে যা তুই, কে এখানে তোকে মোড়লী করতে ডেকেছে?

নির্ম্মল পড়ি পড়ি অবস্থায় নিজের শক্তিতে টাল সামলাইয়া লইল, কিন্তু ছোট ছেলেটির দেহে তাহার দেহের ধাক্কা লাগিতে সে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। নির্ম্মল পিছনে ফিরিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে তুলিয়া লইল। বারীণ পুনরায় উগ্রকণ্ঠে কহিল,—এখুনি হয়েছে কি, আরো মজা দেখাচ্ছি,—তুই সরে যা, নির্ম্মল!

নির্ম্মল শান্তকণ্ঠে কহিল,—দাদুর আজ জন্মতিথি, বারীণ-দা, এদিনে অন্যায় কিছু করতে নেই।

বারীণ কহিল,—অন্যায়টা করছে কে, তা কি দেখতে পাচ্ছো না? এরা চোর, চুরি ক'রে খেতে এসেছে।

নির্ম্মল কহিল,—বৃহৎ কাযে এমন অনেকেই আসে, তাতে তাদের চোর বলতে পারো না। এরা না হয় বিনা নেমন্তন্নেই এসেছে, আমি দেখেছি, দুটিতে সারের শেষে দুই খানা আসনে পাতা কোলে ক'রে বসেছিল খাবার আশায়; না হয় দুজনে দু পাতে খেতো, কিন্তু তুমি এদের সেখান থেকে উঠিয়ে টেনে নিয়ে এলে,—অন্যায় এটা নয়?

বারীণ জোরকণ্ঠে কহিল,—নিশ্চয়ই নয়। দাদুর 'ষ্ট্রিক্ট' অর্ডার একটা কেশেলও যেন অনাহূত হয়ে না আসতে পারে।

বাহিরের প্রাঙ্গণে গোলযোগের আভাস পাইয়া বারীণের বাবা ও কাকা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—হয়েছে কি?

যাহা হইয়াছিল, বারীণ তাহা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিল এবং আসামী দুটিকে দেখাইয়া দিল।

কাকা বারীণের দিকে প্রসন্নভাবে চাহিয়া প্রশংসার ভঙ্গীতে কহিলেন,—বারীণ আমাদের বাহাদুর ছেলে, সব দিকেই চৌকস্।

বারীণের বাবা অপরাধী ছেলে দুইটির দিকে চাহিয়া বজ্রকণ্ঠে হুকুম দিলেন,—বেরিয়ে যাও এখুনি; ফের যদি কোনো দিন এমনি ক'রে কোথাও ঢোকো, তা হ'লে চাবুকের চোটে পীঠের ছাল তুলে দেব জেনো।

ছেলে দুটি বাহিরে যাইবার হুকুম শুনিয়া যেন বাঁচিয়া গেল! কিন্তু বারীণের বাবার কল্পিত চাবুকের আঘাত পড়িল যেন নির্ম্মলের পীঠে। সে কাঁদিবার মত হইয়া কহিল,—জ্যোঠামশাই, না খেয়েই ওরা যাবে?

মুখখানা কদর্য্য ও কণ্ঠের স্বর বিকৃত করিয়া জ্যোঠামহাশয় কহিলেন,—হাঁ, যাবে; ওদের ওপর তোমার আর দরদ দেখিয়ে কায নেই; যে কায করছিলে, তাই কর গিয়ে।

যেমন ক্ষিপ্রভাবে ইঁহারা আসিয়াছিলেন, তেমনই ক্ষিপ্রপদে ভিতরে ঢুকিলেন। বারীণ একমুখ হাসি লইয়া নির্ম্মলের দিকে চাহিল; তাহার সেই নিষ্ঠুর হাসি ও ক্রূর দৃষ্টি যেন টিটকারী দিয়া নির্ম্মলকে কহিতেছিল, কেমন জব্দ!

নির্ম্মলও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। বারীণ যাহাই করুক, বারীণের বাবাও যে তাহার এই অনাচারে প্রশ্রয় দিবেন, ইহা সে ভাবে নাই। ভোজের বিপুল আয়োজন তাহার অবিদিত নহে; হয় তো বহু ভোজ্যই উদ্বৃত্ত হইবে, কত যে অপচয় হইবে কে জানে; এমন তো কত বারই হইয়াছে।

অথচ, ভোজনার্থীদের সারিতে বসিয়াও ঐ দুইটি ছেলে কিছুই খাইতে পাইল না, অভুক্ত অবস্থায় তাহারা ফিরিয়া চলিয়াছে !

সহসা মনে মনে কি একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া লইয়া নির্ম্মল ঝড়ের মত বাহিরে ছুটিল সেই দুইটি অনাহূত অনাদৃত উপেক্ষিত বালকের অনুসন্ধানে। এ বাড়ীতে তাহাদের জন্য কোনও আহার্য্য না থাকিতে পারে, কিন্তু অদূরেই তো খাবারের দোকান রহিয়াছে, ঐ দুইটি অভুক্তদের সম্বন্ধে তাহার কি কোনও কর্ত্তব্যই নাই ? দাদুর দেওয়া টাকাটি তখনও তো তাহার পকেটে রহিয়াছে। নাতী-নাতিনীরা প্রত্যেকেই প্রতি বৎসর এই স্মরণীয় দিনটিতে দাদুর নিকট একটি করিয়া টাকা পাইয়া থাকে, সুতরাং নির্ম্মলও পাইয়াছে। টাকার কথাটা মনে পড়িতেই উৎসাহে তাহার বুক দুলিয়া উঠিয়াছিল। স্থির করিয়াছিল, দাদুর অর্থে-ই উহাদের দোকানে বসাইয়া খাওয়াইবে, তাহা হইলে ইহাদের মনে আর আশাভঙ্গের কষ্ট থাকিবে না, দাদুরও কোনও অকল্যাণ হইবে না।

বারীণ তখনও সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। নির্ম্মলকে একটা মতলব ভাঁজিয়া বাহিরের দিকে ছুটিতে দেখিয়া তাহার মনে কৌতূহল জাগিল ; কি উদ্দেশ্যে কোথায় সে ছুটিল, তাহা জানিতে সে-ও তাহার অনুসরণ করিল।

অসময়ে জজ সাহেব অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকিলেন,—ছোট বৌমা!

এই রাশভারি মানুষটির পদশব্দে ভিতর মহলটি একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, কাহারও মুখে কথা নাই, সকলেই জানিতে উৎকর্ণ—এ বাড়ীর বিধাতাপুরুষটি এ সময় সহসা ভিতরে আসিয়া ছোট বধূ বেচারীকে এমন কড়া সুরে তলব দিলেন কেন?

নিজের নির্দ্দিষ্ট ঘরটির ভিতরে মানদা তখন কি একটা কাযে আসিয়াছিলেন। শ্বশুরের এই অপ্রত্যাশিত আহ্বান শুনিয়া তাড়াতাড়ি দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

জজ সাহেব অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে বধূর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—নিরঞ্জনকে কেন আমি ত্যাগ করেছিলুম, তুমি জান?

অদ্ভুত প্রশ্ন! বধূ স্থির করিতে পারিলেন না, এত কাল পরে হঠাৎ এ প্রশ্ন তাঁহাকে কেন? অতীতের বেদনাময় স্মৃতি—যাহা সুপ্ত অবস্থায় আছে, কি অভিপ্রায়ে শ্বশুর তাহাকে পুনরায় জাগ্রত করিতে ব্যগ্র হইলেন?

বধূকে নীরব দেখিয়া জজ সাহেব কহিলেন,—জানো না তা বুঝিছি; কিন্তু জেনে রাখা তোমার উচিত। আজ যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তোমার ছেলেকে নিয়ে, ঠিক এই রকমই হবে জেনেই আমাকে তখন অতটা কঠিন হ'তে হয়েছিল।

বধূ মানদা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া শ্বশুরের কথাগুলি শুনিলেন মাত্র;

কিন্তু ইহার উত্তর দিবার জন্য তাঁহার ঠোঁট দুইখানি একটুও নড়িল না; চক্ষুদুটির পলক পর্য্যন্ত বুঝি কাঁপিল না।

বক্র দৃষ্টিতে বধূর দিকে চাহিয়া জজ সাহেব কণ্ঠের স্বর কিঞ্চিৎ নম্র করিয়া কহিলেন,—বুঝতে পারোনি বোধ হয় আমার কথাটা! ব্যাপারটা কি জানো,—পরের মেয়ে নিজের ঘরে আনা সম্বন্ধে বরাবরই আমি ছিলুম অতিমাত্রায় সচেতন; যা তা বংশের কিম্বা যেমন তেমন লোকের মেয়ে আনলেই ভবিষ্যতে পস্তাতে হয়, যেমন আজ আমাকে পস্তাতে হচ্ছে।

মানদা নতমুখেই মৃদুস্বরে কহিলেন,—কিন্তু আমি তো ভেবে পাচ্ছি না, বাবা, এ সব কথা কেন আজ আমাকে লক্ষ্য ক'রে বলছেন!

পুনরায় কণ্ঠে জোর দিয়া জজ সাহেব কহিলেন,—বলবার প্রয়োজন হয়েছে তাই বলছি। যদি তুমি বড় ঘরের মেয়ে হ'তে বাছা, তোমার বাবার কোনো পদমর্য্যাদা থাকতো, তা হ'লে এ স্রোত অন্যদিকে ফিরে যেত, পুরোনো কথা টেনে বলবার আজ হয় তো প্রয়োজনই হ'ত না।

মানদার ম্লান মুখ-খানার উপর এতক্ষণে যেন একটা কাঠিন্যের আবরণ পড়িল; নতদৃষ্টি ঈষৎ তুলিয়া তিনি এবার একটু দৃঢ়স্বরেই কহিলেন,—আমার বাবা বড় লোক ছিলেন না, বড় লোক হবার আকাঙ্ক্ষাও তাঁর ছিল না; কিন্তু বংশ তাঁর বড়ই ছিল, বাবা। আর অন্তরটা যে তাঁর কত বড় ছিল, এলাহাবাদশুদ্ধ লোক তা জানতেন।

জজ সাহেব কহিলেন,—আমিও জেনেছিলুম, কিন্তু সেটা গর্ব্ব ক'রে পরিচয় দেবার মত নয়, বৌমা! টোল খুলে, যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে স্ত্রী-কন্যাকে পথে বসিয়েছিলেন তিনি, এই তো! কি মহত্ত্ব এতে আছে? নিরঞ্জন যদি তার শ্বশুরের এ পরিচয় না দিয়ে, আমাকে লিখতে পারতো যে, ইণ্ডিয়া গবরমেণ্টের সেক্রেটেরিয়েটের কোনো ক্লার্কের মেয়েকে সে দায়ে পড়ে বিবাহ

করেছে, তা হলেও হয় তো আমি তাকে ক্ষমা করতে পারতুম, তোমাদের আসতে বলতুম। কিন্তু—

অতিকষ্টে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া, এই অতি অপ্রিয় প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি চাপা দিবার অভিপ্রায়েই যেন মানদা দেবী শ্বশুরের কথায় এই প্রথম বাধা দিয়া কহিয়া উঠিলেন,—এ সব অপ্রিয় কথা আজ নতুন ক'রে তুলে কি লাভ, বাবা!

জজ সাহেব বিরক্তভাবে কহিলেন,—ধরে নিতে পার, লাভ এতে কিছু নেই, কিন্তু যে-লোকসান গোড়া থেকে হয়ে গেছে, তারই আলোচনা আজ প্রয়োজন হয়ে উঠেছে।

শ্রদ্ধাভাজন শ্বশুরের এ কথার উত্তরে মর্ম্মপীড়িতা বধূ মানদাকে এবার কঠিন হইয়াই কহিতে হইল,—কিন্তু তিনি তো নিজেই এ প্রয়োজন শেষ ক'রে গেছেন, বাবা! এখন আপনিই বলুন, সীতাপুরের পর্ণকুটীরে গিয়ে যে ভুল আপনি স্বীকার করেছিলেন, তার পরেও কি অতীতের লাভ-লোকসান খতাবার প্রয়োজন আছে?

একটা আশ্রিতা বিধবার তরফ হইতে এভাবে হঠাৎ যে একটা নির্ঘাত আঘাত পাইবেন, জজ সাহেব তাহা ধারণা করিতে পারেন নাই। কথাটা তাঁহাকে স্তব্ধ করিয়া দিল, কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য! যে ঝুনো মস্তিষ্কটির অসাধারণ মেধা শত শত আইনজীবীর কূটতর্কজাল কতবার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, তাহা শ্রান্ত হইলেও একেবারে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে নাই। তৎক্ষণাৎ নিজের অভিভূত ভাবটুকু সবলে কাটাইয়া সপ্রতিভ ভাবেই জজ সাহেব কহিলেন,—আছে, অতীতের পাঠ চুকে গেলেও তোমার ছেলেকে নিয়ে যে সমস্যা উঠেছে, তাতেও এমনই লোকসানের আশঙ্কা। তুমি কি বলতে চাও, বৌমা, এর আলোচনারও প্রয়োজন নেই?

ছেলের প্রসঙ্গে মানদার কণ্ঠের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল, অতিশয় নম্র-ভাবেই তিনি কহিলেন,—একথা ত আমি বলতে পারিনে, বাবা! এখন আপনি অভিভাবক, আমরা আশ্রিত; অন্যায় হ'লে অবশ্যই আপনাকে শাসন করতে হবে। কিন্তু নির্ম্মল কি অন্যায় কিছু করেছে, বাবা?

জজ সাহেব এবার উত্তেজিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—কিছু! কি যে তোমার ছেলে করেনি, সেইটিই বরং জিজ্ঞাসা করলে ভালো হ'ত, বৌমা!

মানদা মুখখানি ম্লান করিয়া মৃদু স্বরে কহিলেন,—কিন্তু আমি তো তার কোনো অন্যায়ের কথা শুনি নি, বাবা!

উগ্রকণ্ঠে জজ সাহেব কহিলেন,—শোননি! কোন্‌টা শুনতে চাও তুমি! আমি যেটা বারণ করবো, ও সেটা আগেই ক'রে বসে আছে! আমার ইচ্ছে, ছোটলোকের ছেলেদের সঙ্গে আমার নাতিরা কেউ না মেশে, আর সবাই এ কথা মেনে চলে; কিন্তু তোমার ছেলেই একেবারে বে-পরোয়া, মিশবেই। ভিখিরীগুলোকে ভিক্ষে দিলে তাদের মাথা খাওয়া হয়, খেটে খুটে খাবার ইচ্ছেই তাদের নষ্ট হয়ে যায়, তাই ভিক্ষা দেওয়া আমি বন্ধ ক'রে দিই; কিন্তু তোমার ছেলের প্রাণ ভিখিরীদের দরদে টনটনিয়ে ওঠে, ভিক্ষে তাদের দিবেই! ওর আসার পর থেকেই তাদের আস্কারা বেড়ে গেছে। আমার জন্ম-তিথির দিন দুটো অনাহূত ছোঁড়াকে তাড়িয়ে দিয়েছিল ওর জ্যাঠা, তাতে কি না তার ওপর টক্কর দিয়ে সেই ছোঁড়া দুটোকে ডেকে নিয়ে ময়রার দোকানে যায়, সেখানে তাদের পেট ভরিয়ে খাওয়ায়! এ সব কি ক'রে বরদাস্ত করা যায় বলতে পারো তুমি?

মানদা শ্বশুরের এই সব কথায় কোনও প্রতিবাদ না করিয়া শুধু দুটি কথায় তাঁহার উত্তর দিলেন,—আমি কি বলবো বাবা!

জজ সাহেবের কথা তখনও শেষ হয় নাই, কহিলেন,—আর এ ছেলেকে শোধরানোও মুস্কিল, গোড়া থেকেই এঁচোড়ে পেকে উঠেছে; আসল দোষ যে আকরে—

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই জজ সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার বধূর দিকে চাহিলেন, তাহার পর মুখখানা কঠিন করিয়া ততোধিক কঠিন কণ্ঠে কহিলেন,—এই জন্যে আগেই বলছিলুম, যার তার মেয়ে ঘরে আনলে শেষে পস্তাতে হয়।

কথার সূচনাতেই জজ সাহেব বধূ মানদাকে লক্ষ্য করিয়া যে আঘাত দিয়াছিলেন, কথার উপসংহারে তাহারই পুনরুক্তি করিলেন। কিন্তু ভবিতব্যের বিধান নির্ব্বিচারে মানিয়া লইতে যাঁহারা অভ্যস্ত, তাঁহাদের সহিষ্ণুতাও অসাধারণ। তথাপি শ্বশুরের শেষের আঘাত বধূ সহ্য করিলেও তাহার আত্মমর্য্যাদা ভবিষ্যতের সমস্ত প্রত্যাশা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া আত্মসমর্থনে তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। কণ্ঠের স্বরে খরতর জ্বালা থাকিলেও তাহাকে যতদূর সম্ভব স্নিগ্ধ করিয়া বধূ কহিলেন,—গোড়া থেকে আপনিই ভুল করে চলেছেন, বাবা! আপনি যখন জানতেনই, আমড়া গাছে আম ফলবেনা—তখন সেখান থেকে যত্ন ক'রে তুলে এনে আপনার বাগানে না বসালেই পারতেন! আর, এখনো তুলে ফেলা তো কঠিন নয়।

বধূর মুখের এই কয়টি অতি সোজা ও সহজ কথা সেই মুহূর্ত্তেই যেন জজ সাহেবের মুখের তীব্র ভাবটুকু একেবারে বদলাইয়া দিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া এই বলিয়া তিনি প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চাহিলেন,—কঠিন যে নয়, সেটা আমারও জানা আছে, কিন্তু কঠিন যাতে হ'তে না হয়—সেই জন্যই তোমার কাছে এসেছিলুম। এখন আমার কথা শোনো,

বোনা! তোমার ছেলেকে সদাসর্ব্বদা এই কথাটা মনে রাখতে বলবে যে, আমার যেটা ইচ্ছে নয়, সেই দিকে ঝোঁকাই হচ্ছে তার পক্ষে অন্যায়। কারুর অন্যায় আমি কোনো দিন বরদাস্ত করতে পারিনি, তোমার ছেলেরও পারবো না।

৮

জজ সাহেব তথনও শয্যার আশ্রয় লন নাই, নৈশ ভোজন সারিয়া বাহিরের ঘরেই একখানা আরাম-কেদারায় দেহখানা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। উঠি উঠি করিতেছেন, এমন সময় দ্বারপ্রান্ত হইতে মৃদু কণ্ঠের স্বর শুনা গেল—দাদু?

সোজা হইয়া বসিয়া জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে?

ধীরে ধীরে কেদারার কাছটিতে আসিয়া আহ্বানকারী উত্তর দিল,—আমি নির্ম্মল।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জজ সাহেব কহিলেন,—কি খবর! এমন অসময়ে যে?

নির্ম্মল অতি ধীরে ধীরে কহিল,—সকালে হয় তো দেখা হবে না, তাই রাত্রেই এসেছি দেখা করতে।

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জজ সাহেব প্রশ্ন করিলেন,—কেন?

নির্ম্মল কণ্ঠের স্বর গাঢ় করিয়া কহিল,—কাল ভোরেই আমরা চ'লে যাবো, তাই।

বিস্ময়ের সুরে জজ সাহেব কহিলেন,—চ'লে যাবে! কেন?

নির্ম্মল কহিল,—যাবার পথ তো আপনি দেখিয়ে দিয়েছেন, দাদু! তাই যেতে হচ্ছে।

একটু উষ্ণভাবেই জজ সাহেব কহিলেন,—আমি পথ দেখিয়ে দিয়েছি! এ কথার মানে?

নির্ম্মল মুখে একটু হাসি আনিয়া কহিল,—মানে তো খুবই সোজা, দাদু! আপনি তো স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন, আপনার ইচ্ছামত চলতে না পারলেই গোল বাধবে।

জজ সাহেব কহিলেন,—তা বলেছি বটে! তাতে কি হয়েছে?

নির্ম্মল নির্ভয়ে উত্তর দিল—ইচ্ছে তো সবার সমান নয়, দাদু! গরমিল হয়ে থাকেই। আর আপনিও তো জানেন, কিছুতেই আমি আপনাদের মনের মত হ'তে পারবো না; তাই মানে মানে সরে পড়ছি।

বিকৃত কণ্ঠে জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—বটে! তা যাবে কোন্ চুলোয় শুনি?

নির্ম্মল হাসিমুখেই উত্তর দিল,—এত বড় দুনিয়া পড়ে রয়েছে, দাদু! যাবার যায়গার কি অভাব আছে?

কথাটা জজ সাহেবের ভাল লাগিল না, ক্রুদ্ধভাবেই পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—তবুও কার ঘাড়ে চাপবার মতলবটা করা হয়েছে?

নির্ম্মলের মুখের হাসিটুকু এবার মুখেই মিলাইয়া গেল, কণ্ঠের স্বর কিছু দৃঢ় করিয়াই সে উত্তর দিল,—আমার বাবার কথা সব জেনেও এ কথা না তুললেই ভালো করতেন, দাদু! আমি তো তাঁরই ছেলে!

জজ সাহেব মুখখানা কঠিন করিয়া কহিলেন,—তোমার বাবার কথা আলাদা, সে তিনটে পাস ক'রে তবে রাস্তা খুঁজেছিল! কিন্তু তোমার গতি ব্যবস্থা কি হবে? পেট চলবে কিসে?

নির্ম্মল তাহার স্বাস্থ্যপুষ্ট দুইখানি নিটোল বাহু দাদুকে দেখাইয়া দৃঢ়স্বরে কহিল,—এরাই চালাবে, দাদু! এখন পায়ের ধূলো দিন, আর আশীর্ব্বাদ করুন, যেন বাবার মতন মানুষ হ'তে পারি।

কথার সঙ্গে সঙ্গে হেঁট হইয়া সে জজ সাহেবের পদতলে ভক্তির সহিত মাথাটি নত করিয়া দিল। পরক্ষণে ধীরে ধীরে আর একটি প্রাণী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া জজ সাহেবের উদ্দেশে কক্ষতলে মাথাটি ঠেকাইলেন।

জজ সাহেব আর্দ্রকণ্ঠে কহিলেন,—বৌমা! তুমিও যাবে?

ভগ্নকণ্ঠে মানদা কহিলেন,—আশীর্ব্বাদ করুন, বাবা, নির্ম্মল যেন আপনার নাতি ব'লে পরিচয় দেবার যোগ্যতা পায়।

জজ সাহেব গাঢ়স্বরে কহিলেন,—এ কথা বলবার তো কোনো সার্থকতাই আর রইলো না, মা! নির্ম্মল তার বাপের আদর্শ নিয়ে তারই দেখানো পথে ছুটে বেরুতে চায়। বেশ, তাই হোক্; কিন্তু মনে রোখো মা, ছেলেকে নিয়ে জেদ ক'রে চলেছো, কিন্তু এর পরে ফেরবার যদি প্রয়োজন পড়ে, তখন দেখবে এ পথ বন্ধ হয়ে গেছে; ফেরা আর হবে না।

মানদা গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন,—তখন হয় তো আপনার এ ভুল থাকবে না, বাবা!

জজ সাহেব আর কোনও উত্তর দিলেন না, কেদারায় পুনরায় দেহখানা হেলাইয়া দিলেন। ছেলের হাতখানি ধরিয়া বিষাদ-প্রতিমার মত মানদা ধীরে ধীরে শ্বশুরের ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন।

৯

ইহার পর একটি বৎসর অতীত হইয়াছে। মাতা-পুত্রের সহিত ইতিমধ্যে জজ সাহেবের আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি লোকমুখে বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছেন, রামাপুরায় এক সামান্য গৃহে মা ও ছেলে তাহাদের নূতন বাসা পাতিয়াছে। যাইবার দিন নির্ম্মল তাহার নিটোল হাত দুইখানি দাদুকে দেখাইয়া বলিয়াছিল, তাহারাই তাহাদের পেট চালাইয়া দিবে। জজ সাহেব স্তব্ধবিস্ময়ে ভাল করিয়াই শুনিয়াছেন, তাহার কথা মিথ্যা হয় নাই। নির্ম্মল দুই বেলাই রীতিমত পরিশ্রম করিয়া অন্নসংস্থান করে। প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা তাঁত চালাইয়া যে মজুরী সে উপার্জ্জন করে, তাহাতে কোনও রকমে দুইটি প্রাণীর দিন চলিয়া যায়। নির্ম্মলের মাও সূচের নানাবিধ কায করিয়া কিছু কিছু উপায় করিয়া থাকেন।

অথচ, স্কুলের পড়াশুনায়ও নির্ম্মলের কিছুমাত্র অবহেলা নাই। ক্লাস প্রমোশান হইয়া গেলে, জজ সাহেব বারীণকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন,—তোদের ক্লাস থেকে ফার্ষ্ট হয়ে এবার উঠলো কে?

বারীণ ঢোঁক গিলিয়া অতি কষ্টে উত্তর দিল,—নির্ম্মল।

আমাদের নির্ম্মল? সে ফার্ষ্ট হয়েছে?

বারীণ ঘাড় নাড়িয়া দাদুর কথায় সায় দিল।

পরদিনই জজ সাহেব নির্ম্মলের সম্বন্ধে বিশ্বস্ত লোক দ্বারা হেড মাষ্টারের নিকট গোপন তদন্ত করিয়া জানিতে পারিলেন যে, প্রত্যেক সাবজেক্টেই নির্ম্মল প্রথম হইয়াছে। এ সব ছাড়া, অন্যান্য বিষয়েও সে

বড় সামান্য দক্ষতার পরিচয় দেয় নাই! একটি দিনও সে স্কুল কামাই করে নাই, তজ্জন্য 'অ্যাটেনডেন্স প্রাইজ' তাহারই প্রাপ্য। প্রতিযোগিতা-মূলক রচনায় স্কুলের সমস্ত ছাত্রের মধ্যে নির্ম্মল হইয়াছে প্রথম। ইহার পারিতোষিক একটি সুবর্ণ-পদক। ব্যায়াম পরীক্ষায়ও সকলের উপরে তাহার নাম উঠিয়াছে। অথচ, দুই বেলা তাহাকে রীতিমত-ভাবে তাঁতের মাকু ঠেলিয়া ভরণপোষণ ও পড়াশুনার খরচের সংস্থান করিতে হইয়াছে!

জজ সাহেব অতঃপর নিত্যই স্তব্ধ হইয়া এই অতি অসাধারণ ছেলেটির সম্বন্ধে মনে মনে কত চর্চ্চাই করেন, কত বিনিদ্র রজনী তাহার চিন্তাতেই কাটিয়া যায়, তাঁহাকে এখন জোর করিয়াই স্বীকার করিতে হয়—প্রতিভা তাহার পথ আপনিই করিয়া লয়; ব্যক্তিবিশেষের সুপারিস ও সহায়তা সাধারণের জন্য, অনন্যসাধারণের একমাত্র অবলম্বন আত্মনির্ভরতা ও আত্মমর্য্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা।

১০

এবার আশ্বিনের প্রথমেই কাশীধামে মহোৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর বাহাদুর এই প্রথম বারাণসী পরিদর্শন করিবেন। জনপ্রিয় ও জনসাধারণের স্বার্থসংস্পৃষ্ট সংস্থাসমূহে সহানুভূতি-সম্পন্ন গভর্ণর বাহাদুরের অভ্যর্থনায় কাশীবাসী বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। সন্তরণ-প্রতিযোগিতার প্রদর্শনীও এই উৎসবের অঙ্গীভূত হইয়া এক বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

নির্দ্দিষ্ট দিন দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গাবক্ষে প্রচুর ব্যয়ে অসংখ্য তরণীর

উপর বিশাল উৎসব-মঞ্জিল সুসজ্জিত হইয়াছে। মধ্যে সপারিষদ গবর্ণর বাহাদুর আসন গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া সহরের যাবতীয় পদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ উপবিষ্ট। জন-সাধারণের প্রতিনিধিগণ এই স্থানেই গবর্ণর বাহাদুরকে অভিনন্দিত করিয়াছেন এবং অতি প্রত্যুষে তেরো মাইল দূরবর্ত্তী টিকরী-ঘাট হইতে যে সকল সাঁতারু সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছে, এই স্থানেই তাহাদের জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হইবে। ইহাও স্থির হইয়াছে, গবর্ণর বাহাদুর স্বহস্তে বিজয়ী বীরগণকে পুরস্কৃত করিয়া তাহাদের বিজয়-স্মৃতি চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবেন।

বারাণসীর অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তট ব্যাপিয়া বিপুল জনতা; সকলের উদগ্র দৃষ্টি ভাগীরথীর দিগন্তবিসারী বক্ষে। দিকে দিকে রক্তপতাকার সারি, জলের তালে তালে ব্যাণ্ডের প্রাণমাতান ধ্বনি, দূরে ক্বচিৎ কোনও সাহায্য-তরণীর পতাকা বায়ুভরে উড়িতেছে!

সহসা জনতা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, বহুকণ্ঠের মিলিত ধ্বনি ঝঙ্কার তুলিল,—ঐ-ঐ-ঐ—আসছে।

সকলেই ব্যগ্র দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন, প্রতিযোগিদলের কতিপয় সাঁতারু পর পর নির্দ্দিষ্ট স্থল লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর! তখনও কি উদ্দাম প্রতিযোগিতাই তাহাদের মধ্যে চলিয়াছে।

দশ মিনিটের মধ্যে অগ্রবর্ত্তী প্রতিযোগী তাহার অনুসরণকারীদিগকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া চারিদিকের বিপুল উল্লাসধ্বনি ও করতালির ভিতর দিয়া চিহ্নিত স্থানটিতে উপস্থিত হইল। দ্বিতীয় প্রতিযোগী এই স্থানে উপনীত হইল ইহার দশ মিনিট পরে। অতঃপর প্রায় এইরূপ ব্যবধানে অন্যান্য প্রতিযোগীরাও ক্রমে ক্রমে অকুস্থলের সীমানায় প্রবেশ করিল।

সমবেত ব্যক্তিগণের বিপুল উল্লাস ও জয়ধ্বনি ভেদ করিয়া যে ছেলেটি সর্ব্বপ্রথম গবর্ণর বাহাদুরের সম্মুখে নীত হইল, তাহার অল্প বয়স, দেহের পরিপুষ্ট গঠন ও মুখের একটা দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভঙ্গী সমবেত সকলকেই মুগ্ধ করিয়া দিল। ছেলেটি কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই গবর্ণর বাহাদুর সবেগে উঠিয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া সহর্ষে ঝাঁকুনি দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসের সুরে কহিলেন,—ধন্যবাদ! তুমিই জিতেছো, আর তোমার মত ছেলেরাই জীবনের যুদ্ধে এমনি জেতে। কি তোমার নাম?

ছেলেটির চুলের গোছা তাহার কপাল ছাড়াইয়া ক্রমাগতই দুইটি চক্ষুর উপর আসিয়া পড়িতেছিল, হাত দিয়া সেগুলি সরাইয়া দিয়া সে উত্তর দিল, —নির্ম্মলরঞ্জন চ্যাটার্জ্জী।

জজ সাহেবও এই উৎসবে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, গবর্ণর বাহাদুরের প্রায় পার্শ্বেই তিনি বসিয়াছিলেন।

হয় তো নির্ম্মলের নিশ্বাস বায়ু-প্রবাহে মিশিয়া তাঁহার আড়ষ্টপ্রায় দেহের উপর আসিয়া পড়িতেছিল! দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া জজ সাহেব এই অতি অসাধারণ ছেলেটির সাফল্যের গৌরব স্তব্ধ হইয়াই দেখিলেন! আজ তাঁহারই নাতি সমগ্র বারাণসীর অধিবাসীদের সমক্ষে অভিনন্দিত হইতেছে, স্বয়ং গবর্ণর স্বহস্তে তাহার ললাটে বিজয়-তিলক পরাইয়া দিতেছেন,—তিনি এ ক্ষেত্রে সাধারণ দর্শক মাত্র, সাফল্যমণ্ডিত পৌত্রের পরিচয়টুকু দিবার অধিকারেও তিনি আজ বঞ্চিত, অথচ, এই সত্যটি প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার চিত্তের আকুলতা কে উপলব্ধি করিবে!

কিন্তু গবর্ণর বাহাদুরের হাত হইতে এই প্রতিযোগিতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি হাত পাতিয়া লইয়া এবং সম্ভ্রমে নতমস্তকে তাঁহাকে

অভিবাদন জানাইয়া ছেলেটি ফিরিবামাত্রই এই উৎসবক্ষেত্রে সমবেত সর্ব্বাপেক্ষা বর্ষীয়ান্ পুরুষটির দুইখানি দীর্ঘ বাহু নিবিড়ভাবে তাহাকে বুকে টানিয়া লইল!

সঙ্গে সঙ্গেই সভায় নূতন চাঞ্চল্য সাড়া দিল,—সকলের দৃষ্টি এই দুইটি পরিচিত ব্যক্তির দিকে; বহুকণ্ঠেই কলরব উঠিল,—জজ সাহেব—জজ সাহেব!

এই উৎসবে বহু ছাত্রের সমাগমও হইয়াছিল; তাহাদের ভিতর হইতে উচ্ছ্বসিত স্বর শ্বসিয়া উঠিল,—জজ সাহেবের নাতি!

গবর্ণর বাহাদুর বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—ব্যাপার কি?

নির্ম্মলকে আরও নিবিড়ভাবে বুকটির উপর টানিয়া গদ্গদ কণ্ঠে জজ সাহেব কহিলেন,—ইয়োর এক্সেলেন্সী, মাই গ্রাণ্ড সন, আমার নাতি!

জজ সাহেবের অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে আর দ্বিতীয় কথা নির্গত হইল না।

গবর্ণর বাহাদুর তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বিপুল হর্ষোল্লাসে জজ সাহেবের হাতে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়া ইংরেজীতে কহিলেন,—ধন্যবাদ, রায় বাহাদুর! সত্যই আপনি ভাগ্যবান্!

সন্ধ্যা হয়-হয়, মানদা রামাপুরার প্রায়ান্ধকারাচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ উঠানটির এক পার্শ্বে একখানি চরকা লইয়া তাঁতের নলিগুলিতে সূতা ভরিতেছিলেন। শেষ নলিটি ভরা হইলেই উঠিবেন, এমন সময় নির্ম্মলকে প্রায় কোলে করিয়াই উন্মত্তের মত আবেগে জজ সাহেব উপস্থিত হইলেন!

হাতের নলিটি তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া মানদা ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া শ্বশুরের পদতলে মাথাটি নত করিয়া দিয়া বিস্ময়ের সুরে কহিলেন,—বাবা!

জজ সাহেব কহিলেন,—হাঁ মা, আবার আসতে হয়েছে আমাকে

তোমারই দোরে। সতীলক্ষ্মী তুমি, তোমার কথাই ফলেছে, ভুল আমার টিকলো না, ভেঙে গেছে ; তাই আবার তোমাদের নিতে এসেছি নির্লজ্জের মত।

মানদা বেদনার সুরে কহিলেন,—অমন কথা বলবেন না বাবা, শুনলে কষ্ট হয়।

নির্ম্মল এই সময় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন,—সাঁতারে আমি ফার্ষ্ট হয়েছি মা, এই তার পুরস্কার। সেইখানেই দাদুর সঙ্গে দেখা,—দাদু সবার সামনে আমাকে বুকে টেনে নিলেন—আর মা, শুনেছো, দাদু এবার দুর্গোৎসব করছেন ?

মানদা উল্লাসের সুরে কহিলেন,—সত্যি বাবা ? মাকে আনবেন ?

আর্দ্র কণ্ঠে আবেগের সুরে জজ সাহেব কহিলেন,—মাকে আনবো বলেই তো আগেই আমার গণেশ-জননীকে নিতে এসেছি, নইলে মানাবে কেন !

উল্লাসের সুরে নির্ম্মল কহিল,—দাদু আর সে দাদু নেই, মা ! পথে আসতে আসতে কত কথা আমাকে বললেন, দাদু এবার গণ্ডী ভেঙে দেবেন, মা ! এখন থেকে আতুর গরীবদের জন্মে দাদুর দরজা খোলা।

আবার দুই হাতে পরম স্নেহাস্পদ নাতিটিকে বুকে টানিয়া গাঢ় স্বরে জজ সাহেব কহিলেন,—দাদুর মনের দরজা যে তুমিই খুলে দিয়েছ, দাদু ! তোমারই স্পর্শে পাথর রসে উঠেছে, লোহা হয়েছে সোনা, তুমি যে আমার পরশ-পাথর, দাদু !

নিটোল কোমল দুইখানি হাতের বাঁধনে এই বর্ষীয়ান্ পুরুষটিকে বাঁধিয়া নির্ম্মল সহর্ষে কহিল,—এতদিনে আমার সত্যিকার দাদুকে পেয়েছি। এখন সত্যিই আমি জজ সাহেবের নাতি !